এইচ পি লাভক্র্যাফট অনুসরণে

কেস অফ চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড

ভাবানুবাদ : অদ্রীশ বর্ধন

কেস অফ চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড

এইচ পি লাভক্র্যাফট অনুসরণে

ভাবানুবাদ ঃ

অদ্রীশ বর্ধন

ফ্যানট্যাসটিক

৪, রামনারায়ণ মতিলাল লেন

কলকাতা-১৪

হরর ক্লাসিক

কেস অফ চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড

এইচ. পি. লাভক্র্যাফট : ফ্যানটাসির জাদু-লেখক

[অনেকেই বলেন, নিদেন পক্ষে ফ্যানটাসি গল্প রচনার ক্ষেত্রে এইচ. পি. লাভক্র্যাফট নাকি এডগার অ্যালান পো'র নির্ভেজাল উত্তরসূরী। আবার কেউ কেউ তাঁর কিম্ভূতকিমাকার চরিত্র চিত্রণ আর অলংকারময় ভাষার জন্যে তাঁকে লেখক বলেই স্বীকার করেন না। কোনটা ঠিক ?]

১৯৩৭ সালে মারা যান হাওয়ার্ড ফিলিপস লাভক্র্যাফট। মৃত্যুর সময়ে কিন্তু বলতে গেলে তাঁকে কেউই চিনত না—ফ্যানটাসটিক ফিকশ্যান সমঝদাররা ছাড়া। ব্যবসার ভিত্তিতে কেউ তাঁর গল্প বই আকারে ছাপেন নি। এমন কি সেই বছরেই তাঁরই দেশ থেকে প্রকাশিত একটি গাইড বুকে পর্যন্ত তাঁর নাম ওঠে নি। লাভক্র্যাফট যেন সত্যিই হারিয়ে গেলেন—পূর্ণ ব্যর্থ লেখকের ভাগ্যে যা অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু ৪০ বছরও গেল না। তাঁর গোটা ষাটেক কাহিনী বিক্রী হয়েছে হাজারে হাজারে, লাখে লাখে। সারা-জীবনে তিনি চিঠি লিখেছিলেন লাখ খানেক—ভলতেয়ার আর লিবনিজের সমকক্ষ বললেই চলে—সেই চিঠিগুলো সংগ্রহ করার হিড়িক আরম্ভ হল দেশ জুড়ে এবং চিঠি পিছু উড়তে লাগল একশ ডলারের নোট। ভক্ত স্তাবকরা দলে দলে ছুটল সমাধি মন্দিরে। লাভক্র্যাফটের নাম এখন মুখে মুখে উচ্চারিত হচ্ছে শ্রদ্ধার সঙ্গে।

প্রায় ছ'টি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে লাভক্র্যাফটের গল্প। ল্যাটিন আমেরিকা আর ইউরোপে তাঁকে পূজো করা হয়েছে এডগার আলান পো-র সার্থক উত্তরসূরীরূপে। লাভক্র্যাফট নিজেও পো বলতে অজ্ঞান ছিলেন। গার্সিয়া নামে এক স্পেনীয় লেখক সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দশজন লেখকের মধ্যে লাভক্র্যাফটকে স্থান দিয়েছেন। বেলজিয়ামের লেখক ঘেলরোড তাঁকে বলেছেন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ চারজন লেখকের অন্যতম। অন্য তিনজন হলেন এডগার অ্যালান পো, অ্যামব্রোজ বিয়ার্স, ওয়াল্ট হুইটম্যান। ফ্রান্সের বিখ্যাত লেখক ও ফিল্ম নির্মাতা জাঁ কক্‌তো লাভক্র্যাফটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

লাভক্র্যাফটের নিন্দা প্রসঙ্গে

১৯৪৫ সালে 'দি নিউইয়র্কার'-য়ে বীভৎস গল্পের ওপর একটা নিবন্ধ

লিখলেন এডমণ্ড উইলসন—কিন্তু লাভক্র্যাফটের উল্লেখ করলেন না। সমালোচকরা গালাগাল দিয়ে ভূত ছাড়িয়ে দিল উইলসনের। লাভক্র্যাফটের লেখা পড়েছিলেন উইলসন, কিন্তু ভাল লাগেনি। গালাগাল শুনে ফের পড়লেন এবং লিখলেন ঃ

'...লাভক্র্যাফটের বীভৎস গল্পে একমাত্র বীভৎস রস হল বদরুচি আর যাচ্ছেতাই শিল্পবোধের রস। লাভক্র্যাফট কোনো কালেই ভাল লেখেন নি। ওঁর অলংকারময় ভাষা আর নিম্নশ্রেণীর রচনারীতির সঙ্গে এডগার অ্যালান পো-র তুলনা করার একমাত্র কারণ হল ভাল লেখা নিয়ে ইদানীং কেউ আর মাথা ঘামান না।'

উইলসন আরো বললেন, 'এইচ, জি, ওয়েলসের মত বিজ্ঞান-কল্পনা ছিল বটে লাভক্র্যাফটের—কিন্তু ততটা উচ্চমানের নয়।' উইলসন ডানসানির মত লেখককেও বরবাদ করায় অনেকেই বুঝে ফেললেন—আসলে ভদ্রলোক ফ্যানটাসি গল্পই ভালবাসেন না।

১৯৬২ সালে লাভক্র্যাফটের ওপর কলম ধরলেন আর একজন উইলসন—কোলিন। জাতে বৃটিশ। তিনি লাভক্র্যাফটের লেখার মধ্যে অসুস্থতার চিহ্ন লক্ষ্য করেও শেষ পর্যন্ত মানতে বাধ্য হলেন যে লাভ-ক্র্যাফট প্রথমদিকে আজেবাজে লিখলেও শেষের দিকে ভাষায় বাঁধুনি এনে ফেলেছিলেন। অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দ ব্যবহার করলেও তাঁর অন্ততঃ দুটি উপন্যাস মাইনর হরর্ ক্লাসিক বললেই চলে (শ্যাডো আউট অফ টাইম এবং কেস অফ চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড) এবং বাকী লেখাগুলো মহাকালকেও অগ্রাহ্য করে টিঁকে থাকার মত।

এডমণ্ডের মত অতটা উগ্র না হলেও কোলিন লাভক্র্যাফটের যোগ্য বিচার করলেন না। লাভক্র্যাফট নাকি বাস্তবকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছেন, অতিপ্রাকৃত শক্তি এবং জগতের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছেন। গল্প-গুলোর সিরিয়াস আলোচনা করতে গিয়ে গল্প পড়ার মজাটুকুই ধরতে পারলেন না।

প্রফেসর জন টেলর কিন্তু বলেছেন, 'পো-র পর বীভৎস গল্প এমন জমিয়ে আর কেউ লেখেন নি।' আইজাক আসিমভের মত সায়ান্স-ফিকশ্যান কাহিনীকার কিন্তু লাভক্র্যাফটকে 'অসুস্থ বালখিল্য' আখ্যা দিয়ে একেবারেই আমোল দেন নি। ডেরেক ডগলাস 'হরর্' বইতে বলেছেন—'পো নিজেও লাভক্র্যাফটের মত গায়ে কাঁটা দেওয়া গল্প লিখতে পারেন নি।'

পাঁচজনে পাঁচ কথা বলুক। লাভক্র্যাফটের লেখা তাতে ধুয়ে যাবে না। এ লেখা মনে দাগ কেটে যায়—ভোলা যায় না।

লেখক লাভক্র্যাফট

লাভক্র্যাফটের জন্ম ১৮৯০ সালে প্রভিডেন্সে। সারাজীবন ছিলেন সেইখানেই—মাঝখানে বছর দুই আমেরিকা আর কানাডায় বেড়িয়েছিলেন। লাভক্র্যাফটের বয়স যখন তিন, তখন তাঁর বাবা পাগল হয়ে যান—মারা যান তাঁর আট বছর বয়েসে। রুপোর জিনিসপত্র দেশ-বিদেশে নিয়ে গিয়ে বিক্রী করাই ছিল তাঁর পেশা। লাভক্র্যাফটের মা-ও পাগল হয়ে গেলেন যখন তাঁর বয়স ঊনত্রিশ—মারা গেলেন তার দু বছর পরে। ইতিমধ্যে ছেলের বারোটা বাজিয়ে বসেছিলেন তিনি। বাস্তবতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া অসাধ্য হয়ে দাঁড়াল তার পক্ষে। তাই ব্যবসা করা ভদ্রলোকের কাজ নয়—এই অজুহাতে লাটে তুলে দিলেন কারবার।

ছেলেবেলা থেকে বেশ কয়েকবার মারাত্মকভাবে শরীর ভেঙে গিয়েছিল লাভক্র্যাফটের। ১৯০৮ সালে হাইস্কুলেই ইতি ঘটল পড়াশুনার। বছর কয়েক কাটল স্রেফ আলসেমিতে—কাঁড়ি কাঁড়ি বই পড়ে।

১৯১৫ সাল থেকে ১৯২২ সালের মধ্যে অনেক কবিতা, প্রবন্ধ আর গল্প লিখে ফেললেন এমন সব সখের পত্রপত্রিকায় যারা উপুড় হস্ত হয় না কস্মিন কালেও। কবিতার অধিকাংশই পোপ আর ড্রাইডেনের অনুকরণে লেখা। প্রবন্ধগুলির মধ্যে উচ্ছ্বসিত দেশাত্মবোধ আর অ্যাংলো-স্যাক্সন অহমিকা। গল্পগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রভাব এডগার অ্যালান পো-র (ছেলেবেলা থেকেই যাঁর অন্ধ ভক্ত ছিলেন লাভক্র্যাফট), তারপরে লর্ড ডানসানির (অ্যাংলো-আইরিশ ফ্যানটাসিস্ট) এবং সবশেষে আর্থার ম্যাকেনের (ওয়েলস্ ফ্যানটাসিস্ট)।

১৯১৮ সালে বন্ধুস্থানীয় সখের সাংবাদিকদের লেখা শুধরে দেওয়ার কাজ নিলেন লাভক্র্যাফট। অর্থাৎ ভুতুড়ে-লেখক হলেন এবং এই লেখা লিখেই দুবেলা খেয়ে পরে বেঁচে রইলেন কোন মতে। ১৯২১ সালে শুরু করলেন গা-ছমছমে ফ্যানটাসি গল্প লেখা—যে লেখার জন্যে আজও তিনি শ্রদ্ধার পাত্র। ১৯২৩ সালে Weird Tales নাম দিয়ে একটা অলৌকিক গল্পকল্পের পত্রিকা বেরোতেই লাভক্র্যাফট সেখানে মনের সুখে লিখতে লাগলেন একটার পর একটা অত্যদ্ভুত গল্প উপন্যাস।

জীবনের শেষ বছরগুলো স্বদেশেই কাটিয়েছেন লাভক্র্যাফট। কখনো

লিখেছেন স্বনামে, কখনো শুধরে দিয়েছেন অন্যের লেখা। একাকীত্বর যন্ত্রনা আর ছিল না। বন্ধুবান্ধব হরদম আসত—উনিও যেতেন তাদের বাড়ী বোস্টনে, নিউইয়র্কে ইত্যাদি জায়গায়। দেশ বেড়াতে খুব ভালবাসতেন। ফ্লোরিডায় গেছেন তিনবার, কিউবেকে তিনবার, নিউ অর্লিয়েন্সে একবার। ঠিক এই সময়ে বিরুদ্ধ সমালোচনায় নিরুৎসাহ হয়ে লেখা কমিয়ে আনলেন লাভক্র্যাফট—সারা বছরে বড় জোর একটা, তার বেশী নয়। সংখ্যায় কমে এলেও লম্বায় বেড়ে গেল গল্পগুলো—ছোট উপন্যাস বললেই চলে। ছোট-বড় মিলিয়ে সবশুদ্ধ ৬০টি কাহিনী ছাপিয়ে গেলেন জীবদ্দশায়।

লাভক্র্যাফটের প্রথম দিকের লেখায় পো-য়ের প্রভাব বড় বেশী দেখা যায়। পরবর্তী লেখায় তিনি সেই প্রভাব কাটিয়ে উঠেছিলেন। ডানসানির লেখাও আর তাঁকে আচ্ছন্ন করে নি।

The Cthulhu Mythos নামক গল্প সিরিজের জন্মদাতা কিন্তু লাভক্র্যাফট। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত 'Cthulhu' নভেলেটে প্রথম তিনি জিলেটিন-দানবদের কাহিনী বর্ণনা করেন। তারা নাকি এসেছে অন্য গ্রহ থেকে। অতি-মানবিক ক্ষমতা নিয়ে পৃথিবী শাসনও করেছে। এই তত্ত্ব নিয়ে পরবর্তীকালে বহু গল্পই লেখা হয়েছে। এমন কি অগাস্ট ডালের্থ লাভক্র্যাফটের রেখে যাওয়া টুকিটাকি পয়েণ্ট অবলম্বন করে 'এলডার গডস্' নামে বিশেষ এক প্রজাতি সৃষ্টিও করে ফেললেন।

লাভক্র্যাফটের লেখায় সায়ান্স-ফিকশ্যন ও ফ্যানটাসি দুটোই আছে। তবে ১৯৬০ সালে ফ্যানটাসি সাহিত্যের নবজাগরণে লাভক্র্যাফটের অবদান অনেকখানি।

অতি-উৎসাহীরা লাভক্র্যাফটকে বিশ্বের সেরা সাহিত্যিকদের পর্যায়ে ফেললেও আমি মনে করি না তিনি হোমার, সেক্সপীয়ার, টলস্টয়ের সমান ছিলেন। তবে পো-কে টেক্কা মেরেছেন নিঃসন্দেহে। পো অনেক কিছুই লিখেছেন। গোয়েন্দা গল্পের জনকও তিনি। তাই তাঁর প্রভাব ছড়িয়েছে লাভক্র্যাফটের চাইতেও বেশী। তবে নিজের ক্ষেত্রে লাভক্র্যাফট অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর Cthulhu Mythos-য়ের সঙ্গে সমান হতে পারে কেবল লুই ক্যারোলের 'ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড', বারোজের 'মার্স', বম্‌সের 'ওজ' আর টোকিয়েন্সের 'মিডল আর্থ'।

লাভক্র্যাফট পাঠক-পাঠিকার মন ছুঁয়ে যায় জমিয়ে আনন্দ দিতে পারেন বলেই। সব পপুলার ফিকশ্যন কিন্তু এই কষ্টিপাথরেই যাচাই হয়, তাই নয় কি?

[জীবদেহের সার থেকে এমন জান্তব চূর্ণ বানিয়ে রেখে দেওয়া যায় যা থেকে উদ্ভাবক পুরুষ পড়বার ঘরেই নোয়ার পুরো নৌকোটা জন্তু জানোয়ার সমেত বানিয়ে নিতে পারে। অথবা যখন খুশি যে কোনো জন্তুর নিখুঁত অবয়বকে মূর্ত করতে পারে। একই পন্থায় একজন দার্শনিকও পুড়িয়ে উড়িয়ে দেওয়া স্বর্গতঃ পূর্বপুরুষের ধুলো থেকে বিশেষ সেই উর্ধ্বতন পুরুষটির জাগরণ ঘটাতে পারে। এটা প্রেতসিদ্ধি নয়, পিশাচবিদ্যা নয়। অন্যায় অপরাধ নয়। মানব-ধুলোর জান্তব চূর্ণ থেকে মানুষ সৃষ্টি সম্ভব।]

—বোরিলাস

[টুটেনখামেনের ম্যমীদেহে এখনও যেটুকু DNA পাওয়া যাবে, তাই দিয়ে ক্লোনিং পদ্ধতিতে আর এক টুটেনখামেনের সৃষ্টি সম্ভব।]

—ইন হিজ ইমেজ

প্রথম পর্ব—একটি পরিণাম এবং একটি ভূমিকা

অত্যন্ত অদ্ভুত একটা পাগল এইসেদিন পালিয়েছে পাগলদের হাসপাতাল থেকে। রোড আয়ল্যাণ্ডের কাছে প্রভিডেন্স বলে একটা জায়গা আছে—হাসপাতালটা সেইখানেই। প্রাইভেট হাসপাতাল। বিচিত্র উন্মাদ এই লোকটার নাম চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড। তার বাবাই ছেলেকে আটকে রেখেছিলেন পাগলা গারদে। মনটা ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল সেজন্যে। কিন্তু উপায়ও ছিল না। কেন না, চার্লস শুধু বিচিত্র উন্মাদ নয়, ভয়ংকর বিপজ্জনকও বটে। সামান্য মানসিক বিকৃতি আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে ভয়ানক বিকারে পরিণত হয়েছিল। ক্রুর কুটিল কি এক ঘোরে যেন আচ্ছন্ন থাকত চার্লস। স্বভাব এমন পালটে গিয়েছিল যেন মাথায় খুন চেপেছে। মনের এহেন অদ্ভুত পরিবর্তন দেখে ধোঁকায় পড়েছিলেন ডাক্তাররা। দেহ আর মন সম্বন্ধে এতদিন তাঁরা যা জানতেন—চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড সে সবের ব্যতিক্রম।

প্রথমেই ধরা যাক চার্লসের চেহারা। রাতারাতি যেন পেকে ঝুনো হয়ে গিয়েছিল। অথচ ছাব্বিশ বছরের ছোকরার অত পাকাটে চেহারা হওয়া উচিত নয়। মাথা খারাপ হলে মানুষ বুড়িয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু চার্লসের মুখে এমন একটা বুড়োটে ছাপ পড়েছিল যা শুধু বুড়োদের মুখেই দেখা যায়।

তারপর ধরা যাক চার্লসের দেহযন্ত্রের উলটো-পালটা আচরণ। একটা যন্ত্রের সঙ্গে আর একটা যন্ত্রের এমন একটা বিদ্ঘুটে অনুপাত দেখা গেল যার নজীর চিকিৎসা জগতে আর নেই। সমতা রইল না নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস আর হৃদপিণ্ডের ধুকপুকুনির মধ্যে। গলা এমন বসে গেল যে, কানে কানে কথা বলার মত ফিস ফিস করে কথা বলতে হত চার্লসকে। হজম করার সময় বেড়ে গেল, ক্ষমতা গেল কমে। সুস্থ বা অসুস্থ অবস্থায় মানব-স্নায়ু যেভাবে সাড়া দেয়, চার্লসের ক্ষেত্রে ঘটল তার উল্টো। সৃষ্টিছাড়া এই গরমিলের অনুরূপ উদাহরণ চিকিৎসা শাস্ত্রেই নাকি বিরল। সেইসঙ্গে দেখা গেল, চামড়া শুকিয়ে মড়ার চামড়ার মত ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। টিশুর মধ্যে কোষগুলোও যেন নিরতিশয় রুক্ষ এবং ছাড়া-ছাড়া ভাবে সাজানো। চার্লসের ডান পাছায় জলপাই রঙের এক ধ্যাবড়া জরুল চিহ্ন ছিল। সেটাও মিলিয়ে গেল রাতারাতি—উল্টে বুকে দেখা দিল এমন একটা অদ্ভুত তিল বা কালচে দাগ যা নাকি চার্লসের বুকে কস্মিন কালেও ছিল না। এইসব দেখেই মাথা ঘুরে গেল ডাক্তারদের। একবাক্যে তাঁরা বললেন, চার্লসের শরীরে মেটাবলিজম অর্থাৎ বিপাক এমন পেছিয়ে গেছে যা অতীতে কখনো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় নি।

মনস্তত্ত্বের দিক দিয়েও তুলনা নেই চার্লস ওয়াডের্র। অতীত বা বর্তমানের কোনো রকম পাগলামির সাথে মিল নেই তার পাগলামির। মাথা যদি খারাপ না হত, মানসিক শক্তি যদি কিম্ভূতকিমাকারভাবে বিগড়ে না যেত, তাহলে তার চাইতে বড় প্রতিভা বা নেতা আর দুটি পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ। ডক্টর উইলেট চার্লসের বাড়ীর ডাক্তার। তিনি বললেন, পাগলামির বাইরে চার্লসের যে ধীশক্তি বা মানসিক ক্ষমতা, তা নাকি পাগল হওয়ার পর থেকে আরো বেড়ে গেছে। চার্লস ছোটবেলা থেকেই সেরা ছাত্র। প্রাচীন বিষয় জানবার আগ্রহ তার অসীম। কিন্তু পাগল হবার পর পরীক্ষকরা তার সেই মেধা মাপতে গিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন। এরকম আতীব্র অন্তর্দৃষ্টি আর প্রচণ্ড ধীশক্তি নাকি তার অতীতে কখনো দেখা যায় নি। এহেন প্রতিভাকে পাগলের হাসপাতাল নিতে চাইল না। পাগলদের মন এরকম শক্তিশালী আর স্বচ্ছ হতে পারে না কখনই। শেষকালে সাক্ষীসাবুদরা এসে বললে, চার্লস শুধু পাগলই নয়—এত ধীশক্তি নিয়েও সে নাকি বর্তমান জগতের অনেক খবরই রাখে না। এই যুক্তির বশে তাকে ভর্তি করা হল হাসপাতালে। পালানোর আগের দিন

পর্যন্ত সে বই মুখে করে বসে থেকেছে। ফিসফিসানির স্বরে রাজ্যের লোকের সঙ্গে কথা বলেছে।

ডাক্তাররা তখন থেকেই বলতেন, এত বুদ্ধিমত্তা যার, তাকে বেশীদিন হাসপাতালের মধ্যে রাখা যাবে না। তা সত্ত্বেও ছোকরা কেন যে উধাও হয়ে গেল। সে সমস্যার সমাধান আর হল না।

ভয় পেলেন কেবল ডক্টর উইলেট। একমাত্র ইনিই চার্লস ডেক্সটারকে ছোটবেলা থেকে চিনতেন—বলতে গেলে তাকে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছেন তিনিই। ছোকরার মনের আর দেহের বাড় তিনি যেভাবে লক্ষ্য করেছেন, তেমনটি আর কেউ করেনি। তাই চার্লসের স্বাধীনতার পরিণাম কল্পনা করে তিনি শংকিত হলেন। এ ব্যাপারে ডক্টর উইলেট অতি ভয়ংকর অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। অদ্ভুত একটা আবিষ্কারও করেছেন। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা আর আবিষ্কারটা যে কি, তা আর সংকর্মীদের কাছে ভাঙলেন না। সত্যি কথা বলতে কি, এই যে কাহিনী আমি লিখতে চলেছি, এর মধ্যে ডক্টর উইলেট নিজেই একটি ছোট্ট প্রহেলিকা।

ডক্টর উইলেটই সর্বশেষ দেখা করে গিয়েছিলেন চার্লসের সঙ্গে। তার তিন ঘণ্টা পরেই সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল তার ঘর থেকে। ডক্টর কিন্তু চার্লসের সঙ্গে শেষ দেখা করে বেরিয়ে এসেছিলেন ভীষণ উত্তেজিতভাবে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছেন, ডক্টরের মুখে যুগপৎ আতংক আর স্বস্তি ফুটে উঠতে দেখা গিয়েছিল সেই মুহূর্তে।

চালর্সের পলায়নটিও কিন্তু হাসপাতালের একটি অব্যাখ্যাত রহস্য—অমীমাংসিত বিস্ময়। চার্লসের ঘরের জানলাটি মাটি থেকে ষাট ফুট উঁচু। তা সত্ত্বেও ঘণ্টাতিনেক পরে দেখা গেল, চার্লস ঘরে নেই। ডক্টর উইলেট পলায়ন প্রসঙ্গ নিয়ে পাবলিকের সামনে কোনো কথা বললেন না। অথচ পালানোর আগে তাঁকে যে রকম উৎকণ্ঠিত দেখা গিয়েছিল—পালানোর পরে দেখা গেল অদ্ভুতভাবে তা কাটিয়ে উঠেছেন।

অনেকের ধারণা, ডক্টর উইলেট মুখ খুলতে পারেন যদি তাঁর কথা কেউ হেসে উড়িয়ে না দেয়। চার্লসকে তিনি ঘরের মধ্যেই দেখে এসেছিলেন। অথচ তিন ঘণ্টা পরে চাকরবাকররা দরজা ঠেঙিয়ে বেদম হয়ে পড়েছে—কেউ দরজা খোলেনি! জোর করে দরজা খোলার পর দেখল ঘর ফাঁকা—চার্লস নেই। জানলাটা দুহাট করে খোলা—এপ্রিলের ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস আসছে জানলা দিয়ে, সেই সঙ্গে উড়ে এল অতি মিহি নীলচে-ধূসর ধুলোর একটা মেঘ—আছড়ে পড়ল মুখে—দম যেন বন্ধ হয়ে এল প্রত্যেকের।

এর একটু আগেই কিন্তু কুকুরের চীৎকার শোনা গিয়েছিল। কি এক রহস্যজনক কারণে কুকুরের দল গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে গিয়েছিল এক-নাগাড়ে—অথচ সে সময়ে উইলেট হাজির ছিলেন। তারপরেই কিন্তু একদম চুপ মেরে গেল কুকুরের দল—কাউকে তেড়েও গেল না—চেঁচামেচিও করল না।

তৎক্ষণাৎ টেলিফোনে খবর গেল চার্লসের বাবার কাছে। তিনি কিন্তু মোটেই অবাক হলেন না—শুধু বিষণ্ণ হলেন! ততক্ষণে ডক্টর উইলেটও পেঁছে গেলেন সেখানে। দুজনেই একবাক্যে বললেন, চার্লস কি করে পালিয়েছে তা জানেন না—পালানোর ব্যাপারে তাঁদের হাতও নেই। ওঁদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের মুখে দু-একটা সূত্র পাওয়া গেল বটে—কিন্তু তা এমনই উদ্ভট যে বিশ্বাস করা যায় না। মোটকথা একটা ঘটনাই শেষ পর্যন্ত টিঁকে গেল এবং উন্মাদ চার্লস ডেক্সটারের কোনো সন্ধান আর পাওয়া যায় নি।

চার্লস ওয়ার্ড ছেলেবেলা থেকেই পুরাতত্ত্ববিদ। প্রাচীন বস্তু-সংগ্রাহক। ওরকম একটা শহরে বাস করলে, এ সখ মানুষের প্রাণে জাগা স্বাভাবিক। চারপাশে যা কিছু দেখেছে, এমন কি পাহাড়ের গায়ে প্রসপেক্ট স্ট্রীটে পৈত্রিক প্রাচীন প্রাসাদটি পর্যন্ত অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি করে গেছে তার শিশুমনে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে অনুসন্ধিৎসার পরিধি—প্রাচীন বস্তু সম্বন্ধে জানবার ইচ্ছে ছাড়াও ইতিহাস, কুলজিশাস্ত্র, ঔপনিবেশিক স্থাপত্য, আসবাবপত্র এবং কারিগরি শাস্ত্র ভীড় করেছে তার জ্ঞানস্পৃহার মধ্যে। তার পাগল হওয়ার মূলে এই বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ-ভাবে না থাকলেও পরোক্ষভাবে থেকেছে বইকি। পরীক্ষকরা দেখেছেন, চার্লসের অজ্ঞতা কেবল পারিপার্শ্বিক জগতের বিবিধ জ্ঞানের ব্যাপারে। কিন্তু পুরাকালের সব কিছুই যেন তার নখদর্পণে। অতীত সম্বন্ধে তার জ্ঞান সুগভীর—অথচ বাইরে দেখাতে চায় না সেই জ্ঞানের চাকচিক্য—কায়দা করে প্রশ্ন করে পেট থেকে টেনে বার করতে হয়েছে তার জন্মের বহু আগের বহু তত্ত্ব ও তথ্য। শুনে মনে হয়েছে যেন অটোহিপনোসিস বা আত্ম-সম্মোহনে আচ্ছন্ন হয়ে চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড অতীত যুগেই ফিরে গিয়েছে। সব চাইতে অদ্ভুত ব্যাপার হল, প্রাচীন দুনিয়া সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এত কিছু জানবার পরে সেই দুনিয়া সম্পর্কে সব আগ্রহ যেন হারিয়ে ফেলেছে চার্লস। যেন এত জেনেছে যে আর তা নিয়ে ভাবতে চায় না। এখন মনের সব শক্তি জড়ো করেছে আধুনিক যুগের ওপর। সর্বশক্তি দিয়ে দ্রুত শিখে নিতে চাইছে এই যুগের ছোট

থেকে বড় বিষয়—যা নাকি অত্যাশ্চর্যভাবে অদৃশ্য তার বিপুল জ্ঞান-ভাণ্ডারের মধ্যে। প্রচণ্ড শক্তিশালী মস্তিষ্কের মধ্যে থেকে বর্তমান জগৎ সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞানকে কে যেন ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বিদেয় করেছিল—এখন উঠেপড়ে লেগেছে তা জানতে। চার্লস কিন্তু প্রাণপণে গোপন করতে চেয়েছে তার এই অজ্ঞতা। কেউ যেন জানতে না পারে মগজে তার বর্তমান জগতের কোন জ্ঞান আর নেই। উল্টে উদয়াস্ত অমানুষিক পরিশ্রম করেছে আশপাশের জগৎ সম্বন্ধে সব খবর জানতে। ১৯০২ সালে তার জন্ম। ঐ সালে জন্মালে যা-যা তার জানা উচিত, তার প্রতিটি জানবার আর শেখবার জন্যে তার উন্মত্ত প্রচেষ্টা সত্যিই দেখবার মত। এমন কি স্কুলের শিক্ষা পর্যন্ত নতুন করে শেখবার প্রচেষ্টা অদ্ভুত নয় কি? এই সব দেখেশুনেই ডাক্তাররা বলেছেন, পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে অত কম জ্ঞান নিয়ে স্বাধীনভাবে সমাজে ঘুরে বেড়ানোও তার পক্ষে এখন মুস্কিল। তাই নিশ্চয় রয়েছে কোথাও ঘাপটি মেরে। জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বেরোবে না।

চার্লসের পাগলামির শুরু কখন, এ-ব্যাপারে কিন্তু ডাক্তাররা একমত নন। বোস্টনের বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ ডক্টর লাইমানের মতে চার্লস পাগল হয়েছে ১৯১৯ কি ১৯২০ সালে। ঐ বছরেই তার স্কুল ছাড়বার কথা। কিন্তু হঠাৎ পুরাতত্ত্ব ছেড়ে চার্লস অকাল্ট সায়ান্স নিয়ে মগ্ন হয়েছিল। অকাল্ট সায়ান্সকে গুপ্তবিদ্যা বলা যেতে পারে। অপরসায়ন বিদ্যা। বস্তুবিজ্ঞান যার অস্তিত্ব স্বীকার করে না।

চার্লস মোজেজ ব্রাউন স্কুল ছেড়ে দিল। শেষ পর্যন্ত পরীক্ষাও দিল না। কারণ নাকি বাঁধাধরা পড়াশুনায় তার আর মন নেই—তার চাইতেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কথা ভাবতে হচ্ছে।

এই সময় থেকেই চার্লসের হাবভাব কেমন জানি পালটে গিয়েছিল। বিশেষ করে একটি ব্যাপারে। শহরের পুরোনো দলিল ঘাঁটত—খুঁজত বিশেষ একটা কবরের ঠিকানা। ১৭৭১ সালে কবর দেওয়া হয়েছে তাঁকে। তারই এক পূর্বপুরুষ—নাম জোসেফ কারওয়েন। কবরখানায় গিয়ে খুঁজত জোসেফ কারওয়েনের কবর।

কারওয়েনের লেখা অনেক কাগজপত্র নাকি উদ্ধারও করেছিল চার্লস। স্ট্যামপার্স হিলের ওলনি কোর্টে একটা বেজায় পুরোনো বাড়ী আছে। কারওয়েন এই বাড়ীতে জীবদ্দশায় থাকতেন। সেই বাড়ীতেই দেওয়ালের কাঠ সরিয়ে গোপন গর্ত থেকে নাকি কাগজগুলো পেয়েছে চার্লস।

মোট কথা, এই একটি ব্যাপারে একমত হলেন সকলে। ১৯১৯-২০ সালে বিরাট একটা পরিবর্তন আসে চার্লসের মধ্যে। আচম্বিতে সে এতদিনের পুরাতত্ত্ব সাধনা ত্যাগ করে শুরু করে গুপ্তবিদ্যা চর্চা। সেই সঙ্গে পাগলের মত দিবানিশি বিরামবিহীনভাবে খুঁজতে থাকে অতি-বৃদ্ধ-প্রমাতামহর কবর।

ডক্টর উইলেট কিন্তু অন্য মত পোষণ করেন এ ব্যাপারে। চার্লসকে তিনি খুব কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখেছেন, বেশ কয়েকটা গা-শিউরোনো তদন্ত আর রোমাঞ্চকর আবিষ্কারও শেষের দিকে করেছেন—তাই পোষণ করেন ভিন্ন মত। শুধু মতভেদ নয়, সেইসব আবিষ্কার বা তদন্তের উল্লেখমাত্রই ভদ্রলোক শিউরে ওঠেন। গলা কেঁপে যায়—আর কথা বলতে পারেন না। লিখে জানাতে গেলেও এমন হাত কাঁপতে থাকে যে লেখা আর হয় না।

উইলেট কিন্তু মেনে নিয়েছেন যে ১৯১৯-২০ সাল থেকেই চার্লসের মানসিক অধঃপতনের শুরু—পাগলামি প্রকট হয় ১৯২৮ য়ে। নিছক পাগলামি বললে কম বলা হয়—ভয়ংকর, অলৌকিক সেই উম্মত্ততার নজীর পাগলামির ইতিহাসে আর নেই।

অন্য ডাক্তাররা তাঁর এই মত মানতে রাজী নন। নিশ্চয় কোনো এক সময়ে হঠাৎ পাগল হয়েছে চার্লস। উইলেট কিন্তু তা সত্ত্বেও বলেছেন, আগের অদ্ভুত বিসদৃশ আচরণের সঙ্গে চার্লসের বর্তমান উম্মত্ততার কোনো সংযোগ নেই। অর্থাৎ আগে সে যতই সৃষ্টিছাড়া থাকুক না কেন, পাগল হয়নি। হয়েছে এখন। উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরেন চার্লসের নিজের জবানি। সে নাকি এমন কিছু আবিষ্কার বা পুনরাবিষ্কার করেছে যা শুনলে মানুষের ধাত ছেড়ে যাবে। চিন্তার রাজ্যে প্রলয় উপস্থিত হবে।

আসল পাগলামি এসেছে অনেক পরে—অন্য পরিবর্তনের সঙ্গে। কারওয়েনের একটি ছবি এবং প্রাচীন দলিলপত্র আবিষ্কার করেছে চার্লস, বিদেশের অজ্ঞাত অঞ্চলে ঘুরে এসেছে, অদৃশ্য লোক থেকে অশরীরীদের আবাহন জানিয়েছে অদ্ভুত মন্ত্রপাঠ আর গুপ্ত আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, আবাহনের জবাব পেয়ে কম্পিত হাতে উম্মাদের মত অব্যাখ্যাত মানসিক অবস্থায় লিখেছে একখানা চিঠি; রক্তচোষা ভ্যামপায়ারদের উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে এবং কানাঘুষোয় শোনা গিয়েছে লোমখাড়া করা একসেট গুজব; চার্লসের স্মৃতির পট থেকে আস্তে আস্তে মুছে গিয়েছে সমসাময়িক অনেক স্মৃতি; লোপ পেয়েছে কথা বলার ক্ষমতা, চেহারা পর্যন্ত আমূল পালটে

গিয়েছে—শুকনো শীতল হয়েছে চামড়া, জরুল মিলিয়েছে—আবিভূ্ত হয়েছে বুকের তিল—এত কাণ্ডের পর নাকি উন্মত্ততা আশ্রয় করেছে চার্লসকে—তার আগে নয়—কোনমতেই নয়।

ঠিক তখন থেকেই যেন দুঃস্বপ্ন ঘিরে ধরেছে চার্লসকে। উইলেট বললেন, চার্লস যে সত্যিই একটা অদ্ভুত আবিষ্কার করেছে তার প্রমাণ আছে।

প্রথমতঃ, দুজন উঁচু দরের গবেষক জোসেফ কারওয়েনের প্রাচীন কাগজপত্র দেখেছেন।

দ্বিতীয়তঃ, চার্লস একবার সেইসব কাগজপত্র আর কারওয়েনের ডাইরীর একটা পাতা তাঁকে দেখিয়েছিল। উইলেট জোর গলায় বলতে পারেন, কোনোটাই জাল নয়। যে গর্ত থেকে এগুলি পেয়েছিল চার্লস, সেটিও একটি বাস্তব সত্য—চাক্ষুস প্রমাণ। যে অবস্থায় যে পরিবেশে উইলেট এগুলি দেখেছিলেন তা বিশ্বাস করা কঠিন, প্রমাণ করা দুঃসাধ্য। সবার ওপর রয়েছে ওর্নি আর হাচিনসনের চিঠির রহস্য এবং ডক্টর অ্যালেন—যার রহস্যজনক অস্তিত্ব শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করতে পেরেছিল গোয়েন্দার দল।

সবশেষে রয়েছে উইলেটের পকেটে পাওয়া একটা অকাট্য প্রমাণ। সুপ্রাচীন দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে লেখা একটা লিপিকা। অবিশ্বাস্য ভয়ংকর লোমহর্ষক সেই অভিজ্ঞতা লাভের পর জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন উইলেট। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর দেখলেন পকেটে রয়েছে অদ্ভুত সেই চিঠি।

সবচাইতে অকাট্য প্রমাণ হল দুটো অতি কদাকার ফলাফল। শেষ তদন্তের পর দুটো ফরমুলা উদ্ধার করে এনেছিলেন উইলেট। সেই ফরমুলা অনুযায়ী এক্সপেরিমেণ্ট করতে গিয়ে মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে গিয়েছিল ডাক্তারের। সেই ফলাফল থেকেই কিন্তু সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে কাগজপত্র সব আসল এবং এ কাগজের বিষয়বস্তু মানুষের জ্ঞানের পরিধির বাইরে।

২

পুরাকাল নিয়ে পাগল ছিল চার্লস। সুতরাং তার অতীত জীবন নিয়ে কথা বলা যাক।

মোজেজ ব্রাউন স্কুলটা চার্লসের বাড়ীর খুব কাছেই। ১৯১৮ সালে এই স্কুলেই ভর্তি হয়েছিল চার্লস। তখন মিলিটারী ট্রেনিংয়ের হিড়িক উঠেছিল সমাজে। এ স্কুলে ভর্তি হওয়ার অন্যতম কারণ সেইটাই।

স্কুল বিল্ডিংটা এমনিতেই পুরনো। নির্মিত হয়েছিল ১৮১৯ সালে।

এই বাড়ী দেখেই পুরাতত্ত্বের দিকে বোধহয় মন টেনেছিল চার্লসের। সামাজিকতার ধার ধারত না। সময় কাটাতো বাড়ীতে বসে। নয় তো হাঁটতো মাইলের পর মাইল। অথবা থাকত ক্লাসে, কিম্বা খেলার মাঠে। তারপরও যে সময় হাতে থাকত, সেটা ব্যয় করত পুরাতত্ত্ব চর্চায়। লাইব্রেরী, মিউজিয়াম ইত্যাদি জায়গায় ঘুর ঘুর করত, পুরনো ইতিহাস ঘাঁটত। অতীতের জ্ঞান দিয়ে ভরিয়ে চলত নিজের জ্ঞানের ভাণ্ডার। লম্বা, ছিপছিপে, এক মাথা সোনালী চুল, চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ডের দুই চোখে ভাসত কিন্তু অধ্যয়নের স্বপ্ন। পথ চলত ঈষৎ ঝুঁকে—সব মিলিয়ে খুব একটা আকর্ষণীয় নয়।

সারা শহরে পুরাকাল চর্চা করতে গিয়ে কয়েক শতাব্দী আগেকার একটা ছবি মোটামুটি মনের মধ্যে খাড়া করে নিয়েছিল চার্লস। প্রায় খাড়া পাহাড়ের চূড়োয় জর্জিয়ান ম্যানসনের জানলায় বসে স্বপ্নিল চোখে তাকিয়ে থাকত শহরের গম্বুজ, চূড়ো, ছাদের দিকে। মনে মনে কল্পনা করত, এই গৃহেই তার জন্ম; শৈশবে আয়া তাকে চাকা-গাড়ীতে চাপিয়ে বেড়াতে নিয়ে গেছে ঐ রাস্তা দিয়ে কলেজের পাশ দিয়ে দূরে। কখনো পাহাড়ের গা দিয়ে কাঠের বাড়ীগুলোর পাশ দিয়ে। গাড়ী রেখে গল্প করেছে পুলিশ কনস্টেবলের সঙ্গে। রাঙা আকাশ আর মেঘের পটভূমিকায় পাহাড় আর শহরের স্মৃতি সেই থেকে গভীর ভাবে গেঁথে গিয়েছে চার্লসের মনে।

একটু বয়স বাড়তেই আরম্ভ হয়েছে চার্লসের বিখ্যাত পাদচারণ। লম্বা পথ এক নাগাড়ে হাঁটতে আর পথের দুপাশে প্রাচীন শহরের বিশাল তোরণ, গম্বুজ, প্রাসাদ দেখতে বড় ভালবাসত সে। প্রথম প্রথম টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেত আয়াকে। তারপর বেরিয়ে পড়ত একাই। দুর্গম গিরির ঘোরালো পাকদণ্ডী বেয়ে উধাও হত গহন অঞ্চলে। দেখে আসত সুপ্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ। যেন মোহাচ্ছন্ন হয়ে রাবিশ কাঠপাথরের মধ্যে ঘুরে বেড়াত আপনমনে।

অতীতের ছায়া শেষ পর্যন্ত করাল ছায়া ফেলেছিল চার্লসের মনে।

শৈশব থেকে সে নিবিষ্ট থেকেছে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এবং নিজেই ভয়ংকর ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে ১৯১৯-২০ সালে।

ডক্টর উইলেট জোর দিয়ে বললেন, এর আগে বিকট উম্মত্ততার লেশমাত্র ছিল না চার্লসের মধ্যে। কবরখানায় ঘুরে বেড়ানো উম্মত্ততা নয়—অতীত নিয়ে বড্ড বেশী পড়াশুনা করত বলেই অতীতের কংকাল যেখানে চিরনিদ্রায় শুয়ে, বেড়াতে যেত সেখানে। কিন্তু চরিত্রের ভয়াল রূপটি তখনও দেখা যায় নি। এই রূপ একদিনে প্রকট হয় নি—হয়েছে ধীরে ধীরে এবং তার শুরু বছর কয়েক আগে বিশেষ এক আবিষ্কারের পর থেকেই। মায়ের বাপ-পিতামহের মধ্যে নিজের এক দাদুর সন্ধান পায় চার্লস। ভদ্রলোক নাকি দীর্ঘকাল বেঁচেছিলেন। এসেছিলেন ১৬৯২ সালের মার্চ মাসে সালেম থেকে। নাম তাঁর জোসেফ কারওয়েন। অনেকরকম গা-ছমছমে কাহিনী শোনা গিয়েছে তাঁকে ঘিরে। সে-সব কাহিনী এমনই পিলে চমকানো যে উচ্চকণ্ঠে বলতেও ভয় হয়।

১৭৮৫ সালে চার্লসের বৃদ্ধ-প্রমাতামহ ওয়েলকামপটার অ্যান টিলিনঘাস্ট নাম্নী এক মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন। ভদ্রমহিলার মা মিসেস এলিজা ক্যাপ্টেন জেমস টিলিনঘাস্টের মেয়ে। তিনি কার ছেলে, কার নাতি ইত্যাদি খবর আর কেউ রাখেনি। ১৯১৮ সালে চার্লস ওয়ার্ড একটা প্রাচীন পুঁথি ঘাঁটতে ঘাঁটতে দেখল দুটো পাতা সযত্নে আঠা দিয়ে লাগিয়ে এক করে দেওয়া হয়েছে। পাছে কেউ পৃষ্ঠাসংখ্যা দেখে ধরে ফেলে, তাই অনেক মেহনৎ করে পৃষ্ঠাসংখ্যা পর্যন্ত পালটে দেওয়া হয়েছে। দৈবাৎ পাতা দুটি খুলে যাওয়ায় কারচুপিটা ধরে ফেলে চার্লস। আঠা লাগানো গোপন পাতায় দেখল লেখা রয়েছে সেই ভয়ানক আবিষ্কারটা। জোসেফ কারওয়েনের বিধবা বউ মিসেস এলিজা কারওয়েন তার সাত বছরের মেয়েকে নিয়ে আদালতে গিয়ে নাম পালটেছে। মানে, স্বামীর কারওয়েন পদবী ত্যাগ করে বাপের বাড়ীর টিলিনঘাস্ট পদবী নিয়েছে। কারণ, স্বামীর জীবন যে কুখ্যাতির মধ্যে দিয়ে শেষ হয়েছে এবং যেভাবে তিনি জনগণ ধিক্কৃত হয়েছেন, এরপর তাঁর স্মৃতির সঙ্গে নিষ্পাপ স্ত্রী বা কন্যার নামের দিক দিয়েও আর কোন সংযোগ রাখা উচিত নয়।

নিমেষে চার্লস বুঝে ফেললে কি বিরাট আবিষ্কার সে করে বসেছে। তার অতি-বৃদ্ধ-প্রমাতামহ যে কে, তা কেউ জানত না। এখন জানা গেল। জোসেফ কারওয়েন তার অতি-বৃদ্ধ-প্রমাতামহ। উত্তেজনায় অস্থির হয়ে পড়ল চার্লস এই ঘটনার পর। জোসেফ কারওয়েন সম্বন্ধে

আভাসে ইঙ্গিতে অনেক কিছুই সে জেনেছিল—যদিও দেখা গিয়েছে জনগণের স্মৃতি থেকে ভদ্রলোকের নাম চিরতরে মুছে দেওয়ার সব চেষ্টাই করা হয়েছে দলিল দস্তাবেজের মধ্যে। সুচারুভাবে জোসেফ কারওয়েনকে যেন সরিয়ে দেওয়া হয়েছে অতীতের ইতিহাস থেকে। কেউ যেন তাঁর সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ খবর না পায়, ত্রুটি রাখা হয়নি সেই ব্যবস্থায়। কিন্তু কেন এই আক্রোশ তা বোঝেনি চার্লস। সে যুগের হর্তাকর্তারা হঠাৎ কেন উদ্বিগ্ন হলেন জোসেফ কারওয়েনের নাম ধাম কীর্তি পর্যন্ত সমাজ থেকে মুছে দেওয়ার জন্যে, চার্লস তা কিছুতেই বুঝে ওঠেনি।

এই ঘটনার আগে পর্যন্ত পুরাতত্ত্বর রোমন্থন করতে বসে অপিচ জোসেফ কারওয়েনকে মনে ঠাঁই দেয়নি চার্লস। কিন্তু জোর করে ইতিবৃত্ত চেপে দেওয়া হয়েছে যে মানুষটির, তাঁর সঙ্গে নিজের রক্তের সম্পর্ক আবিষ্কার করার পর থেকেই যেন নেশায় পেয়ে বসল চার্লসকে। নানান জায়গায় হানা দিয়ে অনেক খবরই উদ্ধার করল সে। নিদারুণ উত্তেজনার ফলেই আশাতীত তত্ত্ব আবিষ্কার করল দীর্ঘ দিনের অন্বেষণে। জোসেফ কারওয়েন সম্পর্কে যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁদের অনেকেই সেই সব অপ্রকাশিত লেখা ফেলে দেওয়ার কথা ভাবেন নি। তারই কিছু কিছু হাতে এসে পড়ল। নিউইয়র্ক থেকে পাওয়া গেল বেশ কয়েকখানা গুরুত্বপূর্ণ চিঠি। রোড আয়ল্যাণ্ড থেকে এক সামরিক অফিসার লিখেছিলেন, চিঠিগুলো এবং তা সযত্নে রেখে দেওয়া হয়েছিল একটা মিউজিয়ামে। সব চাইতে মারাত্মক আবিষ্কারটা করল চার্লস নিজেই ১৯১৯ সালের অগাস্ট মাসে ওলনি কোর্টের সেই গলিত নখদন্ত বিরাট প্রাসাদের এক দেওয়ালে। দেওয়ালের কাঠ সরাতেই হাতে ঠেকল খানকয়েক রহস্যময় দলিল—চার্লসের চোখের সামনে খুলে গেল অনন্ত অন্ধকারে ঘেরা এক ভয়ংকর দুনিয়া যা পাতাল গহ্বরের চাইতেও অতলস্পর্শী।

দ্বিতীয় পর্ব—আগেকার একটা ঘটনা এবং একটা ভয়াল রহস্য

জোসেফ কারওয়েন লোকটা বড়ই অদ্ভুত। অনেক কিংবদন্তী গড়ে উঠেছে তাঁকে ঘিরে। চার্লস তার কিছু উদ্ধার করেছে—অনেক কিছু অন্ধকারেই থেকে গিয়েছে।

লোকটার চরিত্র রহস্যময় কুহেলিকায় ঢাকা, একটা কুটিল অথচ আশ্চর্য প্রহেলিকা যেন সদাজাগ্রত তাঁকে ঘিরে। ইনি সালেম থেকে পালিয়ে এসেছিলেন প্রভিডেন্সে। তখন ডাকিনীবিদ্যা নিয়ে খুব আতংক দেখা দিয়েছিল সালেমে। জোসেফ কারওয়েন লোকটার বিবিধ

কুখ্যাত ছিল তাঁর রসায়ন আর অপরসায়ন সম্পর্কিত হরেকরকম বিচিত্র পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্যে। থাকতেন একা একা। তাই ডাকিনী আতংকর সূচনাতেই প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এলেন নিরাপদ এলাকা প্রভিডেন্সে।

ভদ্রলোকের গায়ে কোনরকম রঙ ছিল না বললেই চলে। বয়স বড় জোর তিরিশ। বিদ্যেবুদ্ধি জ্ঞানের যেন আর শেষ ছিল না। তাই প্রভিডেন্সের নাগরিক হতে দেরী হল না। অনেক জায়গা জমি কিনলেন ওলনি স্ট্রীটে। বাড়ী বানালেন স্ট্যাম্পার্স হিলে। নাম দিলেন ওলনি কোর্ট। ১৭৬১ সালে সেই বাড়ী ভেঙে তৈরী করলেন নতুন একখানা ইমারত—এখনো তা পড়ো পড়ো অবস্থাতেও টিঁকে রয়েছে।

জোসেফ কারওয়েনের প্রথম যে অদ্ভুত জিনিসটা সবার চোখে লাগল তা হল তাঁর বয়স। যে বয়স নিয়ে তিনি এসেছিলেন, অনেক বছর পরেও দেখা গেল প্রায় সেই বয়সই তাঁর রয়ে গেছে। বুড়িয়ে যান নি—বয়েসের সে রকম একটা ছাপ পড়েনি চেহারায়। জাহাজী ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন কারওয়েন। একটা জাহাজঘাটও কিনে নিয়েছিলেন। ১৭১৩ সালে নতুন করে তৈরী করেছিলেন গ্রেট ব্রীজ আর একটা গির্জে। বয়স কিন্তু ঠেকে থেকেছে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে।

একটার পর একটা যুগ গিয়েছে, দেশের লোকের টনক নড়েছে। কারওয়েন কিন্তু সোজাভাবে বুঝিয়ে বলেছেন, বয়স বাড়েনি তাঁর পূর্বপুরুষরা অত্যন্ত কর্মঠ ছিলেন বলে। তিনি নিজেও খুব সাদাসিধে জীবন যাপন করেন—তাই শরীরে ক্ষয় ধরে না। দেশশুদ্ধ লোক কিন্তু তাঁর দীর্ঘজীবন আর চিরযৌবনের অন্য অর্থ দাঁড় করিয়েছে। গুপ্ত প্রকৃতির জোসেফ কারওয়েনের প্রাসাদে রাতবিরেতে আলো জ্বলে নাকি জানলায় জানলায়। ছায়ার মত তিনি আসেন আর যান—সুতরাং সাদাসিধে জীবন নিশ্চয় তিনি যাপন করেন না। গুজব রটল অনেক রকমের। সবচাইতে চাঞ্চল্যকর রটনা হল কারওয়েনের কেমিক্যাল এক্সপেরিমেণ্ট নিয়ে। দিনরাত হরেকরকম কেমিক্যাল মিশিয়ে আর আর ফুটিয়ে তিনি যাই করুন না কেন—আসল উদ্দেশ্য নিশ্চয় বয়সটাকে বাড়তে না দেওয়া। অর্থাৎ অমৃত আবিষ্কার করেছেন তিনি।

মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল আরও অনেক অদ্ভুত কাহিনী। লণ্ডন আর ভারতবর্ষ থেকে নাকি জাহাজে করে বিদঘুটে সব জিনিসপত্র

আমদানী করতেন কারওয়েন। আনতেন নিউপোর্ট, বোস্টন, নিউইয়র্ক থেকে। ডক্টর জাবেজ বোয়েন রেহোবথ থেকে এসে যখন গ্রেট ব্রীজের ওধারে ওষুধের দোকান খুলে বললেন, কারওয়েন তখন থেকেই সেখানে যেতেন এবং দিবানিশি গুজ গুজ ফুস ফুস করতেন, এন্তার ওষুধ অ্যাসিড আর ধাতুর অর্ডার দিতেন অথবা কিনতেন।

এইসব দেখেই দেশশুদ্ধ লোকের ঘোর সন্দেহ হল নিশ্চয় কারওয়েন চিকিৎসা বিদ্যায় এমন কোন আশ্চর্য গুপ্ত তত্ত্ব আবিষ্কার করে বসে আছেন, যার দৌলতে তিনি বয়স আর যৌবনকে পায়ে বেড়ি পরিয়ে বেঁধে রাখতে জানেন। গুজবটা দানাবলের মত ছড়িয়ে যেতেই কাতারে কাতারে রুগী ভিড় করল তাঁর প্রাসাদে দাওয়াইয়ের আশায়। কাউকে বিমুখ করলেন না কারওয়েন। বরং যাতে আরও সবাই আসে, এমনিভাবে নাচিয়ে ছাড়লেন। ওষুধ দিলেন—অদ্ভুত রঙের বিটকেল স্বাদের পাঁচন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ওষুধে কাজ হল না কারোরই। বয়স আর জরাকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না—যেমনটি দেখা গিয়েছে কারওয়েনের ক্ষেত্রে।

এই ভাবে গেল পঞ্চাশটি বছর—জোসেফ কারওয়েনের বয়স বাড়ল খুব জোর পাঁচ বছর। চোখ মুখ চেহারা পঞ্চাশ বছর আগেও যা ছিল—পঞ্চাশ বছর পরেও প্রায় তাই রইল—পাঁচ বছরের এদিক ওদিক ধর্তব্যের মধ্যে নয়। এই না দেখে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এল দেশশুদ্ধ লোকের। এতদিন শুধু গুজব রটিয়েই ক্ষান্ত ছিল যারা, এবার ভয় ঢুকল তাদের প্রাণে। ত্রিসীমানা মাড়ানো ছেড়ে দিল কারওয়েনের। কারওয়েনও তাই চাইছিলেন। যেন স্বস্তি ফেলে বাঁচলেন।

প্রাইভেট চিঠিপত্র আর ডাইরীতেও লেখা আছে জোসেফ কারওয়েনকে এড়িয়ে চলার অসংখ্য কারণ। প্লেগে আক্রান্ত রুগীর মতই তাঁর ছায়া মাড়ানো ছেড়ে দিয়েছিল সবাই। কবরখানাই যেন তাঁর সান্ধ্য ভ্রমণের আদর্শ জায়গা ছিল—অথচ কেউ তাঁকে এমন কিছু করতে দেখেনি যাকে এক কথায় বিকট বীভৎস বলা চলে। কিন্তু তাঁর গোরস্থান ভ্রমণের কুখ্যাতি বাচ্চা ছেলে পর্যন্ত জেনে গিয়েছিল।

পটুক্সেট রোডে কারওয়েনের একটা খামার বাড়ী ছিল। গ্রীষ্মকালে এইখানেই থাকতেন তিনি। তখন তাঁকে হামেশাই দেখা যেত ঘোড়ায় চড়ে দিনে অথবা রাতে টো টো করতে। খামার বাড়ীতে তাঁর সেবাযত্ন করার জন্যে লোক ছিল মাত্র দুজন। নারাগানসেট ইণ্ডিয়ান দম্পতি। স্বামীটির সারা মুখে গায়ে অদ্ভুত আঁচড়ের দাগ—কথা বলতে পারে

না—বোবা। বউটির মুখ দেখলেই দূর থেকে সরে পড়তে ইচ্ছে হয়।

এই বাড়ীর লাগোয়া ল্যাবোরেটরীতে কেমিক্যাল এক্সপেরিমেণ্টগুলো করতেন কারওয়েন। বোতল, বস্তা আর বাক্স ডেলিভারী দিতে এসে পেছনের দরজায় দাঁড়িয়ে কৌতূহলী কুলিরা উঁকি দিত ভেতরকার অদ্ভূত-দর্শন ফ্লাস্ক, বাটি, বকযন্ত্র আর চুল্লির দিকে। বলত ফিস ফিস করে, কাইমিস্ট (অ্যালকেমিস্টকে ওরা কাইমিস্ট বলত) এবার পরশ পাথর আবিষ্কার করে ছাড়লেন বলে—বেশী দেরী আর নেই।

খামার বাড়ীর নিকটতম প্রতিবেশী ফেনার পরিবার থাকত সোয়া মাইল তফাতে। অতদূর থেকেও কিন্তু নিশুতি রাতে শুনতে পেত খামার বাড়ীর দিক থেকে ভেসে আসা অদ্ভুত শব্দের পর শব্দ। শব্দগুলো যেন কাদের আর্ত-চীৎকার অথবা গজরানি।

ফেনাররা অবাক হতো আরও একটি ব্যাপার দেখে। খামার বাড়ীতে মানুষ বলতে তো ঐ তিন জন। অথচ অত ছাগল ভেড়া মুরগী থাকত কেন? অত মাংস, দুধ, উল ঐ তিনজনের দরকারের পক্ষে অনেক …অনেক বেশী। তা সত্ত্বেও ফি হপ্তায় ছাগল, ভেড়া, মুরগীর সংখ্যা কেন কমে যেত এবং কিংস টাউন চাষীদের কাছ থেকে ফের কিনে আনতে হত? সবচাইতে যাচ্ছেতাই ব্যাপার হল পাথরের তৈরী একটা পেল্লায় বাড়ী। বাড়ীটায় নাকি জানলা বলতে খানকয়েক সরু ছেঁদা ছাড়া আর কিস্সু নেই।

কারওয়েনের ওলনি কোর্টের বাড়ী প্রসঙ্গেও অনেক গুজব রটেছিল গ্রেট ব্রীজ অঞ্চলে। ১৭৬১ সালে নির্মিত নতুন বাড়ী নিয়ে যত না রটনা রটেছে, তার চাইতে অনেক বেশী কানাকানি হয়েছে প্রথম বাড়ীটা নিয়ে। কারওয়েনের বয়স যখন প্রায় শত বছর, তখন তিনি পুরোনো বাড়ীটা ভেঙে নতুন বাড়ী তৈরী করান। পুরোনো বাড়ীটার ছাদ নীচু, চিলে কোঠার সারি সারি ঘরে জানলার বালাই ছিল না। দেওয়াল এত খাড়াই যে ওপরে ওঠা যেত না। কারওয়েন বাড়ীটা ভেঙে ফেললেন বটে, কিন্তু জানলাবিহীন চিলেকোঠার প্রতিটি কড়ি বরগা পুড়িয়ে ছাই করলেন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। অদ্ভুত এই কাণ্ড দেখে তখনই খটকা লেগেছিল সন্দেহবাতিকদের মনে। রহস্য তখনও তেমন দানা বাঁধে নি ওলনি কোর্ট ঘিরে—যদিও প্রতিবেশীরা চমকে চমকে উঠত সুস্পষ্ট ছাড়া কতকগুলো ব্যাপার লক্ষ্য করে। যেমন, গভীর রাতে যখন কোথাও আলো জ্বলবার কথা নয়—কারওয়েনের বিশাল পুরীর জানলায় জ্বলত আলো। কারওয়েনের সেবাদাস বলতে ছিল দুজন পরদেশী পুরুষ।

দুজনেই কেমন জানি চোরের মত পা টিপে টিপে বাড়ীর বাইরে আসত অথবা ভেতরে যেত। হাউস-কীপার লোকটা ফরাসী। দুর্বোধ্য ফরাসীতে কদাকার ভঙ্গিমায় কি যে ছাই বক বক করত, বোঝাও যেত না। বাড়ীর মধ্যে প্রাণী তো মোটে চারজন—অথচ চৌকাঠ পার করে ভেতরে চালান হত রাশি রাশি ভারা ভারা খাবার দাবার। নিশুতি রাতে বাড়ীর মধ্যে কারা যেন ভয়াল চাপা গলায় কথাবার্তা কইত। এইসব লক্ষণ দেখেই কিন্তু আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গিয়েছিল পটুক্সেট খামারবাড়ীর প্রতিবেশীদেরও।

জ্ঞানীগুণী মহলে কারওয়েন ভবন নিয়ে কম আলোচনা হয়নি। নবাগত কারওয়েনকে আস্তে আস্তে সবার সঙ্গে মিশতে হয়েছে। বাজারহাটে গির্জেতে যেতেই আলাপ পরিচয় ঘটেছে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে—যাদের সঙ্গ আর কথাবার্তা কারওয়েনের মত মানুষের ভাল লাগা উচিত। কারণ, তিনি জন্মেছেন সদ্‌বংশে। নিউ ইংলণ্ডে সালেমের কারওয়েন পরিবারের পরিচয় দরকার হয় না। উনি নিজেও নাকি ছোটবেলায় অনেক দেশ বেড়িয়েছেন। বারদুয়েক প্রাচ্যে গেছেন। ইংলণ্ডেও বেশ কিছুদিন ছিলেন। কথাবার্তা তাই মার্জিত ইংরেজের মতনই। কিন্তু কি কারণে জানা নেই সামাজিকতার ধার ধারতেন না একদম। মুখে কাউকে দূরে দূরে না করলেও, এমন একটা অদৃশ্য গণ্ডী দিয়ে নিজেকে ঘিরে রাখতেন—লোকসমাজ থেকে তফাতে থাকতেন যে অনেকেরই ধারণা ছিল কারওয়েন আর যাই হোন, ছিটগ্রস্ত মোটেই নন। তালকানা নন—হুঁশিয়ার।

কারওয়েনের কাট-কাট কথাবার্তা আর উদ্ধত মেজাজ দেখে মনে হত পৃথিবীর সব মানুষই যেন তাঁর কাছে একপাল গবেট এবং তিনি নিজে অনেক উন্নত, সভ্য, বিচিত্র ধীশক্তির সংসর্গ করে এসেছেন। ডক্টর চেকলে বিদগ্ধ ব্যক্তি। ১৭৩৮ সালে বোস্টন থেকে তিনি কিংস চার্চের রেকটর হয়ে এলেন। আসবার পর যে লোকটি সম্বন্ধে এত কথা শুনেছেন, স্বভাবতঃই বাড়ী বয়ে গেলেন তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে। কিন্তু ফিরে এলেন মুখখানা হাঁড়ি করে। কারওয়েনের কথাবার্তার মধ্যে এমন একটা প্রচ্ছন্ন পৈশাচিক আভাস তিনি লক্ষ্য করেছেন যার পর আর ও বাড়ীতে বসা যায় না।

শীতের একরাতে বাপের কাছে কারওয়েন প্রসঙ্গে গল্প করতে বসে চার্লস বলেছিল, সেদিন ডক্টর চেকলেকে জোসেফ কারওয়েন কি কি বলে ছিলেন, তার প্রতিটি কথা নাকি সে বলতে পারে। অথচ কোনো

ডাইরীতে সে সব কথাবার্তা লেখা ছিল না। কেননা, ডক্টর চেকলে নিজেই মুখ খুলতে রাজী হননি। বাড়ী থেকে থমথমে মুখে বেরিয়ে আসার পর এ ব্যাপারে সেই যে মুখে চাবি ঝুলিয়ে ছিলেন—চাবি আর খোলেননি। বরং প্রসঙ্গটা কেউ উত্থাপন করলেই তাঁর সদাপ্রসন্ন হাসিহাসি মুখখানা নিমেষ মধ্যে যেন কালো ঝামার মত কদাকার হয়ে উঠত। বেশ বোঝা যেত, প্রচণ্ড শক খেয়েছেন ভদ্রলোক কারওয়েনের কথাবার্তায়।

উদ্ধত তাপস কারওয়েনকে কেন সমপর্যায়ের শিক্ষিত রুচিসম্পন্ন মানুষ এড়িয়ে চলত, তার আরও একটা মোক্ষম কারণ আছে। ১৭৪৬ সালে নিউপোর্ট থেকে জন মেরিট নামে এক বিজ্ঞান আর সাহিত্য জানা ইংরেজ ভদ্রলোক শহরে এলেন বসবাসের জন্যে। শহরের সেরা নাগরিক-এলাকায় বাড়ীও করলেন। চাকর বাকর, গাড়ীঘোড়া, মাইক্রোসকোপ, টেলিস্কোপ আর দামীদামী দুষ্প্রাপ্য বই ঠাসা একখানা লাইব্রেরী নিয়ে রাজার হালে ছিলেন জন মেরিট। একদিন শুনলেন, প্রভিডেন্সে সবসেরা লাইব্রেরীটির মালিক কিন্তু জোসেফ কারওয়েন। শুনেই দৌড়োলেন কারওয়েনের বাড়ী। কারওয়েন অন্যান্যদের যে রকম নিরুত্তাপ অভ্যর্থনা জানান, জন মেরিটের ক্ষেত্রে দেখালেন ঠিক তার উল্টো। পরম সমাদরে খাতির করে নিয়ে গেলেন গ্রন্থাগারে। জন মেরিটের চক্ষুস্থির হয়ে গেল তাকভর্তি গ্রীক, ল্যাটিন, ইংলিশ ক্লাসিক ছাড়াও দর্শন, গণিত, বিজ্ঞানের নানাবিধ বই দেখে। কারওয়েন তখন সবিনয় প্রস্তাব করলেন, খামার বাড়ীটায় একবার গেলে হয় না?

কারওয়েন কিন্তু ভুলেও কোনোদিন কাউকে খামার বাড়ী আর ল্যাবোরেটরীতে নেমতন্ন করতেন না। জন মেরিট তাই আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। নিজের গাড়ীতেই কারওয়েনকে নিয়ে রওনা হলেন খামার বাড়ী অভিমুখে সেই মুহূর্তেই।

পরে কিন্তু জন মেরিট একটা কথাই বারবার বলেছেন—খামার বাড়ীতে বিসদৃশ তেমন কিছু তিনি দেখেন নি। কিন্তু সামনের ঘরে রাখা ইন্দ্রজাল বিদ্যা, অপরসায়ন বিদ্যা আর পরমার্থ তত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তর বইয়ের নাম দেখেই নাকি তাঁর গা ঘিন ঘিন করে উঠেছিল—কারওয়েন সম্বন্ধে সব শ্রদ্ধা মন থেকে উবে গিয়েছিল। কারওয়েন কিন্তু জন মেরিটকে বইগুলো দেখানোর সময়ে মুখখানা এমন করেছিলেন যাতে বোঝা গিয়েছিল প্রতিটি বই তাঁর নয়নের মণি। এ বই যে-কোনো বিদগ্ধ ব্যক্তি দেখলেই চমকে উঠলেন, শিউরে উঠবেন। ডাকিনী বিদ্যা,

পিশাচ বিদ্যা, জাদু বিদ্যা নিয়ে যারা চর্চা করে—এই বই তাদের লাইব্রেরীতেই মানায়। সেই সঙ্গে রয়েছে অপরসায়ন বিদ্যা আর জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত দুর্লভ বহু কেতাব, মধ্যযুগীয় ইহুদি আর আরবদের লেখা বিস্তর গ্রন্থ। বিশেষ একখানি বই টেনে নামিয়ে পাতা ওলটাবার পর নাকি জন মেরিটের মুখ থেকে সমস্ত রক্ত নেমে গিয়েছিল। বইখানা সুন্দরভাবে বাঁধানো, পরিষ্কারভাবে লেবেল লাগানো। বইয়ের নাম কানুন-ই-ইসলাম। উন্মাদ আবদুল আলহাজরেদের নিষিদ্ধ 'নেকরোনোমিকন' চোখের সামনে দেখে হাত কেঁপে উঠেছিল জন মেরিটের। কেননা তিনি জানতেন পিশাচসিদ্ধ এই আবদুল ম্যাসাচুসেটস বে'র কিংসপোর্ট জেলেদের গ্রামে নামহীন আতংকে ঘেরা অজ্ঞাত অনেক অনুষ্ঠানের নায়ক ছিল। সে সব দানবিক ব্যাপারের বৃত্তান্ত নাকি মুখে না আনাই ভাল।

কিন্তু জন মেরিট যে ব্যাপারটায় ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে পড়লেন সেটা নাকি খুবই তুচ্ছ একটা বিষয়। অথচ কেন যে তিনি রাতের ঘুম পর্যন্ত হারিয়ে ফেললেন, সে রহস্য বোঝা ভার। মেহগনী কাঠে তৈরী মস্ত টেবিলটায় উপুড় করে রাখা একটা বই তুলে তিনি দেখলেন, বইটা বোরিলাসের লেখা। পাতা মুড়ে গেছে বহু পঠনের ফলে। অনেক জায়গায় কারওয়েন দাগ দিয়ে রেখেছেন।

বইটা খোলা ছিল মাঝামাঝি জায়গায়। একটা প্যারাগ্রাফ কম্পিত হাতে মোটা কালির দাগে দাগানো। অক্ষরগুলি এমনিতেই কালো আর গোদাগোদা, তারওপর কালি দিয়ে দাগানো। তাই না পড়ে থাকতে পারলেন না জন মেরিট।

অনুচ্ছেদটা ঐ রকম কাঁপা লাইনে চিহ্নিত করার জন্যেই হোক অথবা পংক্তিগুলোর অস্পষ্ট অথচ কুটিল মানের জন্যেই হোক, জন মেরিটের অন্তরাত্মা পর্যন্ত নাকি শুকিয়ে গিয়েছিল শেষ লাইন অবধি পড়বার পর। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সবকটা লাইন তাঁর স্পষ্ট মনে ছিল। ডাইরীতেও লিখে রেখেছেন, পরম বন্ধু ডক্টর চেকলেকেও শুনিয়েছেন। রেক্টর ভদ্রলোকও অস্থির হয়ে পড়েছিলেন যা শুনে, তা এই ঃ

'জীবদেহের সার থেকে এমন জান্তব-চূর্ণ বানিয়ে রেখে দেওয়া যায়, যা থেকে উদ্ভাবক পুরুষ নোয়ার পুরো নৌকোটা জন্তু জানোয়ার সমেত বানিয়ে নিতে পারে, অথবা যখন খুশী যে কোনো জন্তুর ছাই থেকে সেই জন্তুর নিখুঁত অবয়বকে মূর্ত করতে পারে। একই পন্থায় একজন

দার্শনিকও পুড়িয়ে উড়িয়ে দেওয়া স্বর্গতঃ পূর্বপুরুষের ধুলো থেকে বিশেষ সেই ঊর্ধ্বতম পুরুষটির জাগরণ ঘটাতে পারে। এটা প্রেতসিদ্ধ নয়, পিশাচবিদ্যা নয়, অন্যায় অপরাধ নয়। মানব ধুলোর জান্তব চূর্ণ থেকে মানুষ সৃষ্টি সম্ভব। বোরিলাস।'

সবচেয়ে কুৎসিত কথাবার্তা রটল অবশ্য বন্দর অঞ্চলে—টাউন স্ট্রীটের দক্ষিণে। পোড় খাওয়া লোকজনের ভীড় সেখানে। কুসংস্কারে ভরপুর তাদের মন। খালাসী, কুলি, মদের দোকানদার, এমন কি বড় বড় নৌকোর মালিক ব্রাউন, ক্রফোর্ড আর টিলিনঘাস্টরাও ঈষৎ কুব্জ, দীর্ঘ পাতলা জোসেফ কারওয়েনের ছদ্ম যৌবন দেখলেই গা-ঢাকা দেওয়ার পথ খুঁজতো। কারওয়েনের হলদে চুল হাওয়ায় উড়তো—কোনো দিকে না তাকিয়ে হনহন করে ঢুকতেন কারওয়েন গুদামে, কথা বলতেন ক্যাপ্টেনদের সঙ্গে। দূরে ভাসত সারি সারি কারওয়েন জাহাজ—জেটির ওপর স্তূপাকারে পড়ে থাকত তাঁর কিম্ভুতকিমাকার মালপত্র।

কারওয়েনের নিজের কেরাণী আর ক্যাপ্টেনরাও তাঁকে ভয় পেত। দুচক্ষে কারওয়েনকে দেখতে পারত না। ওঁর সব নাবিকই অবশ্য দোআঁশলা—আমদানী করতেন ম্যার্টিনিক, সেণ্ট অস্টেন, হাভানা আর পোর্টরয়াল থেকে। কিন্তু বেশী দিন কেউই টিঁকতো না। ফলে এন্তার নয়া নাবিক আমদানী করতে হত কারওয়েনকে। এই ব্যাপার-টাই কিন্তু সবচেয়ে বেশী ভাবিয়ে তুলেছিল বন্দরের লোকজনদের এবং কারওয়েনকে যমের মত ভয় পেত শুধু এই একটা কারণেই। নাবিকদের কাজ দিয়ে বা স্রেফ ছুটি দিয়ে তিনি ছেড়ে দিতেন। কাজগুলো অবশ্য সবই খামার বাড়ীর দিকে পড়ত। কিন্তু খামার বাড়ী থেকে কেউ নাকি আর ফিরত না। এই রকম একটা কানাকানি শুরু হতেই বাদবাকী নাবিকরা পালাতে শুরু করল চাকরী ছেড়ে। ফাঁপড়ে পড়ে কারওয়েনকে ঘনঘন নাবিক আমদানীর ব্যবস্থা রাখতে হয়েছিল। গুজব বড় সর্বনাশা জিনিস। অন্যান্য জাহাজের নাবিকরাও প্রভিডেন্সের নাবিক উধাও রহস্য শুনে কাজ ছেড়ে পালাতে লাগল অন্যত্র। ফলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল সব ব্যবসাদাররা।

১৭৬০ সালে দেখা গেল কায়ওয়েনকে একরকম একঘরে করে রাখা হয়েছে। অথচ কারণটা ভাসাভাসা। তিনি নাকি অনেক রকম পৈশাচিক কাণ্ডকারখানার নেপথ্য নায়ক। কিন্তু কিভাবে সেইসব নাটের গুরু তিনি, তা কেউ বলতে পারল না। পৈশাচিক, দানবিক, সেই কাণ্ড-গুলোও আদৌ ঘটেছে কিনা তাও কি নিশ্চিতভাবে কেউ জানে? লোকজন

উবে যাচ্ছে ঠিকই। সবচেয়ে বেশী লোক নিখোঁজ হয়েছে ১৭৫৮ সালে। সেই বছরেই মার্চ-এপ্রিলে নিউ ফ্রান্সে যাওয়ার পথে দুটো রয়াল রেজিমেণ্ট তাঁবু ফেলেছিল প্রভিডেন্সে এবং রোজই দেখা যেত অব্যাখ্যাতভাবে নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে দলে দলে সৈন্য। আশ্চর্য এই রহস্যর কিনারা কেউ করতে পারেনি। তবে তীব্র গুজব শোনা গিয়েছে, লালকোটধারী সৈনিকদের সঙ্গে যখন তখন নাকি কথা বলতে দেখা গেছে কারওয়েনকে। রাতারাতি সৈনিক পলায়নের হিড়িক দেখে দেশবাসীদের মনে পড়েছে কিভাবে নাবিকরাও বলা নেই কওয়া নেই উধাও হয়ে যায় চাকরী ছেড়ে। সামরিক অধিকর্তারা সৈন্যসামন্ত নিয়ে এই সময়ে রওনা না হলে শেষ অবধি কি যে ঘটত ভাবতেও নাকি শিউরে ওঠে দেশের লোক।

এদিকে কিন্তু দিনে দিনে ফুলে ফেঁপে উঠছে কারওয়েনের ব্যবসা। একছত্র কারবার ফেঁদে বসে ছিলেন তিনি—টক্কর দেওয়ার মত কেউ ছিল না। শহরের সোরা, মরিচ, দারুচিনির পুরো কারবার তিনি মুঠোয় মধ্যে রেখেছিলেন। অন্যান্য জাহাজী কারবারেও নাক গলিয়েছিলেন—কয়েকটি ছাড়া। যেমন, পেতল, তুঁতে, তুলো, উল, নুন, রশি, লোহা, কাগজ আমদানী তিনি ব্রাউনদের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু অন্যান্য দোকানদাররা তাঁর সাহায্য ছাড়া কারবার চালাতে পারত না। যারা মদ চোলাই করে, মাখন চীজ বানায়, ঘোড়ায় ব্যবসা করে, মোমের বাতি তৈরী করে—কারওয়েন ছাড়া তাদের গতি নেই তৈরী মাল রপ্তানীর ব্যাপারে।

যত কুকথাই রটুক না কেন কারওয়েন প্রসঙ্গে, সমাজসেবায় কিন্তু তাঁর উৎসাহের অভাব দেখা যায় নি। কলোনী হাউস পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার পর নতুন বাড়ী তৈরী করার সময়ে লটারী ফাণ্ডে মোটা চাঁদা দিয়েছিলেন তিনি একা। সেই বছরেই গ্রেট ব্রীজ নির্মাণের ব্যাপারে তাঁর অবদান ভোলবার নয়। পাবলিক লাইব্রেরীতে বই কিনে দিয়েছিলেন মোটা টাকার। দেদার টাকা ঢেলে পাথর দিয়ে ফুটপাত বানিয়ে দিয়েছিলেন রাস্তাঘাটের। নিজের অনবদ্য বাড়ীটিও তিনি বানিয়ে নিয়েছিলেন এই সময়ে—সে বাড়ীর দরজাখানার কারুকাজই নাকি দেখবার মত। নতুন একটা গির্জে নির্মাণের সময়েও তাঁর উৎসাহ দেখা গিয়েছিল—অবশ্য এই একটি ব্যাপারে উৎসাহ ঝিমিয়ে পড়েছিল অচিরে। কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই বদান্যতা শুরু করেছিলেন অন্যান্য দিকে—

কারণটা বোধহয় উনি বুঝতে পেরেছিলেন বেশী দিন একঘরে অবস্থায় থাকলে তাঁর ব্যবসার ক্ষতি হতে পারে—কারবার লাটেও উঠতে পারে।

২

টাকায় কি না হয়। কারওয়েনের টাকার ওষুধেও কাজ হল। আগে যাঁকে দেখলে গা শিরশির করত, একশ বছর বয়েসেও যাঁকে যুবক পুরুষ মনে হত, যাঁর গোপন কার্যকলাপের প্রকৃত বৃত্তান্ত কারোরই জানা ছিল না, অথচ ভয় পেত, সঙ্গ এড়িয়ে চলত—সেই লোকটাই হঠাৎ অস্পষ্ট আতংক-মেঘের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলেন—লোকের মন জয় করতে বদ্ধপরিকর হলেন—হতাশ হলেন না। টাকায় সব হয়।

অবশ্য একই সময়ে নাবিক নিখোঁজের হিড়িকও হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গোরস্থানে টোঁ-টোঁ করাও তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন—অথবা এমন সময়ে বেরোতেন যে কেউ আর দেখেনি। পটুক্সেট খামারবাড়ীর দিক থেকে ভেসে আসা লোমখাড়াকরা আওয়াজগুলোও অতর্কিতে যেন অনেক কমে গিয়েছিল।

ওঁর নিজের খাওয়ার পরিমাণ কিন্তু কমেনি। ছাগল-ভেড়া-মুরগীর খোঁয়াড় যাতে কখনো খালি না যায়,—তীক্ষ্ন নজর ছিল সেদিকে। কেনাকাটা কিছু কমেনি।

আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার আবিষ্কার করেছিল চার্লস ওয়ার্ড। ১৭৬৬ সালে কারওয়েন আফ্রিকার গিনি অঞ্চল থেকে অনেক কাফ্রী আনিয়েছিল জাহাজে। কিন্তু হিসেবপত্রে দেখা যাচ্ছে, তার চাইতে অনেক কম কাফ্রী বিক্রি করেছেন দাসব্যবসায়ীদের কাছে। গ্রেট ব্রীজ নির্মাণের কাজে অথবা চাষীদের কাছেও এত নিগ্রো তিনি পাঠাননি। মাঝখান থেকে এতগুলি কাফ্রী যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

জোসেফ কারওয়েন নিঃসন্দেহে ধুরন্ধর। তাঁর ঘোর কুটিল দুর্দান্ত চরিত্রের ভেতরে শয়তানি যা ছিল—তা বোধহয় এই একটি নজীরেই সুস্পষ্ট।

টাকার ওষুধ ধরল ঠিকই, কিন্তু এতগুলো বিকট ব্যাপারের স্মৃতি তো মন থেকে একেবারে মুছে যেতে পারে না। তাই আগের মত না হলেও, লোকে এড়িয়ে চলতে লাগল কারওয়েনকে। ওঁর সদাশয়তা কেউ বিশ্বাস করতে পারত না। কারণ সেই একটা—এত বছর বয়েসেও তিনি যৌবনকে ধরে রেখেছেন কোন মন্ত্রে?

কারওয়েন বোকা ছিলেন না। তিনি বুঝলেন, এভাবে বেশীদিন চললে তাঁর রোজগারে টান পড়বে। পড়াশুনা আর এক্সপেরিমেণ্টের জন্যে বিস্তর টাকার দরকার হত বলেই ব্যবসাটাকে আগে ঠিক রাখা দরকার। প্রভিডেন্সে পাততাড়ি গুটিয়ে অন্যত্র ব্যবসা ফাঁদলেও এতদিনের মেহনৎ জলে যায়। তাই ফন্দী আঁটলেন লোকজনের সঙ্গে ভাব জমিয়ে নেওয়া যাক, যাতে তাঁকে দেখে কেউ আর সরে না যায়। আড়ালে কানাকানি না করে, বাজে অছিলায় পালিয়ে না যায়। নিজের কেরাণীর সংখ্যাও কমতে কমতে এমন ক'জনে এসে ঠেকেছে যাদের আর কোথাও গতি নেই। তাই বড় ভাবনায় পড়েছিলেন কারওয়েন। ক্যাপ্টেন আর খালাসীদের নানা রকম ঘুষ আর পদোন্নতির লোভ দেখিয়ে আটকে রেখেছিলেন চাকরীতে। কিসে তাদের উপকার হয়, এ খবরগুলি কিন্তু যেন ভূতের মুখে শুনে সেই সব উপকার করে বসতেন কারওয়েন। সব পরিবারেই কিছু না কিছু গুপ্ত রহস্য থাকে। কারওয়েন যেন জাদুমন্ত্রবলে তা জেনে ফেলতেন! তাঁর জীবনের শেষ পাঁচটা বছরে এই ধরনের এমন সব ঘটনা ঘটেছে যা দেখে শুনে সাধারণ লোকের বিশ্বাস, কারওয়েন পরলোকবাসীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতেন। তা নাহলে অত খবর গড়গড় করে নাকি বলা যায় না।

ধড়িবাজ কারওয়েন বেগতিক দেখে নতুন ফন্দী আঁটলেন। মরিয়া হয়ে এমন একটি পন্থার কথা চিন্তা করলেন যার ফলে সমাজে মেলামেশা সহজ হবেই। প্রতিপত্তি ফিরে আসবেই। এতদিন তিনি ছিলেন রুক্ষ তাপস—ব্রহ্মচারী। এবার ঠিক করলেন বিয়ে করবেন। এমন একটি মেয়েকে বউ করবেন যার নামোচ্চারণেই আদ্দেক কাজ হয়ে যাবে—সমাজচ্যুতির অবসান ঘটবে। বিয়ের আরও একটা গুপ্ত উদ্দেশ্য অবশ্য ছিল। সেটা গুপ্তই থেকে গিয়েছে তাঁর মৃত্যুর দেড়শ বছর পরেও। কিছু কিছু কাগজপত্র যা পাওয়া গিয়েছে—তা থেকে একটা ভয়ংকর সন্দেহ মনের মধ্যে উঁকি দেয় বটে, কিন্তু তার বেশী কিছু জানা যায় না।

কাজেই তাঁকে মেয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সবাই যে বেঁকে বসবে, আঁৎকে উঠবে—কারওয়েন তা আঁচ করেই অন্য পথে কনে সংগ্রহের কথা ভাবতে লাগলেন। আবার যে-সে মেয়ে হলে তো চলবে না, সুন্দরী হওয়া চাই, মার্জিতা হওয়া চাই, সমাজে নামডাক থাকা চাই। অথচ এমন বাপের মেয়ে হওয়া চাই যাকে চাপ দিয়ে রাজী করাতে পারেন কারওয়েন।

এরকম মেয়ে পাওয়া মুশকিল। খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে পেয়েও গেলেন। তাঁর জাহাজী ক্যাপ্টেনদের মধ্যেই পেলেন হবু শ্বশুরকে। ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে, ক্যাপ্টেনগিরিও ভাল করেন। বিপত্নীক। একটিই মেয়ে। নাম, ইলিজা। ক্যাপ্টেনের নাম ডুটি টিলিনঘাস্ট। মেয়েটি ঘরসংসারের কাজ এতদিন একাই দেখেছে। পাত্রী হিসেবে জুড়ি নেই—কিন্তু বাপের কানাকড়িও নেই।

এমন শ্বশুরই খুঁজছিলেন কারওয়েন। ডুটি টিলিনঘাস্ট এমনিতেই মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে বসেছিল কারওয়েনের কাছে। তাই অল্প চাপেই কাজ হল। পাত্রীর বাড়ীতে বসেই বিয়ের কথা পাড়লেন কারওয়েন এবং অসহায় ডুটি টিলিনঘাস্টকে নারকীয় বিয়েতে রাজী করিয়ে ছাড়লেন।

ইলিজার বয়স তখন আঠারো। খুব নরম স্বভাবের মেয়ে। গুটি বসন্তে মা মারা যাওয়ার আগে পর্যন্ত মেয়েকে মা স্কুলে পড়িয়েছেন, অনেক সৎশিক্ষা দিয়েছেন। মায়ের মৃত্যুর পর সংসার দেখেছে সে একা। সুতরাং বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে যেতেই বাপের সঙ্গে লাগল তার ঝগড়া। কিন্তু লাভ হল না কিছুই। অনেক আগেই তার বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়েছিল 'এনটারপ্রাইজ' জাহাজের সেকেণ্ড মেট এজরা উঈডেনের সঙ্গে। সেই বিয়ে গেল ভেঙে। ১৭৬৩ সালের মার্চ মাসে বিয়ে হয়ে গেল জোসেফ কারওয়েনের সঙ্গে।

বিয়ের দিন ব্যাপটিস্ট চার্চে শহরের গণ্যমান্য সব ব্যক্তিই হাজির ছিলেন। বিয়ে দিলেন স্যামুয়েল উইলসন। বিয়ের খবরটি যদ্দুর সম্ভব ছোট করে প্রকাশ করা হল গেজেটে। কিন্তু গেজেটের সেই সংখ্যার যে কটি কপি খুঁজেপেতে উদ্ধার করা গেল, দেখা গেল তার প্রতিটিতে বিশেষ ঐ খবরটি কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলে দেওয়া হয়েছে। নাছোড়বান্দা চার্লস তা সত্ত্বেও একজনের বাড়ী থেকে একটা কপি জোগাড় করে খবরটা পড়ে নিয়েছিল। লেখাটা এই ঃ

'সোমবার সন্ধ্যায় এই শহরের ব্যবসায়ী জোসেফ কারওয়েনের সঙ্গে ক্যাপ্টেন ডুটি টিলিনঘাস্টের মেয়ে ইলিজা টিলিনঘাস্টের বিয়ে হয়েছে। ইলিজা সুন্দরী, স্বভাবচরিত্রও খুব ভাল এবং মিশুকে।'

জর্জ স্ট্রীটের মেলভিল পিটার্সের বাড়ীতে বেশ কয়েকখানা পুরোনো চিঠি-উদ্ধার করেছিল চার্লস। সেই চিঠিতেই জানা গেল কি পরিমাণ ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ আতংকিত হয়েছিল দেশের জনসাধারণ অলুক্ষুণে এই বিয়েতে। টিলিনঘাস্ট পরিবারের প্রভাব ছিল সমাজে। তাই লোকে

ছিঃ ছিঃ করলেও ইলিজার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে এল কারওয়েনের বাড়ীতে। এমন সব লোকের যাতায়াত শুরু হল বিয়ের পর থেকে যাদের পায়েও ধরেও বাড়ী আনতে পারতেন না কারওয়েন।

অবশ্য সবাই এল না। ইলিজার নামডাক সত্ত্বেও বেশ কিছু লোক বর্জন করে রইল কারওয়েন ভবন। তা সত্ত্বেও কারওয়েন আগের মত আর পুরোপুরি এক ঘরে অবস্থায় রইলেন না।

বউকে আদর-যত্ন করার ব্যাপারে কিন্তু ভেল্কী দেখালেন কারওয়েন। এতটা আশা করে নি ইলিজা বা দেশের লোক। তাই সবারই চক্ষুস্থির করে ছাড়লেন কারওয়েন। বড় মধুর ব্যবহার করে চললেন বউয়ের সঙ্গে। ইলিজার মনে এতটুকু আঘাত লাগতে দিলেন না। ওলনি কোর্টের নতুন ভবনেও পিলে চমকানো আওয়াজ-টাওয়াজ একদম থেমে গিয়েছিল। পটুক্সেট খামারবাড়ীতেও যাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। বউকেও কখনো নিয়ে যান নি। এত ভালভাবে জীপনযাপন করতে এর আগে কখনো তাঁকে দেখা যায় নি।

একজন, শুধু একজনই, মর্মান্তিক রেগে রইল তার ওপর—নাম তার এজরা উঈডেন, জাহাজের সেই অফিসার যার সঙ্গে ইলিজার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। এজরা খোলাখুলি বলে বেড়াতো, প্রতিশোধ সে নেবেই। দিন নেই, রাত নেই এই এক সংকল্প তুষের আগুনের মত ধিকি ধিকি জ্বলত তার বুকের মধ্যে—প্রতিশোধ চাই, প্রতিশোধ!

১৭৬৫ সালের মে মাসে কারওয়েনের একটি মেয়ে হল। সেই তাঁর একমাত্র সন্তান—নাম, অ্যান। কিন্তু গির্জে আর শহরের যে সব জায়গায় জন্মের বিবরণ লেখা থাকার কথা, চার্লস ওয়ার্ড সে সব জায়গায় গিয়ে দেখলে, সযত্নে এবং বেশ নিখুঁতভাবে বিবরণটি কেটে মুছে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চার্লসের মাথায় তখন গোঁ চেপেছে। কারওয়েন তার পূর্বপুরুষ এই খবর পাওয়ার পর থেকেই উদগ্র উত্তেজনা তাকে পেয়ে বসেছিল। তাই খুঁজে খুঁজে ঠিক বার করেছিল খবরটা। এই উদগ্র উত্তেজনাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কাল হল। পাগল হয়ে গেল চার্লস ওয়ার্ড।

অ্যান টিলিনঘাস্ট পটার যে চার্লসের বৃদ্ধ-প্রমাতামহী, এই খবর জেনে ছিল বলেই ডক্টর গ্রেভসের কাছে খোঁজ নিয়েছিল সে। ইনি বিদ্রোহের সূচনাতেই বেশ কিছু চিঠি নিয়ে দেশত্যাগ করেছিলেন। জন্মবৃত্তান্ত ছিল সেই চিঠির মধ্যে।

মেয়ের জন্মের দিন কয়েক পরেই কারওয়েন ঠিক করলেন নিজের ছবি

আঁকাবেন। কসমো আলেকজাণ্ডার নামে একজন স্কচ শিল্পী নিউপোর্টে থাকত। ছবি আঁকত খুব ভাল। একে দিয়েই নিজের অয়েল পেণ্টিং আঁকালেন কারওয়েন। ছবিটা আঁকা হয়েছিল নাকি ওলনি কোর্ট ভবনের লাইব্রেরী ঘরের দেওয়ালের কাঠে। কিন্তু দু'দুটো পুরোনো ডাইরী খুঁজেও চার্লস সন্ধান পেল না সেই ছবির।

এই সময় থেকেই থেকেই জোসেফ কারওয়েনকে ভীষণ উত্তেজিত অবস্থায় দেখা গিয়েছিল। চাপা উৎকণ্ঠায় যেন ছটফট করতেন অহোরাত্র। বিরাট একটা আবিষ্কারের যেন দেরী নেই। চব্বিশ ঘণ্টার বেশীর ভাগ সময় কাটাতেন পটুক্সেট খামার বাড়ীতে। সঙ্গে নিয়ে যেতেন রাশি রাশি রসায়ন আর অপরসায়নের বই। অতএব লোকে ধরে নিয়েছিল, আবিস্কারটা খুব সম্ভব রসায়ন অথবা অপরসায়ন সংক্রান্ত।

সমাজজীবন থেকে কিন্তু সরে যান নি। শহরের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির যারা ধারক ও বাহক, তাদের সাহায্য করেছেন। কাউকে বইয়ের দোকান খুলতে টাকা দিয়েছেন এবং নিজে সেই দোকানের খদ্দের হয়েছেন। 'গেজেট' পত্রিকা অনিয়মিত হয়ে গিয়েছিল, তাকে নিয়মিত ভাবে প্রতি বুধবার বার করেছেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে গভর্ণর হপকিন্সকে সমর্থন করেছেন, এমন কি জনসমক্ষে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতাও দিয়েছেন।

এজরা উঈডেন কিন্তু এসব ছলনায় ভোলেনি। তার চোখ শকুনের চোখের মতই অপলকে দেখে গিয়েছে কারওয়েনের প্রতিটি সৎকাজ। বুঝেছে, এ সবই মিথ্যে—শয়তানের সঙ্গে তাঁর গোপন দোস্তি ঢাকবার অছিলা—মুখে ধর্মের মুখোশ এঁটে তলায় তলায় চরম অধর্ম করে চলেছেন কারওয়েন। প্রতিহিংসা পাগল এজরা উঈডেন তাই কারওয়েনের ভাঁওতায় ভোলেনি। ভাল মন্দ সব কাজই একান্ত নিষ্ঠায় লক্ষ্য করে গেছে। গভীর রাতে ছোট নৌকা নিয়ে ভেসে থেকেছে নদীর জলে—কারওয়েন গুদোমে আলো জ্বললেই তৈরী হয়েছে পাছু নেওয়ার জন্য। নজর রেখেছে পটুক্সেটখামার বাড়ীর ওপরেই এবং চুপিসারে সেখানে হানা দিতে গিয়ে ইণ্ডিয়ান দম্পতির লেলিয়া দেওয়া কুকুরের কামড় থেকে বেঁচে গিয়েছে অল্পের জন্যে।

৩

জোসেফ কারওয়েনের চূড়ান্ত পরিবর্তন ঘটল ১৭৬৬ সালে। ঘটল

হঠাৎ। দেশশুদ্ধ লোক সভয়ে দেখল সেই পরিবর্তন। এতদিন যা উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিল, অকস্মাৎ তা প্রকট হয়ে উঠল বিজয়োল্লাসে।

জনগণ-কৌতূহল থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে গিয়ে কারওয়েনকেও বেগ পেতে হল যথেষ্ট। আবিষ্কারের আনন্দে উল্লসিত হওয়ার চাইতেও গোপনতার প্রয়োজন অনেক বেশী। প্রচণ্ড এই পরিবর্তনের পর থেকেই কুটিল কারওয়েন সাধারণ মানুষকেও চমকে দিলেন তাঁর সেই আশ্চর্য ক্ষমতাটা দেখিয়ে। যারা কোনকালে মরে ভূত হয়ে গেছে, তাদের পেটের খবরও যেন অলৌকিক উপায়ে জানতে পারতেন তিনি।

পরিবর্তনের ফলে কিন্তু তাঁর গোপন কার্যকলাপ কমল না—বরং বেড়ে গেল। ক্ষিপ্তের মত যেন তিনি উঠে পড়ে লাগলেন আরব্ধ কাজ সম্পন্ন করতে। দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার দরুন যে সব জাহাজী ক্যাপ্টেনের ট্যাঁক গড়ের মাঠ, স্রেফ ভয় দেখিয়ে জুলুমবাজি করে তাদের দিয়ে আরো চুটিয়ে শুরু করলেন ব্যবসা।

দাস ব্যবসা ছেড়ে দিলেন। গোলাম বেচে নাকি আর তেমন লাভ হচ্ছে না। যতক্ষণ পারতেন পড়ে থাকতেন পটুক্সেট খামার বাড়ীতে। গুজব শোনা গেল, কবরখানায় আর না গেলেও কবরখানার মতই অনেক জায়গায় তাঁকে দেখা যাচ্ছে। শুনে কপাল কুঁচকোলো দেশশুদ্ধ লোক। এর নাম কি পরিবর্তন? আদৌ মতিগতি পালটেছে বলে তো মনে হচ্ছে না!

এজরা উঈডেনকে প্রায় সমুদ্রযাত্রায় বেরোতে হত বলে অষ্ট প্রহর চোখ রাখতে পারত না কারওয়েনের ওপর। ওর মত প্রখর সন্ধানী দৃষ্টি, জেদ আর অধ্যবসায় শহরের আর কারো ছিল না। তাই যেটুকু সময় শহরে থাকত সে, খর দৃষ্টি রাখত বয়সে স্থবির অথচ চেহারায় যুবক কারওয়েনের ওপর।

রহস্যময় মানুষটা সম্বন্ধে অনেক খবর সংগ্রহ করল এজরা। কারওয়েনের জাহাজের গতিবিধি অতীব রহস্যজনক। তার অবশ্য একটা মানে আছে। ব্যবসাবাণিজ্য অব্যাহত রাখার জন্যে সব ঔপনিবেশিকরা এক কাট্টা হয়ে ঠিক করেছিল সুগার অ্যাক্ট বানচাল করবে—আইন ভাঙবে। শুল্ক ফাঁকি দিয়ে চোরাপাচার লেগেই থাকত নারাগানসেট উপসাগরে। রাতবিরেতে অবৈধ মাল নামত তীরে। কর্তৃপক্ষের চোখকে ফাঁকি দেওয়াটা তাই কেউ আর অপরাধ মনে করত না।

উঈডেন কিন্তু রাতের পর রাত হানা দিয়ে অন্য সন্দেহ করে বসল। টাউন স্ট্রীট ডকের কারওয়েন গুদোম থেকে ছোট ছোট হাল্কা

জলপোত বেরিয়ে চুপিসারে মিলিয়ে যেত রাতের আঁধারে। এত সর্তকতা যে শুধু আরক্ষা বাহিনীর সশস্ত্র জাহাজকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে নয়, তা বুঝতে বেশী দেরী হল না উঈডেনের। নিশ্চয় অন্য কোনো শয়তানি মতলব আছে শয়তান শিরোমণি কারওয়েনের।

১৭৬৬ সালে কারওয়েন পালটে যাওয়ার আগে এই সব জাহাজে আফ্রিকা থেকে আমদানী হত শেকলে বাঁধা নিগ্রো ক্রীতদাস। রাতের অন্ধকারে গা ঢেকে নিঃশব্দে জাহাজ এসে ভিড়তো পটুক্সেটের উত্তরের উপকূলে। সেখান থেকে নিগ্রোদের চালান করা হত চড়াই উৎরাই পেরিয়ে পটুক্সেট খামার বাড়ীতে। একটা বিরাট কদাকার পাথরের বাড়ী আছে সেখানে—যে বাড়ীতে জানলা নেই—শুধু কয়েকটা সরু ফুটো আছে। নিগ্রো গোলামদের তালা দিয়ে রাখা হত সেই প্রস্তর কারাগারে।

১৭৬৬ সালের পরিবর্তনের পর থেকেই পালটে গেল প্রোগ্রাম। ক্রীতদাস আমদানী বন্ধ হয়ে গেল হঠাৎ—নৈশ জাহাজ অভিযানও স্থগিত রাখলেন কারওয়েন।

১৭৬৭-র বসন্ত আসতেই নতুন পথ ধরলেন কারওয়েন। আবার শুরু হল ছোট জাহাজের নৈশঅভিযান। নিস্তব্ধ কৃষ্ণকালো ডক থেকে জাহাজগুলো শব্দহীন গতিবেগে উপসাগরের খানিকদূরে গিয়ে থামত নানকুইট পয়েণ্টের কাছাকাছি। অন্ধকারের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসত অদ্ভুতদর্শন, কিম্ভুতকিমাকার বিরাটকায় জাহাজের পর জাহাজ। মাল চালান হত এইসব জাহাজ থেকে কারওয়েনের জাহাজে। কারওয়েনের মাইনে করা নাবিকরা মাল তুলত জাহাজে। জাহাজ থেকে নামিয়ে দিত এবড়োখেবড়ো উপকূলে, সেখান থেকে ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে পেঁছে দিত খামার বাড়ীর রহস্যে ঘেরা সেই পাথর কারাগারে—যেখানে আগে বন্দী থাকত নিগ্রো ক্রীতদাসের দল। মালপত্র মানে সবই বাক্স আর প্যাকিং কেস। আকারে প্রতিটা প্রকাণ্ড, গড়নও অদ্ভুত এবং বেজায় ভারী। ঘাড়ে তুলেই গা ছাঁৎ করে উঠত। মনে হত যেন কফিন বয়ে নিয়ে চলেছে। দেখতে অবিকল সেই রকমই।

রাতের পর রাত অসীম ধৈর্য নিয়ে উঈডেন লক্ষ্য করে গেছে কারওয়েনের রাতের কাজ কারবার। একটুও ঢিলেমি দেয়নি। একটা সপ্তাহও বাদ দেয়নি। যখন বরফে জমি ঢেকে গিয়েছে, তখন পাছে পায়ের ছাপ দেখে কারওয়েন ধরে ফেলে, তাই দেখেছে দূর থেকে—কাছে যায় নি। যখন জাহাজ নিয়ে কাজে বেরোতে হয়েছে, ইলিয়াজার

স্মিথ নামে এক বন্ধুকে রেখে গেছে নজর রাখবার জন্যে। কিন্তু নৈশ অভিযান নিয়ে গুজব ছড়ায় নি—কাউকে একটা কথাও ফাঁস করেনি। করলে ওদেরই বিপদ। কানাঘুসো কারওয়েনের কানে পেঁছোবেই—হুঁশিয়ার হয়ে যাবে শতবর্ষের যুবক। তাই কাক পক্ষীকেও কিছু জানতে না দিয়ে নিজেরাই চমকপ্রদ সংবাদ সংগ্রহের আশায় পালাবদল করে নজর রাখতে লাগল কারওয়েনের ওপর। প্রতীক্ষা ওদের বিফলে যায়নি।

চার্লস ওয়ার্ড বাবার কাছে এই নিয়ে অনেক আক্ষেপ করেছে। উঈডেন নাকি নোটবইগুলো সব পুড়িয়ে ফেলেছিল। ফলে গায়ের লোম খাড়া করা চমকপ্রদ আবিষ্কারের কোনো খবরই আর পাওয়া যায়নি। কিন্তু গোঁয়ার চার্লস খুঁজতে খুঁজতে কয়েকজনের বাড়ীতে ভাসা ভাসা কয়েকটা বিবরণ পেয়েছিল। অগোছালো ভাষায় লেখা স্মিথের একটা ডাইরীও উদ্ধার করেছিল। অসংলগ্ন হলেই টুকরো-টাকরা খবর জোড়াতালা দিয়ে জানা গিয়েছিল, খামারবাড়ীর একটা খোলসমাত্র। খোলসের আড়ালে লুকোনো ছিল সীমাহীন আতংক। দুর্বোধ্য, অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় বহুবিধ ক্রিয়াকলাপের গোপন আলয় নাকি ঐ খামারবাড়ী—ছায়া আতংক নয়, নিরেট আতংক যেখানকার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সে আতংক এতই নিতল কুটিল ভয়াল ভয়ংকর যে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

অনেক আগে থেকেই নাকি স্মিথ আর উঈডেনের সন্দেহ হয়েছিল খামারবাড়ীর বাসিন্দা শুধু ইন্ডিয়ান দম্পতি নয়—আরও অনেকে। পাতাল ঘরে তাদের নিবাস। খামারবাড়ীর তলায় নাকি অজস্র সুড়ঙ্গ, কক্ষ, গোলকধাঁধা আছে। লোকজন লুকিয়ে আছে সেইখানে।

খামারবাড়ীটা কিন্তু সেকেলে ধাঁচের। চিমনী আছে। জানলায় বাহারি কাঁচ আছে। ল্যাবোরেটরীর ছাদ ঢালু হয়ে নেমে এসে প্রায় মাটিতে ঠেকেছে। বাড়ীর ধারে কাছে আর কিছু নেই। অথচ আওয়াজ টাওয়াজ যে হারে শোনা গিয়েছে, তাতে মনে হয় ঐ বাড়ীর মধ্যে দিয়েই পাতালপুরীতে যাওয়ার গোপন সুড়ঙ্গ আছে। ১৭৬৬ সালের আগে পর্যন্ত সেখানে শোনা গিয়েছে নিগ্রোদের গোঙানি, চীৎকার, ফিস-ফিসানি—মিশেছে অদ্ভুত কণ্ঠস্বরের মন্ত্রপাঠ এবং আহ্বান। ১৭৬৬-র পর অবশ্য নিগ্রোরা আর চেঁচায়নি। তার বদলে ভেসে এসেছে চাপা গলায় কাতরানি আর গজরানি, অনেক কণ্ঠস্বর কাকুতি-মিনতি, কথা কাটাকাটি, রাগারাগি, আচমকা হুংকার, চীৎকার। সবার ওপরে মাঝে

মাঝে শোনা গিয়েছে কারওয়েনের তীক্ষ্ন গলার ধমকানি। কখনো হুমকি দিয়েছেন, কখনো বজ্রকণ্ঠে চীৎকার করেছেন। অত ভাষার সব তিনি জানতেন। নইলে জবাব দিতেন কি করে।

মাঝে মাঝে মনে হত বেশ কিছু লোক রয়েছে বাড়ীর মধ্যে। কার-ওয়েন, অনেক কয়েদী আর কয়েদীদের প্রহরী। স্মিথ আর উঈডেন দুজনেই অনেক দেশ বেড়িয়েছে, অনেক ভাষা শুনেছে। কিন্তু রাতের অন্ধকারে যে সব ভাষায় খামার বাড়ীর কয়েদীরা কথা বলেছে, তার কোনো-টাই ওরা বুঝতে পারেনি—অথচ মনে হয়েছে ভাষাগুলো সেই সব দেশেরই—কিন্তু অবিকল সে রকম নয়। কথাবার্তার ধরন থেকে বোঝা গিয়েছে কারওয়েন যেন ভয় দেখিয়ে উৎপীড়ন করে আতংকিত কয়েদীদের পেট থেকে কথা বার করছেন।

উঈডেন ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ এই তিনটে ভাষা জানত। আড়ি পাততে গিয়ে তিনটে ভাষারই কিছু কিছু শব্দ কানে এসেছিল। হুবহু সে সব লিখে রেখেছিল নোট বইয়ে। কিন্তু আগুনে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে তার প্রতিটি। উঈডেন অবশ্য মুখে কিছু বলে গিয়েছিল। যেমন, কথাবার্তা বাস্তবিকই ভয়াল—রোমাঞ্চ জাগানো। প্রভিডেন্সের পরিবার-বর্গের পুরোনো কাহিনী নিয়ে আলোচনা হত। এ ছাড়াও, অনেক দূর দেশের আর বহু যুগ আগেকার বৈজ্ঞানিক আর ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ নিয়েও প্রশ্নোত্তর হত।

উদাহরণ স্বরূপ, একবার একজনকে ফরাসী ভাষায় জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল ১৩৭০ সালে ব্ল্যাক প্রিন্সকে খুন করার ব্যাপারে কোনো গুপ্ত কারণ আছে কিনা। যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল, সে কখনো ফুঁসছিল, কখনো নাকে কেঁদে মিনতি করছিল। দুটো কারণ উল্লেখ করেছিলেন কার-ওয়েন। কিন্তু সদুত্তর না পেয়ে বিষম রেগে গিয়ে নিশ্চয় মরণমার মেরেছিলেন। কেন না, আচমকা শোনা গিয়েছিল আকাশফাটা তীক্ষ্ন বীভৎস একটা চীৎকার, বিকট গোঙানি, ধপাস করে আছড়ে পড়ার শব্দ।

চোখে কিন্তু কিছু দেখা যায়নি---জানলায় সব সময়ে ভারী পর্দা ঝুলতো বলে। একদিন কিন্তু পর্দার ওপর একটা ছায়া পড়তেই চমকে উঠেছিল বিষমভাবে। যার ছায়া, সে একটা অজ্ঞাত ভাষায় টেনে টেনে কথা বলে যাচ্ছিল একনাগাড়ে। ছায়াটা দেখেই উঈডেনের মনে পড়ে গিয়েছিল অনেকদিন আগে দেখা একটা পুতুল নাচের দৃশ্য। জেরু-সালেমের দৃশ্য দেখা গিয়েছিল অত্যদ্ভুত সেই পাপেট শো-র মধ্যে।

ভয়ানক চমকে জানলার আরও কাছে এগিয়ে কথাবার্তায় আড়ি পাততে গিয়ে মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছিল উঈডেন কুকুরের কামড়ে। কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল ইণ্ডিয়ান দম্পতি। এই ঘটনার পর থেকে হুঁশিয়ার হয়ে যান কারওয়েন। জানলায় আর কখনো কারও ছায়া পড়েনি, বাইরে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শোনা যায়নি। ক্রিয়াকলাপ সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন নিশ্চয় ভূগর্ভের অন্ধকারে।

ভূগর্ভ কক্ষ যে আছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে একাধিক। বাড়ী-ঘরদোর যেখানে একেবারেই নেই, শুধু পাথুরে জমি—সেখানকার পাতাল থেকে নাকি উঠে এসেছে ক্ষীণ কাতরানি আর গোঙানি—ক্ষীণ হলেও স্পষ্ট—শুনতে ভুল হয় নি। পটুক্সেট উপত্যকার দিকে জমি যখন ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে, সেইখানে ঝোপের মধ্যে একটা মজবুত ভারী খিলেনওলা ওক কাঠের দরজা পাওয়া গেছে---নিঃসন্দেহে পাহাড়ের সুড়ঙ্গে ঢোকবার প্রবেশ পথ। পাতালের এই পাকচক্র নির্মিত হয়েছে কবে এবং কি ভাবে, উঈডেন তা না বলতে পারলেও একটা কথা কিন্তু বলেছে---নদী পথে মিস্ত্রীরা খুব সহজেই ওখানে যেতে পারে---কারো চোখে পড়বে না। তার মানে, দো-আঁশলা নাবিকদের দিয়ে জাহাজ চালনা ছাড়াও অনেক কাজই করিয়ে নিয়েছেন কারওয়েন!

১৭৬৯ সালে যখন বৃষ্টি নামল, নদীর পাড়ে গিয়ে বসে থাকত স্মিথ আর উঈডেন। উদ্দেশ্য, পাড় ধসে পড়লে গোপন কোনো সুড়ঙ্গ বেরিয়ে পড়ে কিনা তা দেখা। প্রতীক্ষা বিফলে যায়নি। সত্যিই পাড় ধসে নদীর পাড়ে গহ্বর দেখা গেল কয়েক জায়গায় এবং গহ্বরের মধ্যে থেকে হুড়মুড় করে জলে গিয়ে পড়ল পশু আর মানুষের বিস্তর হাড়গোড়। খামার বাড়ীর পেছনে এরকম হাড়গোড় থাকা স্বাভাবিক---বিশেষ করে যেখানে রেড ইণ্ডিয়ানদের গোরস্থান রয়েছে। স্মিথ আর উঈডেন কিন্তু এল অন্য সিদ্ধান্তে।

১৭৭০ সালের জানুয়ারী মাসে একটা নতুন ঘটনা ঘটল। দুই বন্ধু তখনো স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি হাড়গোড়, পাতালপুরী এবং রহস্য-জনক কাণ্ডকারখানাগুলোর ব্যাপারে। কাস্টমস জাহাজ অতি তৎপর হয়ে উঠেছিল এই সময়ে। বেয়াড়া জাহাজ দেখলেই ধরছিল। মিশর থেকে প্রভিডেন্সের দিকে আসার সময়ে ধরল একটা জাহাজকে। নাম, ফরটা-লিজা। স্পেনের জাহাজ। সার্চ করা হল। কিন্তু নিষিদ্ধ বস্তু পাওয়া গেল না। যা পাওয়া গেল, তা দেখে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল কাস্টমস অফিসারদের।

জাহাজের খোলে কেবল মিশরের ম্যমী। নানকুইট পয়েণ্টে "নাবিক এ. বি. সি." এই নামে এক ব্যক্তি হাল্কা জাহাজে এসে মাল খালাস করে নিয়ে যাবে। ছদ্ম নামের আড়ালে আসল নামটি কিন্তু বলতে চাইল না ফরটালিজার ক্যাপ্টেন। কাস্টমস বিভাগ ধাঁধায় পড়ল এই সমস্যায়। ম্যমী আনা বে-আইনী নয়---কিন্তু চোরের মত বিদেশী জাহাজের এদিক দিয়ে যাওয়াটা নাকি সন্দেহজনক। সুতরাং অনেক ভেবেচিন্তে তারা ঠিক করল, ফরটালিজাকে রোড আয়ল্যাণ্ডের কোথাও নামতে দেওয়া হবে না। গুজব, ফরটালিজা নাকি এরপর বোস্টনে গিয়েছিল---কিন্তু জাহাজঘাটায় ভেড়ে নি। বন্দরে ঢোকেনি।

অত্যাশ্চর্য এই ঘটনায় হৈ-চৈ পড়ে গেল প্রভিডেন্সে—শোনা গেল গেল অনেক রকম চাঞ্চল্যকর কানাঘুসো। একদল লোক অবশ্য বলল, ম্যমী আমদানী আর জোসেফ কারওয়েনের পৈশাচিক নৈশ ক্রিয়াকলাপের মধ্যে নিশ্চয় একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। কারওয়েন সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা করেন, কারওয়েন বিস্তর বিদঘুটে রসায়ন দ্রব্য আমদানী করেন, কারওয়েন কবরখানায় ঘুরতে ভালবাসেন—এই তিনটি বিষয় শহরশুদ্ধ লোকের জানা ছিল। সেই কারওয়েন যদি ম্যমী আমদানীও শুরু করে থাকেন, তাহলে কেন করছেন, তা কি আর কাউকে বোঝাতে হবে? অদ্ভুত আরকে অনেক কিছুই হয়।

গুজব কারওয়েনের কানেও পেঁছোছিল নিশ্চয়। তাই হঠাৎ তিনি ম্যমীর গায়ে যে মলম লাগানো হয়, তার রাসায়নিক গুরুত্ব সম্পর্কে সবাইকে জ্ঞান দিতে আরম্ভ করলেন। ওঁর উদ্দেশ্য ছিল বোধহয় ম্যমী আমদানীর ব্যাপারটা যেন আর সে রকম অস্বাভাবিক না দেখায়। কিন্তু ভাঁওতায় ভুলল না স্মিথ আর উঈডেন। কারওয়েন আর তাঁর রাতের রহস্য নিয়ে অনেক কিম্ভূতকিমাকার থিওরী খাড়া করে ফেলল মনে মনে। নিশুতি রাতে কারওয়েন যাদের সঙ্গে কথা বলে, তারা কারা? নিছক কয়েদী, না, অন্ধকারের অসুর?

পরের বছরেও বর্ষাকালে দারুণ বৃষ্টি হল। দুই বন্ধু ঠায় বসে রইল কারওয়েন খামার-বাড়ীর পেছনে নদীর পাড়ে। বড় বড় মাটি আর পাথরের চাঙর খসে পড়ে গেল ওদের চোখের সামনেই—আবিস্কৃত হল নতুন নতুন হাড়ের স্তূপও—কিন্তু পাতাল পুরীর কোনো চিহ্ন দেখা গেল না। মাইল খানেক পেছনে পটুক্সেট গাঁয়ে কিন্তু শোনা গেল আবার একটা গুজব। নদীর জল যেখানে প্রপাতের আকারে ঝরে পড়ে, সেইখানে নাকি কি যেন সব ভাসতে দেখা গিয়েছে মিনিট খানেকের

জন্যে। তারপরেই সাঁৎ করে মিলিয়ে গিয়েছে প্রপাতের জলে! পটুক্সেট নদীটা নেহাৎ ছোট নয়। অনেক গাঁ ধুয়ে, অনেক প্রান্তর পেরিয়ে, অনেক গোরস্থানের পাশ দিয়ে আসছে। কিন্তু সাঁকোতে উঠে জেলেরা যা দেখেছে, তা নাকি গোরস্থানেও থাকে না। শান্ত জলে ভেসে যেতে যেতে কোনো মড়া যদি প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে থাকে, অথবা মড়ার গলায় যদি অস্ফুট আর্তনাদ শোনা যায়—তাহলে কার না বুক ধড়ফড় করে ওঠে?

খবরটা শুনেই নদীপাড়ে দৌড়োলো স্মিথ। উঈডেন তখন সমুদ্রে। গিয়ে দেখল সত্যিই নদীর ধসা পাড়ে একটা বিরাট গহ্বর মুখব্যাদান করে রয়েছে। কিন্তু গহ্বরে ঢোকবার পথ নেই। নীচ থেকে খাড়াই মাটি আর পাথরের দেওয়াল বেয়ে ওঠা যায় না—ওপর থেকেও নামা অসম্ভব। স্মিথ তা সত্ত্বেও শাবল নিয়ে কিছুক্ষণ খোঁড়াখুঁড়ি করেছিল বটে, ফল হয় নি। কাঠগোঁয়াড় উঈডেন হাজির থাকলে নিশ্চয় কিছু একটা করে ছাড়ত।

৪

১৭৭০ সালের শরৎ আসতেই উঈডেন ঠিক করলে এতদিনের আবিষ্কার এমন একজনকে বলা যাক, যার কথা দেশশুদ্ধ লোক শুনবে। নইলে ভাবতে পারে ইলিজার সঙ্গে বিয়ে হয় নি বলে রাগের মাথায় উঈডেন বানিয়ে বানিয়ে কথা বলছে।

এরকম লোক অচিরেই পাওয়া গেল। নাম তাঁর ক্যাপ্টেন জেমস ম্যাথুসন। চাকরী করেন কারওয়েনের একটি জাহাজে। কিন্তু মনিবকে ভাল চোখে দেখেন না তাঁর সন্দেহজনক কুচকুটিল কার্যকলাপের জন্যে।

দুই বন্ধুর সঙ্গে সম্মেলনে বসলেন ক্যাপ্টেন জাহাজঘাটায় একটা ঘরে। ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেলেন সব কথা শোনবার পর। প্রতিটি কাহিনী তাঁর মনে দাগ কেটে বসে গিয়েছে। দুই বন্ধুকে বললেন এ নিয়ে যেন আর কাউকে বলা না হয়। উনি নিজে শহরের গণ্যমান্য দশজনকে ডেকে বলবেন। পুলিশ বা সৈন্যবাহিনীকে বলে কোনো লাভ হবে না। হুজুগপ্রিয় সহজে উত্তেজিত জনগণকে তাতিয়েও হিতে বিপরীত হবে। একশ বছর আগে সালেমে যে কেলেঙ্কারীর ফলে কারওয়েন পালিয়ে এসেছেন প্রভিডেন্সে, তার পুনরাবৃত্তি তিনি করতে চান না।

দশজনের নামও করলেন ক্যাপ্টেন ম্যাথুসন। শুক্রগ্রহ সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখে বিখ্যাত ডক্টর বেঞ্জামিন ওয়েস্ট, কলেজ প্রেসিডেন্ট মানিং, প্রাক্তন গভর্ণর হপকিন্স, 'গেজেট' প্রকাশক জন কার্টার, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসাদার ব্রাউন ব্রাদার্স (চার ভাইয়ের মতেই নাকি জোসেফ কারওয়েন সখের বৈজ্ঞানিক), মহাপণ্ডিত ডক্টর বোয়েন (যিনি কারওয়েন কেনা-কাটার অনেক খবর রাখেন) এবং ক্যাপ্টেন আব্রাহাম হুইপল্ (যিনি পয়লা নম্বরের ডানপিটে, ডাকাবুকো—যাঁর দুর্দান্ত সাহস আর শক্তির তুলনা নেই এবং যিনি দরকার মত যে কোনো চূড়ান্ত ব্যবস্থায় পা বাড়িয়ে আছেন)। এঁদেরকেই আগে কারওয়েনের বিচিত্র ভয়ানক কীর্তিকাহিনী বলা হবে। এঁরাই ভেবেচিন্তে ঠিক করবেন পরবর্তী করণীয় কি! দরকার হলে এঁরাই খবর দেবেন গভর্ণরকে। নইলে তৎপর হবেন নিজেরাই।

ক্যাপ্টেন ম্যাথুসন আশাতীতভাবে সফল হলেন এ ব্যাপারে। দশ-জনের দু'একজন কারওয়েনের ভুতুড়ে কার্যকলাপে সন্দেহ প্রকাশ করলেও দশজনেই একবাক্য বললেন---আর দেরী নয়। এখুনি গোপনে দল বেঁধে কারওয়েনকে শায়েস্তা করা যাক। এই শহরের সুনাম আর শ্রীবৃদ্ধি বিঘ্নিত হচ্ছে যাঁর জন্যে তাঁকে আর সময় না দিয়ে নির্মূল করা হোক এখুনি। তার জন্যে যত টাকা লাগে লাগুক।

১৭৭০ সালের ডিসেম্বরে প্রাক্তন গভর্ণরের বাড়ীতে মিটিং করলেন শহরের কেষ্টবিষ্টুরা। ডেকে পাঠানো হল স্মিথ আর উঈডেনকে। ওদের ডাইরী ওদের সামনেই পড়ে কয়েকটা ব্যাপারে প্রশ্ন করা হল খুঁটিয়ে। মিটিং শেষ হবার পর দেখা গেল, প্রত্যেকেরই অন্তরাত্মা পর্যন্ত শুকিয়ে গিয়েছে নামহীন আতংকে। একা ক্যাপ্টেন হুইপল অনমনীয় সংকল্পে অনড় রইলেন। গভর্ণরকে খবর দিতে কেউ রাজী নন---কেননা যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা আইন বহির্ভূত। কারওয়েনের অনুপরমাণুতে অদৃশ্য শক্তি পুঞ্জীভূত---সুতরাং অজ্ঞাত অপরিসীম ঐ শক্তি নিয়ে শহর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে দেওয়া হবে না তাঁকে। গভর্ণরকে খবর দিলে হুঁশিয়ার কারওয়েন পালাতে পারেন এবং নামহীন বহু প্রতিশোধ নিতে পারেন।

এমনও হতে পারে যে শয়তানের চেলা কারওয়েন মানে মানে সরে পড়লেন। কিন্তু সেটা কি ঠিক? তাঁর মত পূতিগন্ধময় নরকের কীটকে অন্য এক দেশের মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া অন্যায়। অরাজকতা চলছে দেশ জুড়ে। সরকারের শুল্ক আদায়ী বাহিনীকে

যারা কলা দেখিয়েছে, তাদের ছেড়ে দেওয়ার সময় এখন নয়। সুতরাং কারওয়েনকে ওর খামারবাড়ীতেই অকস্মাৎ পাকড়াও করতে হবে। দুঁদে দাঙ্গাবাজদের নিয়ে গঠিত হবে সেই হানাদার পার্টি। ঝেড়ে কাশবার সুযোগও দেওয়া হবে তাকে। উনি যদি বুঝিয়ে দিতে পারেন যে বিভিন্ন গলায় কথা বলেছেন উনি নিজেই---কারণ উনি পাগল এবং এই পাগলামিতেই ওর শান্তি---তাহলে তাঁকে সেইভাবেই খামার-বাড়ীতে নজরবন্দী রাখা হবে। কিন্তু যদি ভয়ংকর কাণ্ডকারখানার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় পাতালপুরীতে, যদি এতদিনের রটনা সত্যি বলেই প্রমাণিত হয়, তাহলে ঐদিনই হবে তাঁর শেষ দিন। মরতে তাঁকে হবেই হানাদারদের হাতে। এবং সে মৃত্যুর খবর কাকপক্ষীও জানবে না---এমন কি বিধবা বউ আর তার পিতৃদেবকেও বলা হবে না কারওয়েনকে খতম করা হয়েছে কেন, কিভাবে, কোথায়।

কমিটি যখন আটঘাট বাঁধছে এইভাবে, ঠিক সেই সময়ে শহরে একটা ভয়ংকর ব্যাপার ঘটে গেল। বেশ কিছুদিন ধরে বেশ কয়েক মাইল জায়গা জুড়ে লোকে কানাঘুসো করেছিল ব্যাপারটা নিয়ে।

জানুয়ারী মাস। চাঁদনী রাত। তুষারে ঢেকে গিয়েছে পাহাড়ের গা, নদীর পাড়। আচমকা উপর্যুপরি কয়েকটা রক্ত জল করা চীৎকার শোনা গেল। প্রতিধ্বনি নদীর পাড় আর পাহাড়ের গায়ে ঠিকরে গিয়ে ছড়িয়ে গেল দূর হতে দূরে। ভয়াল ভয়ংকর সেই চীৎকার শোনা মাত্র ঘুম ছুটে গেল ঘরে ঘরে। দৌড়ে এল জানলায়। উইবসেট পয়েণ্টের কাছে যাদের বসবাস, তারা দেখল টার্ক'স হেডের কাছে যে জায়গাটা কোনমতে সাফসুতরো করা হয়েছে---সেইখানে একটা বিরাট সাদা বস্তু ঝপাং করে ডুবে গেল। অনেক দূরে কুকুরের হাঁকডাক শোনা গিয়েছিল---কিন্তু লোকজন হৈ-হৈ করে বেরিয়ে আসার পর চাপা পড়ে গেল ঘেউ ঘেউ চীৎকার।

লণ্ঠন আর গাদাবন্দুক নিয়ে দলে দলে লোক ছুটল ব্যাপার কি দেখতে—কিন্তু ফিরে এল শূন্য হাতে। পরের দিন সকালে একটা আখাম্বা উদোম উলঙ্গ মূর্তিকে পড়ে থাকতে দেখা গেল গ্রেট ব্রীজের দক্ষিণে তুষার স্তূপের মধ্যে। মূর্তিটিকে সনাক্ত করতে গিয়েই লোম খাড়া হয়ে গেল শহর শুদ্ধ লোকের। কানাঘুসোয় শোনা গেল বুড়োর দল নাকি বলেছেন, মূর্তিটা বয়সে মোটেই তরুণ নয়। চোখ তার আতংক বিস্ফারিত। ড্যাবডেবে চক্ষু গোলক যেন কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। এ মুখ তাঁদের চেনা। কিন্তু আড়ষ্ট, কদর্য ঐ মুখকে

চিনি বলতেও সাহস হল না কারো। হাত-পা যেন পেটের মধ্যে ঢুকে যেতে চাইল নিদারুণ আতংকে। কেননা, এ মুখ যার হওয়া উচিত, সে মারা গিয়েছে ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে।

এজরা উঈডেন হাজির ছিল সেখানে। গত রাতে মূর্তিটা জলে ঝাঁপ দিতেই দূরে কুকুর চেঁচিয়ে ছিল কেন দেখবার জন্যে একাই মাডি ব্রীজ পেরিয়ে এগোলো চীৎকার যেদিক থেকে শোনা গিয়েছিল—সেইদিকে। অকারণে যায়নি উঈডেন—মনে প্রত্যাশা ছিল এবং সত্যি সত্যিই বরফের ওপর দেখতে পেল অদ্ভুত কতকগুলো ছাপ। কুকুর তাড়া করেছিল উলঙ্গ দৈত্যকে। সেই সঙ্গে বুটপরা একদল মানুষ। শহরের কাছাকাছি এসে তারা ফিরে গিয়েছে। কুকুরের পায়ের ছাপ পেছন ফিরেছে। বুটের ছাপও।

পদচিহ্ন অনুসরণ করে উঈডেন পেঁছোলো জোসেফ কারওয়েনের পটুক্সেট খামারবাড়ীতে।

দিনের আলোয় খামারবাড়ীর চেহারা দেখে কে বলবে রাতের অন্ধকারে পিশাচ জাগে এখানে। উঈডেন আর এগোলো না। ফিরে এসে খবর দিল ডক্টর বোয়েনকে। তিনি তৎক্ষণাৎ আগন্তুক দৈত্যদেহের ওপর ছুরী চালিয়ে দেখলেন ভেতরের দেহযন্ত্রের অবস্থা।

আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল ডাক্তারের। দেহযন্ত্রের এমন বৈকল্য যে কল্পনাতেও আনা যায় না। পরিপাক যন্ত্র কাজই করেনি। গায়ের চামড়া কর্কশ ঠাস বুনন নয় মোটেই—ঠিক কি রকম তা ভাষায় বোঝানো যায় না। মুখটা চেনা চেনা ঠেকেছিল। পঞ্চাশ বছর আগে মৃত কামার ড্যানিয়েল গ্রীনের মুখের মত। তার প্রপৌত্র কাজ করত কারওয়েনের মালজাহাজে। উঈডেন গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে জেনেছিল ড্যানিয়েল গ্রীনকে কবর দেওয়া হয়েছে কোথায়। তারপর দলবল নিয়ে কবরখানায় গিয়ে কফিন তুলে দেখল ভেতরটা ফাঁকা। অবাক হল না—এই আশা নিয়েই এসেছিল উঈডেন।

ইতিমধ্যে কারওয়েনের চিঠিপত্র লোপাট করার ব্যবস্থাও হয়েছিল। উলঙ্গ দৈত্য দেহ প্রাপ্তির ঠিক আগেই একটা চিঠি এসেছিল সালেম থেকে। লিখছে কে এক জুডেডিয়া ওর্ণে। চিঠি পড়েই নাগরিক কমিটির মাথা ঘুরে গেল। চিঠির কিছুটা অংশে কপি করে পারিবারিক সংগ্রহশালায় রেখে দেওয়া হয়েছিল বলেই চার্লস ওয়ার্ড তা পেয়েছিল। চিঠিটা লেখা সেকেলে ভাষায়। পড়তে কষ্ট হয়ঃ

শুনে খুশী হলাম পুরনো জিনিস সংগ্রহ চালিয়ে যাচ্ছ নিজের পদ্ধতিতে। সালেম গ্রামে মিস্টার হাচিনসন তোমার চাইতে ভাল কাজ করতে পারেননি জেনেও প্রীত হলাম। বাস্তবিকই, হাচিনসন মাটি খুঁড়ে যাকে জাগিয়েছিল, তার সবটুকু তো পায়নি—তাই ওরকম একটা জ্যান্ত বিভীষিকা তৈরী হয়ে গিয়েছিল। তোমার পাঠানো জিনিসে কাজ হয়নি। হয় কিছু খোয়া গেছে, আর না হয় যেভাবে বলেছিলাম সেভাবে কপি করতে পারোনি—তাই তোমার কথায় ফাঁক থেকে গিয়েছে। আমি একাই বেকায়দায় পড়েছি—হালে পানি পাচ্ছি না। রসায়ন শাস্ত্রে আমার তেমন ব্যুৎপত্তি নেই। পিশাচ-বিদ্যার অষ্টম খণ্ড তুমি পড়তে বলেছিলে—কিন্তু পড়তে গিয়ে মাথাটা আরো গুলিয়ে যাচ্ছে। তবে একটা জিনিস খেয়াল রেখো। যে বিদ্যে আমাদের শেখানো হয়েছে, তার গোড়ার কথা হচ্ছে—পরলোক থেকে যাকেই ইহলোকে জ্যান্ত করো না কেন, সে যেন তোমার ক্ষমতার চাইতে বেশী ক্ষমতাবান না হয়। ম্যাগনোলিয়া গ্রন্থে মিস্টার মাদারও সেই কথা লিখেছেন। উদাহরণও দিয়েছেন। তাই ফের বলছি, যাকে তুমি কফিনে ফিরোতে পারবে না—কফিন থেকে তাকে জাগিও না। তার ক্ষমতা তোমার চাইতে বেশী হলে, সে নিজেই অদৃশ্য আতংকদের ডেকে এনে তোমাকে শেষ করে দিতে পারে। তোমার ইন্দ্রজালেও তখন আর কোনো কাজ হবে না। তোমার চাইতে কম শক্তিমানকে ডাকো—সে ডাকে প্রকৃত শক্তিমান সাড়া দেবে না—তোমাকে তার দাস বানিয়ে রাখবে না। আবলুষ কাঠের বাক্সে বেন জেরিস্টনাটমিক যা পেয়েছে, তা সত্যিই ভয়ের ব্যাপার। তোমার কাছে শুনে অবধি আমার ভয় ধরে গেছে। আর একটা কথা, ফের মনে করিয়ে দিচ্ছি, আমাকে জেডেডিয়া নামে চিঠি লিখবে—সাইমন নামে নয়। এই সমাজে বেশীদিন বাঁচবার কথা নয় মানুষের। তাই তো আমি আমার ছেলে রূপে ফিরে এসেছি এবং আমার এই পরিকল্পনা তোমার অবিদিত নয়। রোমান প্রাচীরের তলায় পাতালঘরে কৃষ্ণকায় নিগ্রোরা সিলভানাস কোসিডিয়াসের কাছে কি-কি জেনেছে, তোমার চিঠিতে তা জানবার জন্যে ব্যগ্র রইলাম। সেইসঙ্গে যে পাণ্ডুলিপিটার কথা লিখেছিল—সেটা ধার দিও।

ফিলাডেলফিয়া থেকে আসা আর একটা স্বাক্ষরহীন চিঠি পেয়ে চিন্তায় পড়ল নাগরিক কমিটি। চিঠিটার একটা পরিচ্ছেদই ভাবিয়ে তুলল সবাইকে। পরিচ্ছেদটা এই ঃ

হিসেবপত্র জাহাজে পাঠাতে বলেছো ! তাই পাঠাবো। কিন্তু কবে পাবে, তার ঠিক নেই। যে ব্যাপার তোমাকে বলেছিলাম, ঐ ব্যাপারে আমার আর একটা জিনিস দরকার। জিনিসটা আগে তোমাকে বুঝতে হবে। তুমি জানিয়েছো অতি-সূক্ষ্ম নিখুঁত ফল পেতে হলে গোটা অংশটাই চাই—কিছু যেন খোয়া না যায়। কিন্তু গোটা পাওয়া গেল কিনা তা জানবে কি করে ? আস্ত বাক্সটাকে নিয়ে আসা দারুণ ঝক্কির ব্যাপার। বিশেষ করে শহরে (যেমন, সেন্টপিটার্স, সেন্টপলস্, সেন্টমেরিস অথবা ক্রাইস্টচার্চ) বাক্স বয়ে নিয়ে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। তবে আমি জানি ত্রুটি থাকার ফলে গত অক্টোবরে যাকে জাগিয়েছিলে, সে একটা মূর্তিমান বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং ১৭৬৬ সালে বহু জীবন্ত নমুনাকে বলি দেওয়ার পর তুমি সঠিক পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পেরেছিলে। কাজেই তুমি যা বলবে, সেই ভাবেই চলব। জাহাজ আসার প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে উঠেছি। বন্দরে গিয়ে রোজ খবর নিচ্ছি।

সন্দেহজনক তৃতীয় চিঠিটা লেখা অজ্ঞাত ভাষায়, অজ্ঞাত হরফে। স্মিথের ডাইরী ঘেঁটে চার্লস ওয়ার্ড দেখল একটা বিচিত্র শব্দকে বারবার লেখা হয়েছে। স্মিথ সেই শব্দটা আনাড়ি হাতে কোনমতে নকল করে রেখেছে। ব্রাউন ইউনিভার্সিটির পণ্ডিতরা বিদঘুটে শব্দটা দেখে বলে-ছিলেন, হরফগুলো আমহারিক অথবা আবিসিনিয়ান—কিন্তু শব্দটার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারেননি। চিনতেই পারেননি।

এসব কথা বেমালুম চেপে যাওয়া হল কারওয়েনের কাছে। তবে চিঠি পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই সালেমের জেডেডিয়া ওর্নে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় বোঝা যায়, প্রভিডেন্সের মারমুখী কমিটি নিষ্ক্রিয় থাকেননি—চুপিসারেই কাজ আরম্ভ করে দিয়েছিলেন।

পেনসিলভানিয়া ঐতিহাসিক সমিতিতে খানকয়েক চিঠি রাখা ছিল। লিখেছিলেন ডক্টর শিপেন। ফিলাডেলফিয়ার এক কদর্য, বদ ব্যক্তির বর্ণনা ছিল সেই চিঠিতে।

কিন্তু আসল কাজ হচ্ছিল ব্রাউনদের গুদোমে। প্রতি রাতে সেখানে জড়ো হচ্ছিল বিশ্বস্ত ডানপিটে অকুতোভয় কিছু নাবিক আর জাহাবাজ ব্যক্তি। ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছিল পিশাচ কারওয়েনকে তাঁর কুৎসিত রহস্যসহ চিরতরে মুছে দেওয়ার চূড়ান্ত আয়োজন।

কারওয়েন হুঁশিয়ার মানুষ। খবর এল তিনি নাকি আঁচ করেছেন

একটা কিছু ঘটতে চলেছে। লোকজন দেখলেই জোর করে মুখে হাসি টেনে গায়ে পড়ে আর কথা বলছেন না—চোখেমুখে ফুটে উঠেছে অস্বাভাবিক উদ্বেগের ছাপ। পথেঘাটে প্রায় সব সময়ই তাঁর ঘোড়ার গাড়ী দেখা গেলেও একটু একটু করে যেন শহরবাসীদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন কারওয়েন।

নিকটতম প্রতিবেশী ফেনার পরিবার এই সময় একরাতে দেখতে পেল একটা ভীষণ জোরালো বিদ্যুৎঝলকের মত আলো আকাশের দিকে ছুটে গেল—অত্যুজ্জ্বল আলোটা বেরোলো কিন্তু জানলাবিহীন প্রস্তর কারাগারের অতিসংকীর্ণ একটা ছেঁদা দিয়ে। ছেঁদাটা ছিল ছাদের ওপর। ফেনার তৎক্ষণাৎ খবর পেঁছে দিলে জন ব্রাউনকে। জন ব্রাউন হানাদার পার্টির এক্সিকিউটিভ লীডার নির্বাচিত হয়েছিলেন। ফেনারকে চর নিযুক্ত করেছিলেন কারওয়েনের পেছনে। কিন্তু আসল কথা ভাঙেননি। মিথ্যে করে বলেছিলেন, কারওয়েন নাকি নিউপোর্ট কাস্টমসয়ের স্পাই। তাই প্রভিডেন্সের নাবিক, ব্যবসায়ী চাষীরা এককাট্টা হয়েছে তাঁকে উচিত দাওয়াই দেওয়ার জন্যে। ফেনার এই ধাপ্পায় নিশ্চয় ভোলেনি। কেননা, দীর্ঘদিন সে অতি নিকট থেকে দেখেছে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার ঐ খামার বাড়ীতে। কিন্তু আপত্তিও করেনি। কেননা, কারওয়েনের মত একটা বদ চরিত্রের লোকের পক্ষে অসাধ্য কিছু নেই।

৫

সুতীব্র ঐ আলোক সংকেত দেখেই হানাদার পার্টি আর দেরী করা সঙ্গত মনে করল না। বেশ বোঝা গেল, কারওয়েন ভেতরে ভেতরে তৈরী হচ্ছেন—ঘাঁটি সুদৃঢ় করছেন।

সুতরাং, স্মিথ তার ডাইরীতে লিখেছে, ১৭৭১ সালের বারোই এপ্রিল শুক্রবার রাত দশটায় শ'খানেক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরুষ জড়ো হল ব্রীজের পাশে মদ্যশালার বড় হলঘরে। দলনেতা জন ব্রাউনের সঙ্গে এলেন ডক্টর বোয়েন—সঙ্গে শল্যচিকিৎসার ছুরীকাঁচি, প্রেসিডেন্ট মানিং (বিখ্যাত বিরাট পরচুলাটা অবশ্য রেখে এলেন বাড়ীতে), গভর্নর হপকিন্স (সঙ্গে ছোট ভাই এশো—সমুদ্র যার ঘরবাড়ী), জন কার্টার, ক্যাপ্টেন ম্যাথুসন এবং ক্যাপ্টেন হুইপ্‌ল্ (হানাদার পার্টির পরিচালনা দায়িত্ব যাঁর ওপর ন্যস্ত হয়েছে)। প্রধানরা পেছনের ঘরে বসে যুক্তি করলেন। তারপর

সামনের বড় ঘরে সবাইকে দিয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করালেন এবং কি করতে হবে বুঝিয়ে দিলেন। ইলিজার স্মিথ প্রধানদের সঙ্গে বসে রইল ছোট ঘরে প্রিয়বন্ধু এজরা উঈডেনের প্রতীক্ষায়—তার ওপর ভার আছে কারওয়েনকে চোখে চোখে রাখার এবং খামার বাড়ীর দিকে কারওয়েনের গাড়ী রওনা হলেই সেই খবর হানাদার পার্টিকে এনে দেওয়ার।

সাড়ে দশটা নাগাদ গ্রেট ব্রীজের ওপর গাড়ীর চাকার ঘর্ ঘর্ শব্দ শোনা গেল—সেই সঙ্গে শোনা গেল বাইরের রাস্তায় গাড়ী চলার গুরুগম্ভীর গড়্ গড়্ আওয়াজ। উঈডেনের আর দাঁড়িয়ে থাকার দরকার নেই। পিশাচ গুরু কারওয়েন তাঁর শেষ যাত্রা করলেন খামার বাড়ী অভিমুখে—এই আওয়াজ তার প্রমাণ।

একটু পরেই মাডিডম ব্রীজের ওপর গড়্ গড়্ শব্দ মিলিয়ে যেতেই আবির্ভূত হল উঈডেন। হানাদাররা সামরিক নিয়মে নিঃশব্দে সারি দিয়ে নেমে পড়ল রাস্তায়—প্রত্যেকের কাঁধে একটা না একটা অস্ত্র—হারপুন, কুঠার—যার ঘরে যা ছিল, তাই নিয়ে এসেছে। শহরের গণ্যমান্যরাও লাইন দিয়ে চললেন শ'খানেক গাঁট্টাগোট্টা খালাসীর সঙ্গে। প্রত্যেকের মুখের রেখা কঠিন, চোয়ালের হাড় শক্ত। চার্চ পেরিয়ে এসেই প্রত্যেকে পেছন ফিরে দেখে নিলেন সুপ্ত নগরীকে—যার নিরাপত্তার জন্যে তাঁরা চলেছেন নারকীয় পৈশাচিকতার অবসান ঘটাতে। একঘণ্টা পনেরো মিনিট লাগল ফেনার ভবনে পেঁছোতে। পেঁছেই খবর পাওয়া গেল—কারওয়েন একঘণ্টা আগে পেঁছে গিয়েছে খামার বাড়ীতে। ঠিক তার পরেই অদ্ভুত সেই আলোকবর্শা ছাদের ফুটো দিয়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে আকাশ পানে,—কোনো জানলাতেই কিন্তু আলো জ্বলতে দেখা যায়নি। এই রকমই হচ্ছে ইদানীং। কথা শেষ হতে না হতেই আবার আলোর ঝলক দেখা গেল কিম্ভূতকিমাকার পাথর-বাড়ীর ছাদে। আশ্চর্য উজ্জ্বল সেই আলো সুতীক্ষ্ন শায়কের মত ধেয়ে গেল দক্ষিণ দিকে।

দেখামাত্র শিউরে উঠল হানাদার পার্টি। হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করল—লোমহর্ষক এবং অস্বাভাবিক অভিজ্ঞতার আর দেরী নেই। দল-নায়ক ক্যাপ্টেন হুইপল তিন দলে ভাগ করলেন স্বেচ্ছা-যোদ্ধাদের। কুড়িজনকে নিয়ে ইলিজার স্মিথ যাবে উপকূলে জাহাজঘাটায়—কারওয়েন যেন কোনো রকম সাহায্য সেদিক থেকে না পায়। নেহাৎ বিপন্ন হলে ক্যাপ্টেন হুইপল তাকে দূত মারফৎ ডেকে আনবেন। দ্বিতীয় দলে বিশজনকে নিয়ে ক্যাপ্টেন এশে হপকিন্স যাবেন খামার বাড়ীর পেছনে নদী-উপত্যকায় এবং নদীপাড়ের ওককাঠের দরজা উড়িয়ে দেবেন বারুদ

বা কুঠার দিয়ে। তৃতীয় দলটা এগিয়ে যাবে খামার বাড়ীর দিকে। এই দলের এক তৃতীয়াংশ ক্যাপ্টেন ম্যাথুসনের নেতৃত্বে হানা দেবে সরু ফুটোওলা প্রস্তর কারাগারে, আর এক তৃতীয়াংশ ক্যাপ্টেন হুইপলের সঙ্গে চড়াও হবে মূল ভবনের ওপর ; বাকী এক তৃতীয়াংশ পুরো বাড়ীটাকে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকবে চরম মুহূর্তে ডাক পড়লে ছুটে যাওয়ার জন্যে।

নদীমুখো দল দরজা উড়িয়ে দেবে একবার বংশীধ্বনির সংকেতে—ভেতর থেকে যাই আসুক না কেন, বেরোতে দেবে না। দুবার বংশীধ্বনির সিগন্যাল পেলেই দরজা পেরিয়ে ঢুকবে ভেতরে শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার জন্যে অথবা স্বেচ্ছা-যোদ্ধাদের দল ভারী করতে।

পাথরের কারাগারে যে দলটা গেল, তারাও প্রথম আর দ্বিতীয় বংশীধ্বনির সংকেত শুনে প্রথমে দরজা ভেঙে ঢুকবে ভেতরে—তারপর হুড়মুড় করে নেবে যাবে পাতাল পথে—লড়তে যদি হয় লড়ে যাবে—জান যায় যাক।

তৃতীয় বংশীধ্বনির সংকেত শুনলেই কিন্তু বাড়ী ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকা প্রহরীর দল ছুটে আসবে ভেতরে—সমান ভাগে ভাগ হয়ে হানা দেবে প্রস্তর ভবন আর খামার বাড়ীর মধ্যে। বুঝতে হবে বিপদে পড়েছে ভেতরের বন্ধুরা।

পাতালপুরীর অস্তিত্ব যে আছেই, এ ব্যাপারে ক্যাপ্টেন হুইপল এত স্থির নিশ্চিত হয়েছিলেন যে বিকল্প কোনো ব্যবস্থা রাখেননি। সঙ্গে এনেছিলেন দারুণ জোরালো একটা বাঁশি—সংকেত ধ্বনিতে যেন ভুল বোঝাবুঝি না হয়। জাহাজঘাটায় স্মিথের কাছে বংশীধ্বনি পেঁছোবে না বলেই বিশেষ দূতের ব্যবস্থা রেখেছিলেন—বেকায়দায় পড়লে ডেকে পাঠাবেন। ক্যাপ্টেন হকিন্স নদী উপত্যকায় নিজের লোকজন সাজিয়ে লোক মারফৎ খবর পাঠাবেন ক্যাপ্টেন হুইপলকে যে তিনি তৈরী। তৎ-ক্ষণাৎ বাঁশিতে প্রথম ফুঁ দেবেন ক্যাপ্টেন হুইপল। সঙ্গে সঙ্গে তিন জায়গায় একই সাথে ঝাঁপিয়ে পড়বে তিনটে বাহিনী। রাত একটার আগেই দেখা গেল হুইপলের প্ল্যান অনুযায়ী স্বেচ্ছা-যোদ্ধাদের তিনটে দল নিঃশব্দে রওনা হল তিন দিকে—জাহাজঘাটায়, নদী উপত্যকায় আর খামার বাড়ীতে।

জাহাজঘাটায়, মানে, শিলাময় সমুদ্র-উপকূলে আতীব্র উৎকণ্ঠায় দাঁড়িয়ে স্মিথ যা শুনেছিল, যা দেখেছিল—তার বিবরণ লিখেছে নিজের ডাইরীতে। প্রতীক্ষার অবসান ঘটেছিল প্রথম বংশীধ্বনিতে—বহুদূরে

থেকে ভেসে আসা বংশীধ্বনির রেশ মিলোতে না মিলোতেই একই সঙ্গে শোনা গিয়েছিল বিস্ফোরণের শব্দ আর অদ্ভুত চাপা সম্মিলিত গর্জন আর চীৎকার। তারপরে একজনের মনে হয়েছিল যেন বন্দুক নির্ঘোষ ভেসে এল পর পর কয়েকবার। তার অনেক পরে স্মিথের মনে হল যেন মাথার ওপরে দূরে বায়ুস্তরে সমুদ্রকল্লোলের মত অনেক কণ্ঠের মিলিত কথাকাটা-কাটি—কারা যেন বজ্রগর্ভ কণ্ঠে কথা বলছে শূন্যে—ঊর্ধ্বে। ভোরের ঠিক আগেই একজন মাত্র বার্তাবহ বিস্ফারিত চোখে, সারা গায়ে অজ্ঞাত বিকট গন্ধ বয়ে এনে ভগ্ন বিকৃত কণ্ঠে দলবল সহ স্মিথকে চুপিসারে বাড়ী চলে যেতে বললে—বাড়ী যাওয়ার পথে বা পরে আজ রাতের কোনো কথা যেন কাউকে না বলা হয়—ইহজীবনে যেন জোসেফ কারওয়েন সম্পর্কে কোনো প্রসঙ্গ কারো সঙ্গে আলোচনা করা না হয়।

লোকটা নিজে খালাসী। অনেক ঘাটে ঘুরেছে, অনেক বিচিত্র ভয়ানক জিনিস দেখেছে। কিন্তু তার চেহারা, কথাবার্তা দেখে মনে হল যেন নিজের মধ্যে সে আর নেই। সত্তার খানিকটা ফেলে এসেছে খামারবাড়ীতে। মুখের কথায় যা সে বোঝাতে পারেনি—চোখ মুখ দেখে তা টের পেয়েছিল স্মিথ।

পরে একই অবস্থা দেখা গিয়েছিল অন্যান্য স্বেচ্ছা-যোদ্ধাদের ক্ষেত্রেও। খামারবাড়ী আর পাথরের বাড়ীতে যারাই ঢুকেছে, তারাই যেন অন্য মানুষ হয়ে বেরিয়ে এসেছে। যেন নিজেদের খানিকটা রেখে এসেছে সেই ভয়ালপুরীতে। অথবা সঙ্গে এনেছে অবর্ণনীয় ভয়ংকর স্মৃতি। অসাড় জিহ্বায় সেকথা বলা যায় না—ইহজীবনে নয়। সারা জীবনে তাদের কেউই সেই রাত্রের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একটি কথাও আর কাউকে বলেনি। ঊর্ধ্বশ্বাসে বিস্ফারিত চোখে ছুটে আসা একজন মাত্র দূতের কাছে স্মিথ যেটুকু শুনেছিল—লিখে রেখেছিল নিজের ডাইরীতে। তার লেখা ছাড়া সে রাতের অভিযানের কোনো লিখিত বর্ণনা আর কোথাও নেই।

চার্লস ওয়ার্ড কিন্তু অন্য সূত্রে কিছুটা খবর বার করেছিল। ফেনার পরিবারের এক আত্মীয় নিউ লণ্ডনে থাকত। ফেনাররা বাড়ী বসেই দেখেছে স্বেচ্ছা-যোদ্ধাদের বেরিয়ে যেতে। কিছুক্ষণ পরে শোনা গিয়েছে কারওয়েনের কুকুরগুলোর ক্রুদ্ধ গর্জন—সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ন তীব্র বংশীধ্বনি। শুরু হয়ে গেল আক্রমণ—তিন দিক থেকে।

প্রথমবার বাঁশি বাজবার পরের মুহূর্তেই পাথরের বাড়ীর ছাদ দিয়ে আবার দেখা গিয়েছিল আকাশমুখো আলোর ঝলসানি। দ্বিতীয়বার

বাঁশি বাজবার পরেই ধমকে উঠেছিল অনেকগুলো গাদা বন্দুক—সেইসঙ্গে অবরুদ্ধ কণ্ঠে অনেকগুলো আর্ত চীৎকার। চিঠিতে ফেনার লিখেছিল চীৎকারগুলো অনেকটা এইরকম—'বা-আ-আ-হা-র-র-র-র...আ-র-বা-হা-র-র-র-র।'

এই যে চীৎকার, এর কোনো মানে নেই—কিন্তু চীৎকারের মধ্যে এমন একটা রক্তজলকরা ভয়াবহতা ছিল যে পত্রলেখকের মা শোনামাত্র জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছিল মেঝেতে। চাপা চীৎকার পরেও শোনা গিয়েছিল—কিন্তু তার চাইতেও বেশী শোনা গিয়েছিল উপর্যুপরি বন্দুক নির্ঘোষ—প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নদীর দিক থেকে ভেসে এসেছিল ভীষণ বিস্ফোরণের আওয়াজ। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে সবকটা কুকুর একই সঙ্গে দারুণ ঘেউ ঘেউ করে উঠেছিল এবং মাটির তলা থেকে ভেসে এসেছিল একটা গুম গুম শব্দ—থর থর করে কেঁপেছিল পায়ের তলার জমি—সেই সঙ্গে ম্যাণ্টলপিসের মোমবাতি। বাতাসে ভেসে এসেছিল গন্ধকের কটু গন্ধ। লুক ফেনারের বাবা এই সময়ে নাকি শুনতে পেয়েছিলেন সর্বশেষ বিপদজ্ঞাপক বংশীধ্বনি—পাহারা ছেড়ে বাইরের দল যেন ছুটে আসে ভেতরের যোদ্ধাদের বাঁচাতে। কিন্তু সর্বশেষ এই বংশীধ্বনি নাকি অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল বলে অন্যে শোনেনি। তবে বন্দুকের চাপা নির্ঘোষ ভেসে এসেছিল পরের পর—সেই সঙ্গে গা-গুলোনো গলা ঝাড়ার মত কাশির আওয়াজ...গার্গল করলেও এই আওয়াজ শোনা যায়—আর্ত চীৎকার তাকে বলা যায় না—তবুও মনে হয়েছিল টেনে টেনে কেশে চললেও শব্দটা অজ্ঞাত কণ্ঠের অশ্রুতপূর্ব হাহাকার।

পরক্ষণেই কারওয়েন ভবন যেখানে থাকবার কথা, সেখানে যেন মাটি ফুঁড়ে আবির্ভূত হল অগ্নিময় একটা মূর্তি। শোনা গেল অনেকগুলো মানুষের গলায় ভয়ার্ত চীৎকার। ঝলসে উঠল বন্দুক শিখা, ভেসে এল গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ—আছড়ে পড়ল লেলিহান অগ্নিশিখায় মোড়া বস্তুটা। পরের মুহূর্তেই আবির্ভূত হল আরেকটা দাউ দাউ মূর্তি। আবার শোনা গেল বন্দুক নির্ঘোষ, বহু মানুষের রক্ত হিমকরা চীৎকার। ফেনার দু'একটা শব্দ ধরতে পেরে লিখে রেখেছিল—'ঈশ্বর! তোমার সৃষ্টি বাঁচাও! অসহায়দের রক্ষা করো!' আরও বন্দুক গর্জে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় জ্বলন্ত বস্তুটাও আছড়ে পড়ল মাটিতে। এর পরে পঁয়তাল্লিশ মিনিট আর কোনো শব্দ শোনা যায়নি। তার পরেই নাকি 'একটা লাল কুয়াশা' উঠে যেতে দেখা গিয়েছিল অভিশপ্ত খামারবাড়ী থেকে তারা-মহলের দিকে। রক্তমেঘের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে নাকি

অনেকগুলো অমানুষিক কণ্ঠ একই সঙ্গে নিদারুণ ভয়ে গুঙরে উঠেছিল এবং কাকতালীয় কিনা বলা মুস্কিল—তবে ঠিক তখুনি ঘরের মধ্যে বেড়াল তিনটের পিঠ ধনুকের মত বেঁকে শক্ত হয়ে গিয়েছিল—খাড়া হয়ে গিয়েছিল লোম।

পাঁচ মিনিট পরে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা ভেসে এসেছিল খামার-বাড়ীর দিক থেকে—সেই সঙ্গে পূতিগন্ধময় অসহ্য নারকীয় দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল পটুক্সেট গ্রামের সবাই। সমুদ্রের টাটকা ঝড়ো হাওয়ায় নাকি সেই বোঁটকা বদ গন্ধ দূর হয়—আর কিছুতে নয়। এ রকম একটা বিটকেল বীভৎস দুর্গন্ধ শোঁকার অভিজ্ঞতা এর আগে নাকি কারও হয়নি। শ্মশানে-মশানে গেলে নাকি অনেকটা এইরকম উৎকট পচা বিশ্রী গন্ধ পাওয়া যায়। দুর্গন্ধটা নাকে আসার সঙ্গে সঙ্গে শোনা গিয়েছিল লোমহর্ষক সেই কণ্ঠস্বর—এ গলা শুনেছে যে দুর্ভাগারা, তারা নাকি জীবনে আর তা ভুলতে পারবে না। কালান্তক অভিশাপের মত স্বর নেমে এসেছিল আকাশ থেকে বাজ পড়ার মত বুক কাঁপানো গভীর গর্জনে—খটখট শব্দে জানলা কেঁপে উঠেছিল বজ্রকণ্ঠের প্রতিধ্বনিতে। বজ্রগর্ভ সেই কণ্ঠস্বর সুগম্ভীর—কিন্তু সঙ্গীতময়—ব্রাস অর্গানের মত শক্তিপূর্ণ, কিন্তু নিষিদ্ধ আরব্য-গ্রন্থের মত অমঙ্গলে। আকাশবাণীর অর্থ কেউ বোঝেনি। কেন না ভাষাটা অজ্ঞাত। তবে দানবিক উচ্চারণে ঠিক যেভাবে অভিশাপ বর্ষিত হয়েছিল আকাশ থেকে, লুক ফেনার তা হুবহু লিখে রেখেছিল চিঠির মধ্যে। কথাটা এই "DEESMEES—JESHET—BONE DOSE FEDUVEMA—ENTTEMOSS !" ১৯১৯ সাল পর্যন্ত দেশের মানুষ আকাশের এই বাণীর মর্মার্থ বুঝে ওঠেনি। কিন্তু শিউরে উঠেছিল চার্লস ওয়ার্ড। কেন না, পিশাচ-সিদ্ধের যে মন্ত্রোচ্চারণে চরম বিভীষিকা মূর্ত হয় অমূর্ত জগৎ থেকে, এ সেই মন্ত্র যা স্বয়ং মির‍্যান-ডোলাও উচ্চারণ করতে গিয়ে ভয়ে কেঁপে উঠেছে।

আকাশ থেকে মৃত্যুমন্ত্র মর্ত্যের মাটিতে পোঁছোতে না পোঁছোতে কারওয়েন ভবন থেকে মানুষের গলায় এক বা একাধিক কণ্ঠের সম্মিলিত আর্ত চীৎকার সাড়া দিয়েছিল। ঠিক তারপরেই বেড়ে গিয়েছিল মড়া পচা বিকট সেই গন্ধ—অসহ্য সেই পচা গন্ধর সঙ্গে সঙ্গে এবার যে শব্দতরঙ্গ ভেসে এসেছিল—তা আর্ত চীৎকার নয়—নিরাশার হাহাকার। বুক ফাটা দীর্ঘশ্বাস যেন আকাশফাটা কান্না হয়ে উঠে নেমে উম্মাদ তরঙ্গে মিলিয়ে গিয়েছিল দূর হতে দূরে। অর্থহীন প্রলাপ নয় সেই হাহাকার—কয়েকটা কথা স্পষ্ট শোনাও গিয়েছিল—কিন্তু মানে বোঝা

যায়নি। তারপর হাহাকারটা যেন দানোয় পাওয়া পিশাচের মত ক্ষিপ্তের অট্টহাসি হয়ে ছুটে গিয়েছিল দিকে দিকে। সেইসঙ্গে বিষম ভয়ে পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠেছিল অনেকগুলো মানুষের গলা—চীৎকার তো নয়—যেন কলজে ছেঁড়া মূর্ত আতংক। তারপর আর কোনো শব্দ শোনা যায়নি—কোনো আলো দেখা যায়নি। নিশ্চুপ নিশ্ছিদ্র তমিস্রায় ঢেকে গিয়েছিল সবকিছু। তাল তাল কুটিল কটু ধোঁয়া কেবল পাক খেতে খেতে ঢেকে দিয়েছিল তারাদের। অথচ আগুনের চিহ্নমাত্র দেখা যায়নি। পরের দিন সকালেও বাড়ীঘরদোর ভস্মীভূত অবস্থায় পাওয়া যায়নি। অত ধোঁয়া কোত্থেকে উঠল, সে রহস্যের কিনারা আর হয়নি।

ভোরের দিকে দুজন বার্তাবহ ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে এসে ধাক্কা দিল ফেনারদের দরজায়। সারা গায়ে তাদের সে কি দুর্গন্ধ—জামাকাপড় যেন ডুবিয়ে এনেছে দানবিক দুর্গন্ধের সাগরে। দরজা খুলতেই চাইল দু মগ মদ। মদে চুমুক দিয়ে একজন বললে, জোসেফ কারওয়েনের সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ হয়েছে এবং এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর কোনো আলোচনা নয়। কথার ধরনটা রুক্ষ হলেও যেভাবে সে কারওয়েন প্রসঙ্গে ছেদ টেনে দিয়েছিল—তা মনে দাগ রেখে যায়। তাই লুক ফেনার তার আত্মীয়কে চিঠিতে লিখেছিল—এ চিঠিখানাও যেন পড়বার পর পুড়িয়ে ফেলা হয়। কিন্তু সে নির্দেশ মানা হয়নি বলে উত্তরকালে চিঠিটা হাতে এল চার্লস ওয়ার্ডের। এই চিঠির সঙ্গে পটুক্সেট গ্রামের কয়েক ঘর থেকে জোগাড় করা খবর জুড়ে পেল সেই রাতের গুপ্ত অভিযানের আরো অনেক খবর। একজন বললে, জোসেফ কারওয়েনের মৃত্যু ঘোষিত হওয়ার এক হপ্তা পরে ক্ষেতের মধ্যে একটা বিশ্রীভাবে পোড়া দেহ দেখা গিয়েছিল। গুজব—দেহটা পুড়ে বিকৃত হয়ে গেলেও ও দেহ নাকি মানুষের নয়—কোনো পার্থিব জানোয়ারেরও নয়।

৬

সেই রাত্রের ভয়ানক অভিযানে যারা গিয়েছিল, তাদের কারোর মুখ থেকেই একটি কথাও বার করা যায় নি। যা কিছু জানা গিয়েছে, তা অন্য লোকের মুখ থেকে।

মারা গিয়েছিল আটজন খালাসী। কিন্তু মৃতদেহ ফিরিয়ে দেওয়া

হয় নি আত্মীয় স্বজনের। শুধু বলা হয়েছিল—কাস্টমস রক্ষীদের সঙ্গে লড়াইয়ে ওরা জীবন দিয়েছে।

বেঁচে যারা ফিরে এসেছিল, তাদের সারা গায়ে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন ব্যাণ্ডেজে ব্যাণ্ডেজে ঢেকে দিয়েছিলেন ডক্টর বোয়েন—ডাক্তারী বাক্স হাতে তিনি হানাদার বাহিনীর সঙ্গে গিয়েছিলেন।

সবচেয়ে বেশী রহস্য ঘনীভূত হয়েছিল বিকট বিশ্রী ঐ দুর্গন্ধ নিয়ে। খামার বাড়ীতে যে-কজন গিয়েছে, তাদের প্রত্যেকের গা আর জামাকাপড় থেকে বমি-জাগানো ঐ বীভৎস গন্ধ পাওয়া গেছে। মাস-কয়েক শুধু এই গন্ধ নিয়ে গুজবের পর গুজব রটেছে শহরময়। কিন্তু গন্ধবিকটের মানে বোঝা যায় নি।

সবচেয়ে বেশী চোট খেয়েছিলেন দলনেতা ক্যাপ্টেন হুইগুল আর মোজেজ ব্রাউন। তার চেয়েও অদ্ভুত হল আঘাত নিয়ে তাঁদের আচরণ। ব্যাণ্ডেজ খুলে ঘা কখনো দেখাতে চাইতেন না নিজেদের স্ত্রীদেরও—আঘাতের ধরন নিয়ে টুঁ শব্দটি করতেন না—জিজ্ঞেস করলে জবাব দিতেন না।

এক রাতেই যেন বয়স বেড়ে গিয়েছিল হানাদার পার্টির প্রত্যেকের—ধাত ছেড়ে গিয়েছিল মর্মান্তিক অভিজ্ঞতায়। নেহাৎ প্রত্যেকে শক্ত সমর্থ পুরুষ—দেহে ও মনে—তাই পাগল হয়ে যায় নি। তবে যে করাল স্মৃতিভারে আচ্ছন্ন হয়েছিল প্রত্যেকে—তা কাটিয়ে উঠতে সময় লেগেছে। সবচেয়ে বেশী বিচলিত হয়েছিলেন প্রেসিডেণ্ট মানিং। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিও স্রেফ উপাসনার মাধ্যমে মনকে খাড়া করতে পেরেছিলেন। পরবর্তী কালে দলনেতাদের প্রত্যেককে কিছু না কিছু চাঞ্চল্যকর কাজে হাত দিতে হয়েছে। যেমন, ঠিক এক বছর পরে বিশাল জনতার পুরোধা হয়ে ক্যাপ্টেন হুইপ্‌ল্‌ আক্রমণ করলেন রাজস্ব জাহাজ 'গ্যাসপি'কে। জাহাজে নাকি এমন সব মূর্তি ছিল যা দেখাও পাপ—দেখলে মাথার চুল খাড়া হয়ে যায়। গোটা জাহাজকে মালসমেত পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিলেন হুইপ্‌ল্‌।

কারওয়েনের বিধবা স্ত্রীর কাছে অদ্ভুত গড়নের একটা সীল করা সিসের শবাধার পৌঁছে দেওয়া হল। কফিনের মধ্যেই নাকি কারওয়েনের দেহ আছে। তিনি মারা গেছেন নাকি কাস্টমস অফিসারদের সঙ্গে হাতা-হাতি লড়াইয়ে—কি ভাবে, সেটা বলা সঙ্গত হবে না।

জোসেফ কারওয়েনের লোকান্তর সম্পর্কে এর বেশী একটি কথাও

আর কারো মুখে শোনা যায় নি। চার্লস ওয়ার্ড সামান্য আঁচ করতে পেরেছিল কারওয়েনকে লেখা জেডেডিয়া ওর্নের মাঝপথে লোপাট করা চিঠিখানা পড়ে—স্মিথের ডাইরীতে কপি করা ছিল চিঠিটা। স্মিথ কেন যে ডাইরীটা নষ্ট করে যায় নি, সে এক রহস্য। সে কি মুখে কিছু না বলে ডাইরীর ঐ চিঠির মাধ্যমে সবাইকে জানাতে চেয়েছিল পিশাচ শিরোমণি কারওয়েনের মৃত্যুর কারণ? ডাইরীটা কি সেইজন্যেই রেখে গিয়েছিল ছেলেপুলে নাতিনাতনীর কাছে? চিঠির এই কয়েকটা লাইনই সবচেয়ে বেশী তাৎপর্যপূর্ণ:

'তাই ফের বলছি, যাকে তুমি কফিনে ফিরোতে পারবে না—কফিন থেকে তাকে জাগিও না। তার ক্ষমতা তোমার চাইতে বেশী হলে, সে নিজেই অদৃশ্য আতংকদের ডেকে এনে তোমাকে শেষ করে দিতে পারে। তোমার ইন্দ্রজালেও তখন আর কোনো কাজ হবে না। তোমার চাইতে কম শক্তিমানকে ডাকো—সে ডাকে প্রকৃত শক্তিমান সাড়া দেবে না—তোমাকে তার দাস বানিয়ে রাখবে না।'

এই লাইন কটা পড়েই কি বোঝা যায় না কোণঠাসা অবস্থায় পিশাচ-সিদ্ধ পুরুষ কাদের আহ্বান জানায়? কাদের সাহায্য চায়? মরিয়া হয়ে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে এমন অদৃশ্য সহায়দের আহ্বান করে যাদের নাম মুখে আনা যায় না? চার্লস ওয়ার্ড তাই মনে মনে বুঝেছিল—জোসেফ কারওয়েনকে যে নিধন করেছে সে প্রভিডেন্সবাসী নয়—এই পৃথিবীর কেউ নয়।

প্রভিডেন্সের লিখিত নথিপত্র এবং অলিখিত স্মৃতিপটে কোথাও যাতে জোসেফ কারওয়েনের নামগন্ধও আর না থাকে, দলনেতাদের প্রভাবে আর চেষ্টায় তা সম্ভব হয়েছিল। কারওয়েনের বিধবা স্ত্রী আর তার বাবাকে এত কথা না জানালেও ক্যাপ্টেন টিলিনঘাস্ট বড় ধুরন্ধর, জেদী আর কড়া লোক। কানে অনেক কথা এসেছিল বলেই তিনি একদিন উঠে পড়ে লাগলেন মেয়ে আর নাতনীর পদবী পালটে দেওয়ার জন্যে। নামের মধ্যেও যেন কারওয়েনের ছায়া আর না থাকে। গুজব শুনেই শিউরে উঠেছিলেন তিনি—তাই কারওয়েনের লাইব্রেরী পুড়িয়ে দিলেন, কাগজপত্র সব ছাই করলেন। কারওয়েনের কবরের ওপর শ্লেট পাথরে লেখা নামটা পর্যন্ত চেঁচে তুলে দিলেন।

সেই থেকেই কারওয়েনকে কাগজপত্র থেকে তুলে দেওয়ার হিড়িক জোরদার হল শহরে। কোথাও আর কোনো চিহ্ন রইল না।

১৭৭২ সালের পর থেকে বিধবা কারওইনকে সবাই মিসেস টিলিনঘাস্ট

বলে ডাকত। ওলনিকোর্ট বেচে দিয়ে বাবাকে নিয়ে সে চলে এল পাওয়ার্স লেনে—১৮১৭ সালে মারা গেল সেখানেই। পটুকসেট খামার বাড়ীর ছায়া মাড়ানো ছেড়ে দিয়েছিল সবাই। কালের অমোঘ নিয়মে তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল এক সময়ে। অস্বাভাবিক এবং অব্যাখ্যাত দ্রুততায় একে একে ভেঙে পড়তে লাগল দেওয়াল, ছাদ, চিমনী। ১৭৮০ সালে দেখা গেল কেবল পাথর আর ইঁটের দেওয়াল দাঁড়িয়ে। ১৮০০ সালে সেগুলিও ভেঙে পড়ল—রইল কেবল স্তূপ। নদীর ধারে ঝোপের মধ্যে যেখানে ঢাকা রয়েছে ওক কাঠের দরজা—সে দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢোকার বুকের পাটা ছিল না কারোরই। যে ভয়ঙ্কর আলয় থেকে তিরোহিত হয়েছে কারওয়েনের অশুভ আত্মা—তা নিয়ে গল্প করাও ছেড়ে দিল গাঁয়ের লোক।

বৃদ্ধ দুর্মদ ক্যাপ্টেন হুইপ্‌ল্‌ মাঝে মাঝে আপন মনে বিড় বিড় করতেন আর মাথা নাড়তেন। কান খাড়া করে পাশ থেকে লোকে যা শুনেছে, তা এই ঃ

'চেঁচিয়ে উঠেই কেন হাসল অমন ভাবে? কি দরকার ছিল হাসবার? নিশ্চয় কোনো মতলব ছিল—শেষ সময়েও তাই হেসেছিল খল খল করে···বাড়ীটাকে পুড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হতাম।'

তৃতীয় পর্ব---একটি তল্লাসি এবং একটি বহিষ্করণ

১৯১৮ সালে চার্লস ওয়ার্ড প্রথম জানল যে সে জোসেফ কারওয়েনের বংশধর। কারওয়েনের রক্ত যার শিরায় প্রবাহিত, এই কাহিনী শোনার পর থেকেই পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য উদঘাটন করতে যে সে উঠে পড়ে লাগবে, এতে আর আশ্চর্য কি। অতীত রহস্যের উপযুক্ত ব্যাখ্যার অন্বেষণে হন্যে হয়ে ঘুরতে লাগল চার্লস।

এ কাজে প্রথমদিকে কোনোরকম লুকোছাপার ধার দিয়েও যায় নি চার্লস। যে কারণে ডক্টর লাইমানও জোর দিয়ে বলতে পারেন না যে ছোকরার উম্মত্ততার শুরু ১৯১৯ সালের শেষ থেকে। কারওয়েন প্রসঙ্গ নিয়ে বাড়ীর সবার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলত চার্লস। কারওয়েনের মত একটি নরকের কীটকে পূর্বপুরুষ রূপে পাওয়ার জন্যে কিন্তু সুখী ছিলেন না চার্লসের মা। কারওয়েন-পাগল ছেলে কিন্তু মিউজিয়াম আর

লাইব্রেরীর অফিসারদের জিজ্ঞেস করত, বাড়ী বাড়ী গিয়ে ডাইরী বা চিঠি জোগাড় করত। আর ভাবত সত্যিই কি দেড়শ বছর আগে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল? জোসেফ কারওয়েন আসলে কে? ঠিক কোনখানে তাঁর খামার বাড়ী?

স্মিথের ডাইরী হাতে আসার পর এবং জেডেডিয়া ওর্ণের চিঠিখানা পড়বার পর চার্লস ঠিক করলে সালেমে গিয়ে খোঁজ নেবে কারওয়েন সেখানে কি খেলা খেলেছিলেন। ১৯১৯ সালের ঈস্টারের ছুটিতে সালেম গেল চার্লস। এসেক্স ইন্সটিটিউটে যেতেই পেল কারওয়েন সম্পর্কে অনেক খবর। ১৬৬২-৩ সালের আঠারোই ফেব্রুয়ারী সালেম গ্রামে জন্মেছিলেন জোসেফ কারওয়েন। পনেরো বছর বয়েসে সাগরে পালিয়েছিলেন। ন' বছর পরে ফিরে এলেন পাক্কা ইংরেজ হয়ে। জামা কাপড়, কথাবার্তা, আদব কায়দা—সব ইংরেজের মতন। বসবাস শুরু করলেন সালেম শহরে। বাড়ীর কাজ খুব কমই করতেন। ইউরোপ থেকে আনা অদ্ভুত বই মুখে করে বসে থাকতেন দিবারাত্র; নয়তো ইংলণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড থেকে জাহাজে আসা বিস্তর বিদঘুটে কেমিক্যাল নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন ঘরের মধ্যে। মাঝে মাঝে তাঁর উধাও হয়ে যাওয়া নিয়ে খটকা লাগত বাড়ীর লোকের। এই সময়ে অনেক রকম গুজব ছড়িয়ে পড়ল নিশুতি রাতে পাহাড়ের ডগায় অদ্ভুত আগুনের নৃত্য দেখে।

সালেম গ্রামের এডওয়ার্ড হাচিনসন আর সালেম শহরের সাইমন ওর্ণে ছাড়া কারওয়েনের প্রাণের বন্ধু আর কেউ ছিল না। কারওয়েন এদের বাড়ী যেত এবং মিটিং করত। হাচিনসন থাকত জঙ্গলের ধারে একটা বাড়ীতে। রাত বিরেতে সেখানে অনেক রকম অমানুষিক আওয়াজ পাওয়া যেত বলে স্থানীয় লোক হাচিনসনকে কোনদিন ভাল চোখে দেখেনি। অদ্ভুত সব আগন্তুকদের খাতির যত্ন করত হাচিনসন এবং তখন নানা রঙের আলোর বিচ্ছুরণ দেখা যেত তাঁর জানলা থেকে। কোনকালে যারা মরে ভূত হয়ে গেছে তাদের সম্বন্ধে এবং বিস্মৃত বহু ঘটনা গড়্ গড়্ করে বলতে পারত হাচিনসন—বলাবাহুল্য ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগেনি পাড়া প্রতিবেশীদের। ঠিক তারপরেই আরম্ভ হল ডাকিনী আতংক এবং হাচিনসন রাতারাতি উধাও হয়ে গেল দেশ থেকে—আর ফিরে আসে নি।

একই সঙ্গে উধাও হয়েছিলেন জোসেফ কারওয়েন। কিন্তু পরে খবর এল তিনি ডেরা নিয়েছেন প্রভিডেন্সে। ১৭২০ সাল পর্যন্ত সাইমন

ওর্ণে সালেমেই ছিলেন। কিন্তু এত বছরেও তাঁর বয়স বাড়ে নি, বুড়ো হন নি। লোকে যখন এই নিয়ে গুজগুজ ফুসফুস শুরু করে দিল, ঠিক তখনি দেশ ছেড়ে লম্বা দিল সাইমন—ত্রিশ বছর পরে আবির্ভূত হল তাঁর ছেলে—সঙ্গে সাইমনের নিজের হাতে লেখা দলিল পত্র। সুতরাং সাইমনের বিষয় সম্পত্তি পেয়ে গেল জেডেডিয়া ওর্ণে। সালেমে আস্তানা নিল ১৭৭১ সাল পর্যন্ত। এই সময়ে প্রভিডেন্সের নাগরিকরা খানকয়েক চিঠি লেখেন রেভারেণ্ড টমাস বার্ণাড এবং অন্যান্যদের। পরিণামে, নিঃশব্দে কাকপক্ষীকেও জানতে না দিয়ে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয় অজ্ঞাত অঞ্চলে।

দলিল দস্তাবেজ যা কিছু পাওয়া গেল এসেক্স ইন্সটিটিউটে, তার অধিকাংশ বিষয় সম্পত্তি সংক্রান্ত। কিন্তু চার পাঁচটি ক্ষেত্রে ডাকিনী-তন্ত্রের উল্লেখ আছে। পিশাচবিদ্যা চর্চার জন্যে যারা আদালতে সাজা পেয়েছে, তাদের নাম এবং বিচারের বিবরণ। যেমন ১৬৯২ সালের একটি মামলা। চল্লিশজন ডাইনী আর পিশাচ সিদ্ধ পুরুষ নাকি হাচিনসনের বাড়ীর পেছনকার জঙ্গলে দেখা সাক্ষাৎ করত। এইরকম আরও কয়েকটা নাম। তারপর পাওয়া গেল একটা ক্যাটালগ—হাচিনসনের অন্তর্ধানের পর তার অলৌকিক গ্রন্থাগারের বইয়ের তালিকা। আর একটা অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি—হাচিনসনের নিজের হাতে লেখা। কিন্তু দুর্বোধ্য সাংকেতিক হরফে লেখার জন্যে অর্থ কারো বোধগম্য হয় নি, পাণ্ডুলিপির ফটোস্ট্যাট কপি নিয়েছিল চার্লস। তারপর সাং-কেতিক হরফের রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা আরম্ভ হয়েছিল। অগাস্টে দেখা গেল চার্লস রীতিমত উত্তেজিত—সাংকেতিক পাণ্ডুলিপির মর্মার্থ ধরতে পারার জন্যেই বোধহয়। অক্টোবর অথবা নভেম্বরে তার কথাবার্তার সুর যেন পালটে গেল। কারওয়েন সম্পর্কে এতদিন যা নিছক কৌতূহল ছিল—ঐ সময় থেকেই যেন তা স্পষ্ট প্রতীতি হয়ে উঠেছিল। অবশ্য পাণ্ডুলিপির মানে তার কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে কিনা---এ সম্পর্কে একটি কথাও কাউকে সে বলে নি।

চার্লস ওয়ার্ডের পরবর্তী প্রয়াস হল ওর্ণে রহস্যের সমাধান। কারওয়েনকে লেখা চিঠিতে ওর্ণে স্পষ্ট লিখেছিল যেহেতু বেশীদিন বাঁচলে লোকের সন্দেহ হয়—তাই সে ছেলেরূপে ফিরে এসেছে সমাজে। অর্থাৎ সাইমন ওর্ণে আর জেডেডিয়া ওর্ণে একই ব্যক্তি। ত্রিশ বছর গা ঢাকা দেওয়ার পর ফিরে এসেছে নতুন নাম নিয়ে। অবশ্য কাগজপত্র সবই নষ্ট করে ফেলেছিল জুনিয়র ওর্ণে। কিন্তু ১৭৭১ সালে নাগরিকরা

তাকে সরিয়ে দেওয়ার পর কিছু কিছু দলিল পত্র যা পেয়েছিল তা নাকি বেশ রহস্যময়। বেশ কয়েকটা দুর্বোধ্য ফরমুলা আর নক্সার মানে কেউ বোঝেনি। ফরমুলা আর নক্সার কিছু ওর্ণের হাতে লেখা---বাদবাকী অন্য কারো হাতে লেখা। ফটোস্ট্যাট এনেছিল বলেই চার্লস কারওয়েনের হাতের লেখার সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছিল সেই হাতের লেখার।

বিশেষ একটি রহস্যাবৃত চিঠি কারওয়েন লিখেছিলেন পয়লা মে প্রভিডেন্স থেকে---কিন্তু সালের উল্লেখ ছিল না। খুব সম্ভব ১৭৫০ সালের পরে নয়। চিঠিখানা লেখা হয়েছিল সাইমনের নামে---কিন্তু সাইমন শব্দটা ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে কেটে দিয়েছিল খুব সম্ভব সাইমন নিজেই।

ক্রুর কুটিল যে বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা এই করাল চিঠি, তা বুঝতে গেলে পুরো চিঠিটা পড়া দরকার।

'ভায়া,---

আমার প্রাচীন বন্ধু, চিরন্তন শক্তির জন্যে যাঁর উপাসক আমরা---তাঁকে শ্রদ্ধা আর সম্মান জানিয়ে চিঠি শুরু করছি।

গতবারের চূড়ান্ত ব্যাপারটি সম্পর্কে এইমাত্র আমি যা জানলাম, তা তোমাকে জানিয়ে রাখি। এরপর করণীয় কি, এই চিঠি পড়লেই বুঝবে।

বয়স বাড়ছে না বলে তোমার মত গা-ঢাকা দেওয়ার পক্ষপাতী আমি নই। কারণ, প্রভিডেন্সের লোকের চোখ এখনো তেমন তীক্ষ্ন নয়। অস্বাভাবিক ব্যাপার-স্যাপার দেখে এদের টনক নড়ে না—তাই নিয়ে মাথা ঘামায় না—আদালতেও টেনে নিয়ে যায় না। তাছাড়া, আমি মাল জাহাজের কারবারে আটকে গেছি। এসব ছেড়ে তোমার মত চলে যেতে পারি না। তার চাইতেও বড় হল, পটুক্সেট খামার বাড়ীর তলায় যা আছে, তা আমার ফিরে আসার প্রতীক্ষায় টিঁকে থাকবে না—অন্য নামে ফিরে এসে দেখব কিছুই আর নেই।

কিন্তু তোমাকে তো আগেই বলেছি, কপাল মন্দ হলে এবং বিপদে পড়লে যাতে কেটে বেরিয়ে যেতে পারি, সে জন্য গতবারের পর থেকেই এতদিন ধরে নিজেকে তৈরী করছি। যে শব্দগুলো উচ্চারণ করলে যোগী—সোদোদি'কে জাগানো যায়। কাল রাতে হঠাৎ সেই শব্দগুলো পেয়ে গেলাম। এবং সেই প্রথম একটা মুখ দেখলাম। এ মুখের বর্ণনা······বইতে আছে। মুখটা বললে, লাইবার ড্যামনেটাস-য়ের তৃতীয় স্তবের মধ্যে রয়েছে কণ্ঠাস্থি নিয়ন্ত্রণের শক্তি। সূর্য যখন পঞ্চম

ঘরে থাকবে এবং শনি তৃতীয় ঘরে, তখন একটা আগুনের পঞ্চভুজ এঁকে নবম শ্লোকটি তিনবার পাঠ করতে হবে। এইভাবে প্রতি রুদ্রমাস এবং হ্যালোজ-য়ের আগের রাতে শ্লোক পাঠ করলে সেই জিনিসটা চক্রের বাইরেও দেহ ধারণ করবে।

পুরাতনের বীজ যারা ধারণ করতে চায়, তারা শুধু অতীতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই যা চাইবে তাই পাবে।

কিন্তু এ সব করেও লাভ কিছু হবে না যদি দুটো ব্যাপারে ত্রুটি থেকে যায়। প্রথমতঃ বংশধর রাখতে হবে। দ্বিতীয়তঃ জান্তব-চূর্ণ প্রস্তুত করে 'তাঁর' সমীপে নিবেদন করে যেতে হবে। এই দুটি ব্যাপারে কিছুই করা হয়ে ওঠে নি আজ পর্যন্ত। পদ্ধতি খুব কঠিন। বিস্তর নমুনা দিতে হচ্ছে। এত মানুষ জোটানোও মুস্কিল—বিদেশী খালাসীদের ভাঁড়ারও আর যথেষ্ট নয়। আশপাশের লোকের মনে কৌতূহল দেখা দিয়েছে—কিন্তু ওদের সামলাতে আমি পারব। খানদানী লোকগুলো-কেই বাগে আনা মুস্কিল। ছাপোষা মানুষদের যা বলি, তাই বোঝে। গির্জের পুরুৎ আর মিস্টার মেরিট বেশ কিছু কথা রটিয়েছে আমার সম্পর্কে—কিন্তু পরিস্থিতি এখনো বিপজ্জনক নয়। দুজন কেমিস্ট আছে শহরে—ডক্টর বোয়েন আর স্যাম ক্যারু। কাজেই কেমিক্যাল দ্রব্যাদি পেতে ঝামেলা নেই। বোরিলাস যা বলেছেন এবং বইয়ের সপ্তম খণ্ডে আবদুল আলহাজরেদ যে সাহায্য পেয়েছে—সেইভাবে আমিও চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমি যাই পাই না কেন—তোমাকে দেব। ইতিমধ্যে যে সব শব্দ লিখলাম, সেইমত অনুষ্ঠানে গাফিলতি করো না। আমার ভুল হয় নি লেখায়। কিন্তু যদি 'তাঁকে' দেখতে চাও, এই সঙ্গে যে...টা দিলাম তার ওপরের লেখাটা কাজে লাগিও। জিনিসটা এই প্যাকেটের মধ্যেই রইল। শ্লোকগুলি যখন যেভাবে উচ্চারণ করতে বললাম, ঐ ভাবে যদি ঠিক ঠিক করতে পার, তাহলে জানবে বহু বছরেও তোমার বিনাশ ঘটবে না, ইচ্ছে করলেই অতীত থেকে ফিরে আসবে এবং তাঁর সমীপে রক্ষিত জান্তব-চূর্ণের যথা ব্যবহার করতে পারবে। বাইবেলের জব ১৪, ১৪র কথা মনে রেখো।

সালেমে তুমি ফিরে আসায় আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। হয়তো শীগগিরই দেখাও হতে পারে। আমার ভাল ঘোড়া আছে। দরকার একটা মজবুত গাড়ীর,---যেমন মিস্টার মেরিটের আছে। রাস্তা যদিও যাচ্ছেতাই। যদি বেড়ানোর সময় পাও, এদিকে আসতে পারো। বোস্টন থেকে বেরিয়ে পোস্ট রোড ধরে ডেড্‌হ্যাম, রেণ্টহ্যাম আর অ্যাট্‌ল্‌বরো

হয়ে আসবে---সব শহরেই ভাল সরাইখানা পাবে। প্রভিডেন্সে ঢুকবে পটুক্সেট প্রপাতের পাশ দিয়ে---মিস্টার সেলিসের সরাইখানার গা দিয়ে। আমার বাড়ী টাউন স্ট্রীটে মিস্টার ওলনির সরাইখানার ঠিক উল্টোদিকে—ওলনি কোর্টের উত্তরদিকের প্রথম বাড়ীটা।

তোমার একান্ত পুরোনো বন্ধু
জোসিফার সিঃ

মিস্টার সাইমন ওর্ণে
উইলিয়ামস লেন
সালেম।

এত নথিপত্র ঘেঁটেও প্রভিডেন্সে কারওয়েনের বাড়ীর সঠিক হদিশ পায়নি চার্লস---পেল এই চিঠির মধ্যে। উত্তেজনা তুঙ্গে উঠল আরো একটি কারণে। ওলনি কোর্টের ভগ্নপ্রায় বাড়ীটা থেকে কতদূরে নতুন বাড়ীটা নির্মিত হয়েছিল---সে বৃত্তান্তও পেয়ে গেল চার্লস। পুরোনো বাড়ীটায় চার্লস ছেলেবেলা থেকে ঘুরঘুর করেছে প্রাচীন সামগ্রী প্রাপ্তির নেশায়। স্ট্যামপার্স হিলে চার্লসের পৈত্রিক ভিটে থেকে খুব দূরে নয় মান্ধাতার আমলের সেই বাড়ীখানা। এখন সেখানে থাকে এক নিগ্রো দম্পতি। এত চেনা বাড়ীর ঠিকানা নতুন করে সালেমে আবিষ্কার করে উৎসাহিত চার্লস ঠিক করলে বাড়ী ফিরেই আবার সেখানে যেতে হবে আরও কিছু আবিষ্কারের আশায়। যদিও কারওয়েনের চিঠির প্রতীক, শ্লোক সংখ্যা এবং অনেক শব্দর মাথামুণ্ডু কিসসু বোঝে নি সে---একটি ছাড়া। বাইবেলের জব ১৪, ১৪-তে যে শ্লোকটি আছে। তার মানে এইঃ "মানুষ মারা গেলে আর কি বাঁচে না? আমার পরিবর্তনের নির্দিষ্ট লগ্নটি যদ্দিন না আসছে, তদ্দিন আমি প্রতীক্ষায় থাকব।"

২

খুশী মনে বাড়ী ফিরল চার্লস। পরদিন শনিবার। সারাদিন কাটালো ওলনি কোর্টের বাড়ীতে। বাড়ীটা জরাজীর্ণ, খসে খসে পড়ছে। আড়াই তলা কাঠের বাড়ী। ছুঁচোলা ছাদ, মধ্যিখানে পেল্লায় চিমনী,

কারুকাজ করা দরজা-জানলা। খুব বেশী মেরামত হয়নি বলেই চার্লসের মনে বড় আশা হল হয়ত কিছু পেয়ে যাবে।

নিগ্রোদম্পতি চার্লসকে চিনত। খাতির করে নিয়ে গেল ভেতরে। কিন্তু সেখানে বিস্তর সংস্কারের চিহ্ন দেখে মনটা গেল দমে। দেওয়াল থেকে কাবোর্ড ইত্যাদি উপড়ে নামিয়ে স্রেফ ওয়াল-পেপার দিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছে। কারুকার্যের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। হতাশ হলেও মনটা রোমাঞ্চিত হল জোসেফ কারওয়েনের মত বিভীষিকাময় পূর্ব-পুরুষের এককালের বাসভবনে দাঁড়িয়ে থাকার উত্তেজনায়। পেতলের কড়ায় একটা মনোগ্রাম চেঁচে তুলে ফেলা হয়েছে দেখে শিরশির করে উঠল শিরদাঁড়া।

সেই থেকে স্কুল বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত হাচিনসনের সাংকেতিক লিপির ফটোস্ট্যাট কপি আর কারওয়েন সম্পর্কিত স্থানীয় তথ্যাবলীর মধ্যে নিমগ্ন রইল চার্লস। প্রথমটিতে দাঁত ফোটাতে না পারলেও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এমন সব চাঞ্চল্যকর খবর আসতে লাগল যে নিউলণ্ডন আর নিউইয়র্কে না গিয়ে পারল না সে। কাজও হল। ফেনার পরিবারের চিঠি পড়ে জানা গেল পটুক্সেট খামার বাড়ীতে নৈশ-অভিযানের ভয়ানক বিবরণ। নাইটিংগেল …ট্যালবটের চিঠি থেকে উদ্ঘাটিত হল আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। কার-ওয়েন গ্রন্থাগারে দেওয়ালের তক্তায় নাকি কারওয়েনের একটা ছবি আঁকা আছে। খবরটা পেয়েই মন চনমন করে উঠল চার্লসের। কারওয়েনকে কেমন দেখতে তা জানা যাবে ঐ ছবি আবিষ্কৃত হলে। তাই ফিরেই আর একবার ওলনি কোর্টে হানা দেওয়া মনস্থ করল চার্লস। দেওয়ালে সাঁটা কাগজের তলায় বা নতুন রঙের নীচে নিশ্চয় সে ছবিটা আজও থেকে গিয়েছে।

অগাস্টের গোড়ার দিকে শুরু হল তল্লাশি। দেওয়াল থেকে সব তাক উপড়ে নেওয়া হলেও যে সব দেওয়ালে বড় বড় কাঠের তক্তা লাগানো; বিশেষ করে সেই সব জায়গাতেই প্রথমে নজর দিল চার্লস। লাইব্রেরী কোন ঘরে ছিল, সেটা বার করতে পারলেই ছবি উদ্ধার নিয়ে মাথা ঘামানো যাবে'খন। এক তলার বড় হলঘরে আগুনের চুল্লীর ঠিক ওপরে দেওয়ালের রঙ চটে গিয়েছিল। তলা থেকে যে রঙ উঁকি দিচ্ছিল তা অন্য দেওয়ালের অনুরূপ অংশের চাইতে বেশী কালচে মনে হওয়ায় ছুরি দিয়ে খোঁচা মেরেছিল চার্লস। পরক্ষণেই বুঝেছিল, আধুনিক রঙের নীচে চাপা পড়েছে একটা প্রকাণ্ড তৈলচিত্র, দেওয়াল জোড়া কাঠের তক্তার ওপর আঁকা। আবিষ্কারের আনন্দে অন্য কেউ হলে ছুরি দিয়ে খুঁচিয়ে আদৎ

ছবির দফারফা করে ফেলত। কিন্তু চার্লসের ধৈর্য অসীম। সেদিনের মত বাড়ী ফিরে গেল। তিনদিন পরে এমন একজন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে এল যার কাজ পুরোনো ছবি উদ্ধার করা। বিবিধ রসায়ন দিয়ে সযত্নে দেওয়াল থেকে ছবি উদ্ধারের কাজে মন দিল সে। নিগ্রোদম্পতিকে ক্ষতিপূরণ দিতেই তারা আর বাধা দিলে না।

বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে তিল তিল করে বেরিয়ে আসতে লাগল একটি প্রতিকৃতি। একদিনে এ কাজ হয়নি---অনেক দিন লেগেছে। ছবিটাও পেল্লায়---থ্রি-কোয়ার্টার সাইজ। তাই আর্টিস্টকে উঠতে হয়েছে পায়ের দিক থেকে ওপরে। বাথ অয়েল আর সূক্ষ্ম বাটালি দিয়ে চেঁচে তুলেছে একটু একটু রঙ---তলা থেকে একটু একটু করে দেখা দিয়েছে সাদা মোজা পরা একজোড়া পা, নীলকোট পরা সুগঠিত একটা দেহ, কারুকাজ করা চেয়ার, পেছনের জানলায় জেটি আর ভাসমান জাহাজ। মাথা পর্যন্ত উঠতে দেখা গিয়েছে পরচুলা। সরু শান্ত, মামুলি মুখটি কিন্তু চেনা-চেনা ঠেকেছে আর্টিস্ট এবং ওয়ার্ড উভয়েরই। শীর্ণ পাণ্ডুর মুখটির প্রতিটি বৈশিষ্ট্য খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে মুহুর্মুহু চমকিত হয়েছে দুজনেই এবং শেষ মুহূর্তে রয়েছে বংশগতির নাটকীয় কারচুপি। শেষবারেই মত বাথঅয়েলে ধুয়ে বাটালি দিয়ে চাঁচবার পর দেড়শ বছরের বিস্মৃতির অবগুণ্ঠন পুরোপুরি খসে গিয়েছে এবং সভয়ে বিস্ময়ে চার্লস ওয়ার্ড কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে চেয়ে থেকেছে তারই প্রতিকৃতির পানে---চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ডের মুখের প্রতিটি রেখা মিলে যায় তৈলচিত্রের সেই মুখের রেখার সঙ্গে---অথচ সে মুখের অধিকারী সেই মুহূর্তে অতীতের প্রেত---চার্লসের অতি-বৃদ্ধ-প্রমাতামহী মহা-ভয়ংকর পুরুষ জোসেফ কারওয়েন।

বাবা আর মাকে ডেকে এনে ছবি দেখালো চার্লস। বাবা চমৎকৃত হলেন ছবির সঙ্গে ছেলের হুবহু মিল দেখে। ছবির মুখটি যেন কেটে বসানো ছেলের কাঁধে। কিন্তু চার্লসের মা আঁৎকে উঠলেন। তাঁর মুখের সঙ্গে কোনো সাদৃশ্যই নেই কারওয়েনের মুখের---অথচ চার্লসের সঙ্গে রয়েছে রেখায় রেখায় মিল। একই মুখ---কোনো তফাৎ নেই---শুধু মাঝখানে রয়েছে দেড়শো বছর। একই বংশে পূর্বপুরুষের মুখের সঙ্গে উত্তর পুরুষের মিল থাকে বইকি। কিন্তু কারওয়েনের মত ভয়ংকর মানুষের চেহারা পেয়েছে তাঁর ছেলে দেখে শিউরে উঠলেন মিসেস ওয়ার্ড। অমঙ্গল আশংকায় থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে স্বামীকে বললেন ছবিখানা পুড়িয়ে ফেলতে।

কিন্তু চার্লসের বাবা কড়া ধাতের বাস্তববাদী পুরুষ। অনেকগুলো সুতোর কলের মালিক। বউয়ের কথায় ওঠবোস করেন না। ছবিখানা তিনি কিনবেন ঠিক করলেন এবং উপহার দেবেন পুত্রকে---পূর্বপুরুষের সঙ্গে যার মুখের এমন আশ্চর্য মিল। খুঁজে পেতে বার করলেন বাড়ীর মালিককে। ইঁদুর মুখো লোকটাকে মোটা টাকা দিয়ে ম্যাণ্টেল আর ওভার-ম্যাণ্টেল সমেত পুরো ছবিটা কিনে নিলেন। পূর্ণ হল চার্লসের অভিলাষ।

ছবিটা বাড়ী নিয়ে যাওয়ার ভার পড়ল চার্লসের ওপরে। লরী ডেকে লোকজন দিয়ে পুরো ছবিটা নিজের বাড়ীতে তিনতলায় লাগিয়ে নিল সে। ঘরটা তার পড়বার ঘর। ছবির তলায় রইল নকল ফায়ার প্লেস।

ছবিটা নিয়ে যাওয়ার পর ওলনি কোর্টের বাড়ীর একতলায় ঘরে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে চার্লস দেখলে পলস্তারা খসা ইঁট বার করে দেওয়ালে একটা এক বর্গফুট পরিমিত খুপরি বেরিয়ে পড়েছে। ছবিতে কারওয়েনের মাথা যেখানে ছিল---খুপরি রয়েছে ঠিক তার পেছনে। এককালে ঐখান দিয়েই গিয়েছিল চিমনীর চোঙা, ভেতরে হাত ঢোকাল চার্লস। হাতে ঠেকল শতাব্দী সঞ্চিত ভুষি, ঝুল, ধুলো। তারও নীচে চাপা পড়ে রয়েছে খানকয়েক হলদেটে কাগজ, পুরু অমসৃণ কাগজের একটা খাতা এবং কয়েকগাছি সুতো। সুতো দিয়েই কাগজ আর খাতা বোধহয় একসাথে বাঁধা ছিল, ফুঁ দিয়ে ধুলো আর ঝুল উড়িয়ে মলাটের লেখাটা দেখে চমকে উঠল চার্লস। মোটা মোটা অক্ষরে লেখা—'বর্তমানে প্রভিডেন্সের অধিবাসী, অতীতে সালেমের বাসিন্দা, জোসেফ কারওয়েনের বক্তব্য এবং পত্রিকা।' হাতের লেখাটা স্বয়ং জোসেফ কারওয়েনের।

অন্যান্য কাগজগুলিও কারওয়েনের নিজের হাতে লেখা। একটা কাগজের শিরোনামা গায়ে কাঁটা জাগানোর মত—'তার উদ্দেশে যে ভবিষ্যতে ফিরে আসবে এবং কিভাবে সময় ও চক্র টপকে আসতে হবে।' আরেকটা সেই দুর্বোধ্য সাংকেতিক হরফে লেখা—যার মর্মোদ্ধার করতে না পেরে হাচিনসনের পাণ্ডুলিপি চার্লস পড়ে উঠতে পারেনি। তৃতীয়টায় চোখ পড়তেই মাত্রাহীন উত্তেজনায় আনন্দে কেঁপে উঠল চার্লস—কেন না সাংকেতিক হরফের সূত্র বিবৃত রয়েছে তাতে। চতুর্থ ও পঞ্চমটি উদ্দেশ করা হয়েছে যথাক্রমে 'হাচিনসন' আর 'জেডেডিয়া ওর্ণের উদ্দেশে' অথবা 'তাদের বংশধরদের উদ্দেশে' অথবা 'যারা তাদের হয়ে আসবে—

তাদের উদ্দেশে'। ষষ্ঠ এবং সর্বশেষ কাগজটিতে লেখা—'১৬৭৮ থেকে ১৬৮৭-র মধ্যে জোসেফ কারওয়েন যেখানে গেছে, যেখানে থেকেছে, যা শিখেছে—সেই সবের ভ্রমণ কাহিনী এবং আত্মজীবনী।'

৩

পাগলের ডাক্তাররা বলেছেন, ঠিক এই মুহূর্ত থেকেই নাকি চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ডের মধ্যে উন্মত্ততার লক্ষণ প্রকাশ পায়। খুপরি থেকে পাণ্ডুলিপিগুলো বার করে আনার সময়ে চার্লসের পাশে দুজন দক্ষ মিস্ত্রী দাঁড়িয়েছিল। চার্লস তাদের মলাটের লেখা দেখিয়েছিল। পাণ্ডুলিপিদের বয়স দেড়শো বছরেরও বেশী। শুনে আর কৌতূহল চাপতে না পেরে সঙ্গে সঙ্গে মলাট উলটে ভেতরের খান কয়েক পাতায় চোখ বুলিয়েছিল চার্লস এবং পরমুহূর্তেই চোখের তারা বড় হয়ে গিয়েছিল, চোয়াল ঝুলে পড়েছিল—মুখচ্ছবি একদম পালটে গিয়েছিল। আত্যন্তিক উত্তেজনায় যেন নিমেষ মধ্যে কি রকম হয়ে গিয়েছিল ছোকরা। মিস্ত্রীদের পাণ্ডুলিপির পাতা দেখতে দেয়নি। বাবা-মা'কেও দেখায়নি। বাড়ী ফেরার পর শুধু বলেছিল জোসেফ কারওয়েনের নিজের হাতে লেখা কিছু কাগজপত্র পাওয়া গেছে—কিন্তু সে কাগজপত্র কি, তা দেখায়নি। অনিচ্ছা দেখে বাবা-মাও দেখতে চাননি। এ প্রসঙ্গে চার্লস আর কথা বলেনি—প্রশ্ন এড়িয়ে গেছে।

সেই রাতেই পাণ্ডুলিপি নিয়ে বসল চার্লস। ভোর হল—ঘর থেকে বেরোলো না—খেতে নামল না। চাকর গিয়ে খাবার পেঁছে দিল ঘরে। বিকেল বেলা কিছুক্ষণের জন্যে বেরোতে হল ঘর থেকে। তৈলচিত্র লাগাতে লোকজন এসেছিল। তাদের কাজকর্ম বুঝিয়ে দিয়ে ফের ঢুকল নিজের ঘরে। সে রাতেও জামা-প্যাণ্ট পরেই ঢুলতে ঢুলতে ক্ষিপ্তের মত হাচিনসনের পাণ্ডুলিপির সাংকেতিক হরফের রহস্য উদ্ধারের চেষ্টা করে গেল। হাচিনসনের এই পাণ্ডুলিপিটি মা-কে অনেকবার দেখিয়েছিল চার্লস। তাই পরের দিন সকালে ঘরে ঢুকে মা যখন দেখল সেই পাণ্ডুলিপিরই ফটোস্ট্যাট কপি নিয়ে সারারাত জেগেছে ছেলে—জিজ্ঞেস করলেন মানে বোঝা গেল কিনা। চার্লস বলেছিল, কারওয়েন সাংকেতিক হরফের যে সূত্র লিখেছেন—তা দিয়ে হাচিনসনের পাণ্ডুলিপির মানে বোঝা যায় না।

বিকেল বেলা আবার এল মিস্ত্রীর দল। পড়বার ঘরে সুন্দরভাবে তারা লাগিয়ে দিলে পেল্লায় ছবিখানা। চার্লস তত্ত্বাবধান করল ঘরে দাঁড়িয়ে। ছবির নীচে বৈদ্যুতিক আলোয় যেন সত্যি সত্যি জ্বলতে লাগল নকল চুল্লী। ম্যাণ্টলপিসটা সত্যিই দেখবার মত। ছবির সামনের দিকটা করাত দিয়ে চৌকো করে কেটে কব্জা লাগিয়ে দেওয়া হল—যাতে পাল্লার মত তা খুলে পেছনের খুপরিতে হাত ঢোকানো যায়। ছবির পেছনে নকল চিমনীর আভাসও ফুটিয়ে তোলা হল।

মিস্ত্রীদের বিদায় দিয়ে কাগজপত্র নিয়ে ঢুকল পড়বার ঘরে। চোখ রইল বিরাট প্রতিকৃতির পানে। সেই সঙ্গে কাজ এগিয়ে চলল পাণ্ডুলিপি নিয়ে। তৈলচিত্রের অতিমানুষটি যেন বহুযুগের ওপার হতে শতাব্দী সঞ্চিত কৌতূহল নিয়ে চেয়ে রইলেন তার পানে।

চার্লসের বাবা-মা বলেছেন, এই সময় থেকেই ওঁদের দেখলেই কাগজপত্র লুকিয়ে ফেলা আরম্ভ করেছিল চার্লস। অথচ চাকর-বাকর গেলে লুকোতো না—ওদের নিয়ে ওর কোনো ভয় ছিল না। দুর্বোধ্য পাণ্ডুলিপি খোলা থাকত ওদের সামনে। কিন্তু বাবা অথবা মা ঘরে ঢুকলেই যা হয় কিছু টেনে এনে চাপা দিত খোলা পাতা—বিশেষ সেই খাতাটা কাউকেই দেখাত না, যার মলাটে লেখা আছে "তার উদ্দেশে যে ভবিষ্যতে ফিরে আসবে এবং কিভাবে সময় ও চক্র টপকে আসতে হবে।"

শুতে যাওয়ার সময় পাণ্ডুলিপি আলমারীতে রেখে তালা দিয়ে রাখতে চার্লস। ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোলেও তালা দিতে ভুলত না। ক্রমশঃ পাণ্ডুলিপি অধ্যয়নের সময় তার বাড়তে লাগল—কমতে লাগল বাইরে বেরোনোর সময়। স্কুল যাওয়াটা যেন এক ঝকমারি হয়ে উঠল। বলত, এই শেষ। কলেজে আর যাবে না। পৃথিবীর সেরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যে বিদ্যে শেখানো হয় না, সেই বিদ্যেচর্চা করার জন্য ওর এখন সময় দরকার। তাতে জ্ঞান বাড়বে অনেক বেশী।

যে ছেলে বরাবর বইমুখো এবং ছিটিয়াল—এ ধরনের অদ্ভুত রুটিন তাকেই মানায় এবং কারও চোখে তা বিসদৃশ লাগে না। তবে একটা ব্যাপারে খটকা লেগেছিল বাবা এবং মায়ের। ওর গুপ্তধন লুকিয়ে ফেলাটা যেন কেমনতর। পাণ্ডুলিপির একটা লাইনও দেখাতে চায় না চার্লস। ওঁরা ভাবলেন হয়ত অর্থটা পুরোপুরি না বোঝা পর্যন্ত কিছু বলতে চায় না। কিন্তু যতই দিন যায়, ততই দেখা যেতে লাগল একটা অদৃশ্য প্রাচীর উঠে আসছে ছেলে আর বাবা-মা'র মধ্যে। কার

ওয়েন সম্পর্কে ছাইপাঁশগুলো ঘরে আনার জন্যেই নাকি এই অনাসৃষ্টি —বলেছিলেন চার্লসের মা। মায়ের মন তো, অমঙ্গলের আশংকায় সদা অধীর।

অক্টোবর আসতেই ফের লাইব্রেরীতে যাওয়া আরম্ভ করল চার্লস। আগের মত পুরাতত্ত্ব নিয়ে নয়। এবার ওকে পেয়ে বসেছিল নতুন নেশা—ডাকিনীতন্ত্র, ইন্দ্রজালবিদ্যা, পিশাচবিদ্যা, গুপ্তবিদ্যা। প্রভিডেন্সের লাইব্রেরীতে যখন এ ধরনের বই আর পাওয়া গেল না—ট্রেনে চেপে গেল বোস্টনে। সেখানকার নামকরা লাইব্রেরীগুলোয় বই মুখে করে বসে রইল দিনের পর দিন। বাইবেলের বিষয় নিয়ে লেখা অনেক দুষ্প্রাপ্য বই ছিল সেখানে। আসবার সময়ে কিনে আনল এন্তার বই। পড়বার ঘরে দেওয়ালে লাগালো নতুন তাক। অলৌকিক বিষয় নিয়ে লেখা থরে থরে বই সাজানো রইল নতুন তাকগুলোয়। বড় দিনের ছুটিতে বেড়াতে গেল শহরের বাইরে। অনেক জায়গায় গিয়েছিল। তার মধ্যে একটা হল সালেম শহরের এসেক্স ইন্সটিটিউট।

১৯২০ সালের জানুয়ারীর মাঝামাঝি থেকে চার্লসের সর্ব অবয়ব ঘিরে যেন যুদ্ধজয়ের আনন্দ বিচ্ছুরিত হতে লাগল। এত ফুর্তি কিসের, কাউকে সে বলল না। তবে হাচিনসন সাংকেতিক লিপি নিয়ে আর মাথা ঘামায়নি। তার বদলে শুরু হল নতুন দুটো পাগলামি। কেমিক্যাল এক্সপেরিমেণ্ট আর পুরোনো নথিপত্র ঘাঁটা। নানা জায়গা থেকে রসায়নদ্রব্য কিনে এনে এনে বাড়ীর চিলকোঠায় ছোট্ট ঘরে শুরু হল রসায়ন পরীক্ষা নিরীক্ষা। সেই সঙ্গে দিবরাত্র টো-টো করে ঘুরত শহরের আনাচে-কানাচে পুরনো ঘিঞ্জি এলাকায়। কিনত বাতিল হয়ে যাওয়া অদ্ভুত যন্ত্রপাতি, কেমিক্যাল অ্যাপারেটাস। হঠাৎ এ-সব নিয়ে তার মাথার পোকা নড়ল কেন, তা আর কেউ না বুঝলেও লাইব্রেরী আর সিটি হলের কেরানীরা আঁচ করেছিল। চার্লস খুঁজছে তার অতি-বৃদ্ধ-প্রমাতামহ জোসেফ কারওয়েনের কবরের ঠিকানা—যে কবরের ওপরকার শ্লেট পাথরের ফলক থেকে কারওয়েনের নাম চেঁচে তুলে দিয়েছে তারই আর এক পূর্বপুরুষ।

একটু একটু করে ওয়ার্ড পরিবার বুঝলেন, চার্লস আর আগের মত নেই। কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে। ছেলে তাঁদের চিরকালই ছিটগ্রস্ত। কিন্তু লুকোছাপা জিনিসটা তার চরিত্রে কস্মিনকালেও ছিল না। স্কুলে যাওয়াটা একটা বিষম বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরীক্ষার ফল যদিও খারাপ হয়নি—কিন্তু পড়াশুনায় তার তেমন গা ছিল

না। বেশীর ভাগ সময় কাটত চিলেকোঠার ল্যাবোরেটরীতে। অদ্ভুত যত অপরসায়ন বিদ্যার পুঁথিপত্র মুখে করে বসে থাকত গভীর রাত পর্যন্ত। সে সব বই আজকাল আর কেউ পড়ে না। নয়তো শহরের বাইরে গিয়ে কারখানায় পুরনো ইতিহাস ঘাঁটত। দিনের বেলাতেও বসে থাকত পড়ার ঘরে। সামনে খোলা থাকত গুপ্ত বিদ্যার বই—দেওয়ালের প্রতিকৃতির চোখদুটি যেন অনিমেষে চেয়ে থাকত তার পানে। চার্লসের মুখখানাও যেন দিনে দিনে আরো বেশী ছবির মুখের মত হয়ে যাচ্ছিল—আশ্চর্য এই ব্যাপার লক্ষ্য করেছে অনেকেই।

মার্চের শেষে চার্লসের নতুন বাতিক দেখা দিল। বড় উৎকট, বড় বিকট সেই বাতিক। বিভিন্ন কবর থেকে টুকিটাকি জিনিসপত্র এনে জড়ো করতে লাগল ঘরের মধ্যে। নতুন কবর ছুঁতো না—যত আগ্রহ প্রাচীন কবর নিয়ে। কারণটা কেউ আঁচ করতে না পারলেও সিটি হলের কেরাণীরা পেরেছিল। জোসেফ কারওয়েনের কবর খোঁড়া ছেড়ে দিয়ে চার্লস নাকি হঠাৎ নাপথালি ফিল্ডের কবর নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছে। কারণ সিটি হলে কবরখানা সংক্রান্ত ফাইলে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কিভাবে জানি নষ্ট করা হয় নি দেড়শ বছর আগে। সেখানে লেখা আছে, 'অদ্ভুত গড়নের একটা সিসের কফিনকে কবরস্থ করা হয়েছে নাপথালি ফিল্ডের কবরখানায় দশ ফুট দক্ষিণে এবং পাঁচ ফুট পশ্চিমে। সাল—'। নাপথালি ফিল্ডের কবরখানা বিশেষ একটা জায়গায় সীমিত না থাকায় সিসের কফিন খুঁজে বার করতে গিয়ে কালঘাম ছুটে যাচ্ছে চার্লসের। সে খুঁজছে এমন একটা কবর যার মাথার শ্লেটপাথরে লেখা নামটা চেঁচে ফেলা হয়েছে।

৪

মে মাসে চার্লসের বাবা-মা'র অনুরোধে ডক্টর উইলেট চার্লসের সঙ্গে কথা বলতে এলেন। কারওয়েন সম্পর্কে সব খবর নিয়েই তিনি এসেছিলেন। কিন্তু লাভ কিছু হল না। কেন না, কথা বলে তিনি বুঝলেন চার্লসের জ্ঞান টনটনে। প্রত্যেকটা কথা ভেবেচিন্তে বলছে—প্রলাপ নয়। যা নিয়ে সে উন্মাদের মত খাটছে এবং বাপ-মা'কে এত ভাবিয়ে তুলেছে, সে প্রসঙ্গেও অনেক কথা সে বলল। কিন্তু গবেষণার উদ্দেশ্যটি গোপন করে গেল। শুধু বললে, তার পূর্বপুরুষ এমন অনেক জ্ঞানলাভ করে-

ছিলেন—এ যুগে যা ভাবাও যায় না। তাঁর সেই মহাবিদ্যা যাতে হারিয়ে না যায়—সেই চেষ্টাই করছে চার্লস। তবে সেই মহাজ্ঞানকে বুঝতে হলে যিনি এর আবিষ্কারক—তাঁকে জানা দরকার—নইলে বর্তমান সমাজ মানতে চাইবে না। কারওয়েন সম্পর্কে যাবতীয় খবরাখবর সংগ্রহ না করা পর্যন্ত বিস্মৃত এবং প্রায়-লুপ্ত সেই মহাবিদ্যাকে পুনরাবিষ্কার করা যাবে না এবং যেদিন তা সম্ভব হবে, সেদিন মানুষের সব ধ্যানধারণা উল্টোপাল্টা হয়ে যাবে। স্বয়ং আইনস্টাইনও ভাবনার জগতে যে বিপ্লব আনতে পারেন নি—জোসেফ কারওয়েনের মহাজ্ঞান সেই বিপ্লব আনবে।

গোরস্থানে যাতায়াত সম্পর্কে চার্লস খোলাখুলি বললে, সে যাচ্ছে কারওয়েনের কবর আবিষ্কার করতে। কেন না, তার বিশ্বাস শ্লেটপাথরের ওপর থেকে কারওয়েনের নাম তুলে দিলেও কয়েকটা গূঢ় চিহ্ন থেকে গিয়েছে। অতীন্দ্রিয় বিদ্যার এই চিহ্নগুলি কারওয়েনের শেষ ইচ্ছানুসারেই শ্লেটপাথরে খোদাই করা হয়েছিল। কিন্তু যারা নাম চেঁচেছে—চিহ্নর মানে বোঝেনি বলে নিশ্চয় রেখে গিয়েছে। সেই চিহ্নগুলো পেলেই সাংকেতিক হরফে লেখা কারওয়েনের পাণ্ডুলিপির রহস্য পরিষ্কার হয়ে যাবে। কারওয়েন বড় সাবধানী লোক ছিলেন। মহা আবিষ্কারকে গুপ্ত রেখেছিলেন নানারকম সংকেতের আড়ালে। তারই কিছুটা রয়ে গিয়েছে কবরের ওপরে।

ডক্টর উইলেট গূঢ়তত্ত্ব সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপি দেখতে চাইলেন। কিন্তু চার্লস তার বদলে বার করল হাচিনসনের পাণ্ডুলিপির ফটোস্ট্যাট কপি। তারপরে অবশ্য কারওয়েনের খাতার মলাট দেখিয়েছিল। সন্তর্পণে পাতা খুলে দু'একটা হরফও দেখিয়েছিল। ডাইরী খুলে চিহ্ন দিয়ে রাখা বিশেষ একটা জায়গায় চোখ বুলোতে দিয়েছিল ডাক্তারকে। মাকড়শার জালের মত সূক্ষ্ম জড়ানো হস্তলিপি দেখেই উনি বুঝেছিলেন—লেখাটা সপ্তদশ শতাব্দীর। অথচ লেখক ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষ।

ডাইরীর ঐ পাতায় যা লেখা ছিল, তা অকিঞ্চিৎকর। লেখাটা এই ঃ '১৭৫৪ সালের ১৬ই অক্টোবর। জাহাজে লণ্ডন ছেড়ে বেরিয়েছে। কুড়িজন লোক তুলেছি জাহাজে। ইণ্ডিজ থেকে, স্পেন থেকে, হল্যাণ্ড থেকে। ওলন্দাজগুলো পালাবে মনে হচ্ছে। আমার উদ্দেশ্য যে শুভ নয়—ওরা আঁচ করেছে। নাইট ডেক্সটার, গ্রীন, পেরিগো আর নাইটিংগেলের জন্যেও অনেক জন্তুজানোয়ার নিয়েছি। কাল রাত্রে

তিনবার স্তব করলাম—কেউ আবির্ভূত হল না। মিঃ এইচ এই কয়েকশ বছরে যা পেয়েছে—এখনো আমাকে দেয়নি। সাইমন পাঁচ হপ্তা হল চিঠি লিখছে না।

এই পর্যন্ত পড়েই পাতা ওলটাতে না ওলটাতে চার্লস ডাইরীটা ছিনিয়ে নিয়েছিল হাত থেকে। কিন্তু অদ্ভুত ভাবে ডাইরীর প্রথম কয়েকটা লাইন ছাপ ফেলে গিয়েছিল ডাক্তারের মনে।

লাইনগুলো হল ঃ

"লাইবার ড্যামনেটাসের স্তোত্র পাঠ করলাম পঞ্চম রুডমাস আর চতুর্থ হ্যালোর আগের রাতে, চক্রের বাইরে জিনিসটা রূপ নিচ্ছে। ফলে, অতীত থেকে যে ফিরতে চায়—'সে' তাকে ফিরিয়ে আনবে। তবে জান্তব-চূর্ণটা তৈরী থাকা চাই।"

এর বেশী আর দেখা যায়নি। কিন্তু ঐ ক'টা লাইনই গায়ের লোম খাড়া করে ছেড়েছিল ডাক্তারের। সেইসঙ্গে মনটা ছাঁৎ করে উঠেছিল জোসেফ কারওয়েনের ছবির দিকে চোখ পড়ায়। ক্ষণেকের জন্যে মনে হয়েছিল ছবির মানুষটা যেন বিরক্ত হয়েছেন—ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে আছেন। পরে অনেক বার এই নিয়ে ভেবেছেন ডাক্তার। ডাক্তারী মন মানতে না চাইলেও অলীক কল্পনাটা বার বার ফিরে এসেছে মনের মধ্যে। ওঁর মনে হয়েছে, জোসেফ কারওয়েনের ছবির চোখদুটো যেন জীবন্ত এবং সে-চোখ নিবদ্ধ চার্লসের ওপর। চার্লসকে যেন চোখে চোখে রেখেছে রঙ দিয়ে আঁকা আশ্চর্য জীবন্ত সেই চোখ। চার্লস যেখানে গেছে, ঘরের এদিক থেকে ওদিকে পায়চারী করেছে—চোখদুটোও ঘুরেছে চার্লসের পেছন পেছন।

ঘর থেকে তাই বেরিয়ে আসার আগে ছবির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ডাক্তার। খুঁটিয়ে দেখেছিলেন এবং চমৎকৃত হয়েছিলেন ঃ মাঝখানে দেড়শ বছরের ব্যবধান আছে বলে মনেই হয় না। একই মুখ, একই চাহনি—তফাৎ শুধু ডান ভুরুর ওপরে কাটা দাগটা।

চার্লসের উদ্বিগ্ন বাবা-মাকে ডাক্তার বলে গেলেন, ভয়ের কোনো কারণ নেই। চার্লস সম্পূর্ণ সুস্থ। বরং তার কাজে বাধা না দেওয়া হলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করে সে বংশের মুখোজ্জ্বলও করতে পারে।

শুনে স্বস্তির নিঃশ্বেস ফেললেন মিস্টার আর মিসেস ওয়ার্ড। চার্লস যা করছে করুক—তা নিয়ে মাথা ঘামানো ছেড়ে দিলেন। প্রশ্রয়

পেয়ে চার্লস জন মাস নাগাদ বললে, কলেজে আর ভর্তি হবে না—যাবে আমেরিকার বাইরে। যে কাজে হাত দিয়েছে—সেই, ব্যাপারেই আরও পড়াশুনার দরকার। আমেরিকায় অত বই নেই।

হতভম্ব হয়ে গেলেন বাবা এবং মা। আঠারো বছরের ছেলের মুখে এত চ্যাটাং চ্যাটাং কথা তাঁরা আশা করেননি। তাই দুটো বায়নার একটা মঞ্জুর করলেন। অর্থাৎ কলেজে না পড়ুক, আপত্তি নেই। বিদেশ যাওয়া চলবে না।

ফলে, কলেজ-টলেজ ছেড়ে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড তিন-তিনটে বছর স্রেফ বাড়ী বসে গুপ্ত বিদ্যার অধ্যয়ন করে গেল। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সবার সঙ্গ ত্যাগ করল। মাঝে মাঝে যেত শহরের বাইরে দিনকয়েকের জন্যে দুষ্প্রাপ্য নথিপত্রের সন্ধানে। একবার গেল দক্ষিণ অঞ্চলে অদ্ভুত চরিত্রের এক মুলাটোর সঙ্গে দেখা করতে। লোকটা থাকে এক বিজন জলার মধ্যে এবং দৈনিক কাগজে এককালে তাকে নিয়ে চাঞ্চল্যকর একটা নিবন্ধও লেখা হয়েছিল। আরেকবার গেল নিউইয়র্কের উত্তর পূর্বে অ্যাডারিনডাক অঞ্চলের একটা পাহাড়ি গাঁয়ে। জায়গাটা নাকি অনেক নিষিদ্ধ অনুষ্ঠানের গোপন ঘাঁটি। এত কাণ্ডের পরেও ইউরোপ যাওয়ার অনুমতি পেল না চার্লস বাবা-মা'র কাছে।

১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে সাবালক হওয়ার পর চার্লসকে আর আটকানো গেল না। ঠিক তখনি দাদামশায়ের কাছ থেকে বেশ কিছু টাকাকড়িও হাতে এসে গেল। চার্লস জেদ ধরল—ইউরোপ সে যাবেই।

নিরুপায় বাবা-মা রাজী হলেন। বোস্টন পর্যন্ত ছেলেকে এগিয়ে দিলেন। ইউরোপে কোথায় যাবে—তা চেপে গেল চার্লস। কিন্তু লণ্ডন শহরে পৌঁছে চিঠি লিখে জানালে, যে বাড়ীতে সে উঠেছে, সেখানে একখানা ঘরে ছোট্ট একটা গবেষণাগার বানিয়ে নিয়ে ক্রমাগত এক্সপেরিমেণ্ট করে চলেছে। দিনের বেলায় বৃটিশ মিউজিয়ামের বইগুলো একে একে শেষ করে চলেছে। বন্ধুবান্ধব একদম বর্জন করেছে। এর বেশী আর একটি কথাও লিখল না। অতি পুরাতন লণ্ডন শহরের ঘিঞ্জি গলি-ঘুঁজিতে অলৌকিক রহস্যের সন্ধানে ঘুরছে কিনা—সে সম্পর্কে কিছু না লেখায় খুশী হলেন বাবা-মা। ভাবলেন, যাক, নতুন পরিবেশে ছেলেটার মতিগতি ফিরেছে।

১৯২৪ সালের জুন মাসে ছোট্ট একটা চিঠিতে চার্লস জানাল, সে প্যারিস যাচ্ছে। এর আগেও দুবার গিয়েছিল সেখানকার একটা লাই-

রেরীতে। এবার যাচ্ছে মাস তিনেকের জন্যে। এই তিন মাস খবর এল কেবল পোস্টকার্ড মারফৎ। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিশে বাজে সময় নষ্ট করা ছেড়ে দিয়েছে। এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে অনেক পাণ্ডুলিপির সন্ধান পেয়েছে। তারপর বেশ কিছুদিন কোনো চিঠি নেই। অক্টোবরে ছবিওলা একটা কার্ড এল চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাহা থেকে। এখানে সে এসেছে প্রাচীন বটবৃক্ষের মত এক বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলতে। ইনি নাকি মধ্যযুগীয় অনেক বিচিত্র তথ্যের সন্ধান রাখেন। জানুয়ারী মাসে চিঠি এল ভিয়েনা থেকে। চার্লস চলেছে আরও পূবে গুপ্ত বিদ্যায় সুপণ্ডিত কয়েক ব্যক্তির আমন্ত্রণে।

পরের চিঠিটা এল টানসিলভানিয়া থেকে। চার্লস যাঁর কাছে যাচ্ছে, তাঁর নাম ব্যারন ফেরেঙ্কজি। রাকুসের দক্ষিণে পাহাড়ে ঘেরা উপত্যকায় তাঁর জমিদারী। এখন থেকে চালর্সের চিঠিপত্র ব্যারনের ঠিকানায় দিতে হবে। এক সপ্তাহ পরে আরেকখানা চিঠি লিখে চার্লস জানাল, ব্যারনের গাড়ী তাকে রাকুস থেকে নিতে এসেছে। এখন চলেছে পাহাড়ের মধ্যে।

এরপর বেশ কিছুদিন আর কোনো চিঠি না পেয়ে চার্লসের বাবা-মা লিখলেন তাঁরা ইউরোপ বেড়াতে যাবেন ভাবছেন। ব্যারন ফেরেঙ্কজির প্রাসাদেই দেখা করবেন চার্লসের সঙ্গে। ঝটিতি চিঠি লিখে নিষেধ করল চার্লস। লিখল, জায়গাটা জঙ্গলের ধারে, পাহাড়ের মধ্যে। পাণ্ডববর্জিত। কেউ আসে না—আসতে চায় না। গাঁয়ের লোক যদি শোনে ওঁরা এখানে আসতে চান—অনেক খারাপ ব্যাপার ভাবতে পারে। তাছাড়া ব্যারন অতিথি আপ্যায়ন মোটে জানেন না। কথাবার্তাও অশিষ্ট। বয়সে থুত্থুরে। এত বেশী বয়স যে খটকা লাগতে পারে। অনেকরকম উটকো বাতিকও আছে তাঁর। এরকম একটা ছমছমে পরিবেশে ওঁদের আসার কোনো দরকার নেই। চার্লসই গিয়ে দেখা করবে প্রভিডেন্সে—শীগগিরই।

১৯২৫ সালের মে মাসে বাড়ী ফিরল চার্লস—দীর্ঘ চার বছর বাড়ী ছাড়া থাকার পর। তখন গোধূলির রাঙা আলো প্রভিডেন্সের গির্জে, গম্বুজ, সৌধ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। ক্ষেত, প্রান্তর, পাহাড় অপরূপ সুষমায় আবীর রাঙা হয়ে উঠেছে। দীর্ঘ চার বছর পরে এই শহরেই লুপ্ত এক অতীত রহস্যকে জাগ্রত করার মন্ত্র শিখে গৃহে ফিরল চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড।

কিছু উন্মাদ-বিশেষজ্ঞর মতে চার্লসের প্রকৃত উন্মত্ততার শুরু নাকি ইউরোপ পর্যটনের পর থেকেই। বিদেশ পাড়ি দেওয়ার সময়ে তাকে সুস্থই দেখা গিয়েছিল—ফিরে আসার পর দেখা গেল যত কিছু উদ্ভট লক্ষণ। অথচ বাবা-মা'র সঙ্গে কথা বলার সময়ে চার্লস বয়স্ক বিচক্ষণ ব্যক্তির মত কথা বলেছে—অর্বাচীন প্রগলভতার লেশমাত্র লক্ষণ দেখা যায় নি—অসংলগ্নতার ছায়াও লক্ষ্য করা যায় নি। বিদেশ সফরের পর চার্লস বাহ্যতঃ আর আগের মত ছিল না ঠিকই—বয়সের ছাপ পড়েছিল চোখে মুখে—শরীরটাও পাকিয়ে শক্ত হয়েছিল। কিন্তু যা নিয়ে বাড়ী শুদ্ধ লোকের ঘুম উড়ে গেল, তা হল কতকগুলো বিদঘুটে শব্দ।

শব্দের উৎস ছাদের চিলেকোঠা। উচ্চকণ্ঠের দুর্বোধ্য মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ ভেসে আসত। একই মন্ত্র ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা ছন্দে উচ্চারিত হত। অজ্ঞাত ভাষায় স্তোত্রপাঠ হত—শ্লোকের পর শ্লোক আউড়ে যাওয়া হত জোর গলায়। কণ্ঠস্বর একজনেরই—চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ডের। কিন্তু দ্রিমি দ্রিমি নিনাদিত কণ্ঠস্বরেরর মধ্যে একটা অব্যাখ্যাত ভয়াবহতা ছিল—মন্ত্রোচ্চারণ এবং ফরমুলা পাঠের সময়ে গলার স্বর এমন পালটে যেত যে বাড়ীর কালো বিড়ালের পিঠখানা তেউড়ে যেত ধনুকের মত—খাড়া হয়ে যেত রোঁয়া। আর গায়ে কাঁটা দিত বাড়ী শুদ্ধ লোকের।

সেই সঙ্গে বাড়ীময় ছড়িয়ে পড়ত বিবিধ গন্ধ। অদ্ভুত বিচিত্র সেই গন্ধরাজির বর্ণনা নাকি ভাষায় দেওয়া যায় না। কখনো তা নিরতিশয় উৎকট—বিবমিষা জাগানো। অন্নপ্রাশনের ভাত পর্যন্ত যেন উঠে আসতে চায়। আবার কখনো হাল্কা সৌরভ—জগতের সেরা সুগন্ধগুলো একত্র করলেও নাকি তার সমান হয় না। সে গন্ধ কেবল মনমাতানো নয়—দৃশ্য জাগানো। নাকে গেলেই চোখের সামনে যেন ভেসে ওঠে মায়া মরীচিকার মত দৃশ্যের পর দৃশ্য; কখনো বিস্তীর্ণ প্রান্তর, কখনো দুস্তর পর্বত, কখনো গহন বনানী। আবার কখনো গন্ধবিকটের গন্ধ নাকে গেলেই চকিতের জন্যে মনের চোখে দেখা যেত স্ফিংক্সের কিম্ভূত মূর্তি। হিপোগ্রিফের অলীক অসম্ভব মূর্তি। গন্ধ যারা শুঁকেছে, চকিত এই অভিজ্ঞতা নাকি প্রত্যেকেরই হয়েছে।

চার্লস কিন্তু চার বছর আগেকার খেয়াল খুশী নিয়ে আর নিজেকে ব্যস্ত রাখেনি। বিদেশ থেকে আনা ইয়া মোটা কেতাব নিয়ে পড়াশুনা করত। বইগুলো নাকি সত্যই অদ্ভুত। দেখলে গা শিরশির করে

চার্লস অবশ্য বলত, এই বইয়ের দৌলতে আর ইউরোপ সফরের ফলে আরব্ধ কাজ অনেক এগিয়ে এসেছে। মহা আবিষ্কারের আর দেরী নেই।

এই সময়ে ডক্টর উইলেট এসে চার্লসের সঙ্গে কথা বলে কোনো বৈলক্ষণ দেখতে পেতেন না। তবে শত কথা দিয়েও চার্লসের মনস্তত্ত্ব তিনি আঁচ করতে পারতেন না। টেবিলের ওপর দেখতেন মোমের অদ্ভুত কিম্ভূত মূর্তি। মেঝের ওপর খড়ি বা কাঠকয়লা দিয়ে আঁকা আধমোছা চক্র, ত্রিভুজ বা পঞ্চভুজ। চার্লসের মুখটি নিরীক্ষণ করে আরো অবাক হতেন। কারওয়েনের মুখের সঙ্গে যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে চার্লসের মুখের মিল। কারওয়েনের ডান ভুরুর কাটা দাগটাই যা তফাৎ—বাদবাকী সব এক। দেড়শ বছর আগেকার মানুষটার সঙ্গে তফাৎ শুধু ভুরুর ঐ কাটা দাগে।

ডাক্তারকে আসতে হল চার্লসের বাবা-মা'র নির্বন্ধে। চার্লস মনে মনে তাঁর আসা বরদাস্ত করলেও মুখে কখনো তা প্রকাশ করেনি। তবে তিনি পেছন ফেরার পর মনে হত যেন রহস্যময় ছোকরাটা নির্নিমেষে তাঁর পানেই চেয়ে আছে। রাত হলেই আবার শোনা যেত স্তোত্র পাঠের গমগমে গলা, বজ্রকণ্ঠে স্তব পাঠের রোমাঞ্চ। তীক্ষ্ন বিকট স্বরে মন্ত্রোচ্চারণ। শুনতে শুনতে বাড়ীর চাকরগুলো পর্যন্ত কানাঘুসো আরম্ভ করে দিলে—চার্লসের মাথা এতদিনে সত্যিই বিগড়েছে।

১৯২৭ সালের জানুয়ারীতে ঘটল একটা আশ্চর্য ঘটনা। একদিন গভীর রাতে বাড়ীর প্রত্যেকেই চমকে চমকে উঠেছে চার্লসের মাদল-কণ্ঠের মন্ত্রোচ্চারণে, এমন সময়ে আচমকা একটা কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা উপসাগরের দিক থেকে আছড়ে পড়ল বাড়ীর ওপর। খটাখট শব্দে নড়ে উঠল দরজাজানলা—সেইসঙ্গে দুলে উঠল পায়ের তলার মাটি। ভূমিকম্পটা ক্ষীণ হলেও এত স্পষ্ট যে পাড়াপ্রতিবেশী প্রত্যেকেই টের পেয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিষম ভয়ে কুঁকড়ে গেল বাড়ীর কালো বেড়াল—মাইলখানেকের মধ্যে যত কুকুর ছিল, তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল একই সঙ্গে।

এই গেল ভূমিকা। পরক্ষণেই আচম্বিতে যেন মাথার ওপর ভেঙ্গে পড়ল বজ্রসহ দামাল ঝড়। অথচ বছরের এই সময়ে ঝড় কখনো ওঠে না। মুহূর্তের মধ্যে কড়্ কড়্ কড়াৎ করে কানফাটানো শব্দে বাজ পড়ল বাড়ীর মাথায়।

দৌড়োতে দৌড়োতে চার্লসের বাবা-মা ওপরে উঠে এলেন। কিন্তু দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল চার্লসকে। মুখ তার ফ্যাকাশে—কিন্তু অনমনীয় দৃঢ়তায় কঠিন। বিজয়োল্লাস এবং সুকঠিন সংকল্প একই সাথে মূর্ত চোখের তারায়। বাবা-মা'কে বলল, ভয় নেই। সত্যিই বাজ পড়েনি। ঝড় এখুনি চলে যাবে।

জানলা দিয়ে ও'রা তাকিয়ে দেখলেন, সত্যিই বিদ্যুৎচমক সরে যাচ্ছে দূর হতে দূরে, অদ্ভুত কনকনে ঝড়ে নুয়ে পড়া গাছগুলোও ফের সিধে হয়ে দাঁড়িয়েছে। চাপা খলখলে হাসির মত বাজের আওয়াজ এক সময়ে গেল মিলিয়ে। বেরিয়ে এল তারার দল। চার্লসের চোখমুখের সেই বিজয়ের অভিব্যক্তিও ক্রিস্টালের মত দানা বেঁধে কঠিন হয়ে উঠল মুখের পরতে পরতে।

এর পরের দুমাসে পরিবর্তন ঘটল চার্লসের দৈনন্দিন রুটিনে। আগের মত দিবারাত্র ঘরে বন্দী না থেকে বাইরে বেরিয়ে খোঁজখবর নিত আবহাওয়ার, জিজ্ঞেস করত কবে, কিভাবে আসবে বসন্ত। মার্চ মাসে একদিন গভীর রাতে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে। ফিরল ভোর রাতে। মায়ের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল মোটরের আওয়াজে। চাপা গলায় কারা কথা বলছে শোনবার জন্যে জানলায় গিয়ে দেখলেন চারটে কালো মূর্তি একটা লম্বা ভারী বাক্স নামাচ্ছে লরী থেকে। তদারক করছে চার্লস। পাশের দরজা দিয়ে বেজায় ভারী বাক্সটাকে বাড়ীতে ঢুকিয়ে অতিকষ্টে নিয়ে যাওয়া হল চিলেকোঠায়। ধপ করে বাক্স নামিয়ে রাখার শব্দ শোনা গেল। লোক চারটে বেরিয়ে এসে চলে গেল লরী নিয়ে।

তার পর থেকেই চিলে কোঠার দরজা বন্ধ করে কি যেন খুটখাট করতে লাগল চার্লস। চাকরে খাবার নিয়ে গেল—দরজা খুলল না। আওয়াজ শুনে মনে হল যেন ধাতু নিয়ে ঠোকাঠুকি করছে। দুপুর নাগাদ একটা পচা গন্ধ ছড়িয়ে গেল বাড়ীময়—সেই সঙ্গে শোনা গেল একটা ভয়ংকর ভয়ার্ত চীৎকার—পরক্ষণেই দড়াম করে পড়ে যাওয়ার শব্দ। মা দৌড়ে গেলেন ওপরে। অনেকক্ষণ দরজা ধাক্কা দেওয়ার পর ক্ষীণকণ্ঠে সাড়া দিল ছেলে। কিন্তু দরজা খুলল না। বললে, সে ভাল আছে—গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি। বদ্ গন্ধটা যতই কুৎসিত হোক না কেন—চলে যাচ্ছে। গন্ধটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না ঠিকই, কিন্তু ক্ষতিকারক নয়—দরকারও বটে। এখন তাকে একা থাকতে না দিলেই বরং ক্ষতিই হতে

পারে। একটু পরেই রাতের খাওয়া খেতে সে নামবে'খন। আপাততঃ যেন গোলমাল করা না হয়।

বিকেলের দিকে ঘর থেকে অদ্ভুত কতকগুলো হিস্ হিস্ শব্দ শোনা গেল। তারও কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এল চার্লস। দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত—কেমন জানি ছন্নছাড়া চেহারা। বাইরে বেরিয়েই দরজায় তালা দিয়ে দিল। কাউকে উঁকি মারতে দিল না। এই দিন থেকে নতুন করে শুরু হল নিজেকে এবং নিজের কাজকর্ম গোপন রাখার পালা। চিলেকোঠার ঘরে প্রবেশ নিষেধ হয়ে গেল প্রত্যেকের। সেই ঘরের পাশে একটা গুদামঘর থেকে মালপত্র বার করে শোবার জায়গা করে নিলে সেখানে। পড়ার ঘর থেকে বইপত্র তুলে নিয়ে গেল চিলেকোঠায় এবং দরজা বন্ধ করে উদ্ভট যত কাণ্ডকারখানা চালিয়ে গেল সেখানে। পটুক্সেট খামারবাড়ী কিনে বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেণ্টের যাবতীয় সরঞ্জামসহ চলে না যাওয়া পর্যন্ত চার্লস চিলে-কোঠা ছেড়ে আর নড়েনি।

সন্ধ্যেবেলা নীচে নামল চার্লস। বাবা-মা'র সামনে থেকে নিয়ে গেল সেদিনকার দৈনিক। তারপর নাকি হাত ফস্কে কাগজের খানিকটা মোমবাতির আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছিল। ডক্টর উইলেট এই পুড়ে যাওয়া অংশটা পরে কাগজের অফিসে গিয়ে তাদের ফাইল কপিতে পড়েছিলেন। একটা ছোট্ট খবর ছাপা হয়েছিল কাগজের সেই অংশে। খবরটা এই:

কবরখানায় কবরচোরের নৈশ অভিযান

কবরখানার রাতের পাহারাদার রবার্ট হার্ট আজ ভোর রাতে দেখতে পায় কবরখানার সবচেয়ে পুরোনো আর পরিত্যক্ত অঞ্চলে খানিকটা মাটি খোঁড়া হয়েছে। পাশে একটা মোটর লরীও সে দেখেছিল। তবে চোরের দল ওকে দেখেই পালিয়েছে—মনে হয় কিছু নিয়ে যেতে পারেনি।

ঘটনাটা ঘটে ভোর চারটের সময়ে। বাইরে মোটর ইঞ্জিনের আওয়াজে খটকা লাগে রবার্ট হার্টের। বেরিয়ে এসেই দেখতে পায় দূরে দাঁড়িয়ে একটা লরী। নুড়ির ওপর ওর পায়ের খচ্‌মচ্ শব্দে চোরের দল ঝটিতি একটা মস্ত বাক্স লরীতে চাপিয়ে জোরে লরী চালিয়ে লম্বা দেয়। তাই রবার্ট হার্ট তাদের হাতেনাতে ধরতে পারেনি। লরীর ধারেকাছে কবর খোঁড়াখুঁড়ির চিহ্ন না পেয়ে বোঝা যায়, চোরেরা এসেছিল কফিনটা মাটিতে পুঁততে—তাড়া খেয়ে পালিয়েছে।

তবে কবরচোরেরা যে অনেকদিন ধরেই গোরস্থানে যাতায়াত করেছিল,

সে প্রমাণ পাওয়া গেল রাস্তা থেকে অনেক দূরে অ্যামোসা মাঠের মধ্যে একটা মস্ত গর্ত দেখে। জায়গাটা পরিত্যক্ত। স্মৃতিফলকের পাথরগুলো পর্যন্ত চোরেরা নিয়ে গেছে। সেইখানে প্রায় কবর আকারের প্রকাণ্ড একটা গর্ত খোঁড়া হয়েছে। —ভেতরে কিছু পাওয়া যায়নি। গর্তটা কারো কবরও নয়—কেন না গোরস্থানের পুরোনো খাতায় ঐ জায়গায় কাউকে কবরস্থ করার উল্লেখ নেই।

সেই কারণেই পুলিশের সন্দেহ, মদের চোরাচালানীরা ঐ গর্তে এতদিন মদের বাক্স লুকিয়ে রেখেছিল। এতদিন ধরা পড়েনি কেউ ওদিকে যায় না বলে। লরীটাকে শহরের দিকে যেতে দেখা গেছে।

এই ঘটনার পরের ক'টা দিন ঘর থেকে বেরোনো ছেড়ে দিল চার্লস। চিলেকোঠার লাগোয়া ঘরেই শোবার বন্দোবস্ত করে নিয়েছিল বলে খাবার পর্যন্ত চেয়ে পাঠাত সেই ঘরে—চাকররা খাবার দোরগোড়ায় নামিয়ে নীচে নেমে না গেলে দরজা খুলত না। একঘেয়ে সুরে দুর্বোধ্য মন্ত্রোচ্চারণের বিরতি ছিল না। মন্ত্র বন্ধ হলে শুরু হত দুর্বোধ্য স্তোত্রপাঠ। মাঝে মাঝে কানে ভেসে আসত কাঁচে কাঁচে ঠোকাঠুকির ঠুন ঠুন শব্দ, কেমিক্যালের হিস্ হিস্ আওয়াজ, অগ্নিশিখার ফোঁসফোঁসানি আর জল পড়ার ছড়্ ছড়্ শব্দ। দরজার ফাঁক দিয়ে এমন একটা বাজে গন্ধ বেরিয়ে আসত যা এর আগে বাড়ীর কারো নাকে যায়নি। কদাচিৎ উৎকণ্ঠিত মুখে বাইরে আসত চার্লস। একবার তড়িঘড়ি দৌড়োলো অ্যাথনেয়ামে—বিশেষ একটা বই আনার জন্যে। আর একবার লোক পাঠালো বোস্টনে অতি দুষ্প্রাপ্য একটা পুঁথি আনবার জন্যে। উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে পড়লেন চার্লসের বাবা-মা।

৬

পনেরোই এপ্রিল ঘটল সম্পূর্ণ নতুন একটা ঘটনা—মাথার চুল খাড়া করে দেবার মত ঘটনা। সেদিন ছিল গুড ফ্রাইডে। ঠিক ঐ দিনেই এই রকম একটা লোমহর্ষক ঘটনা ঘটল কেন, তাই নিয়ে কানাকানি করেছিল বাড়ীর চাকররা। তবে তা নেহাৎই কাকতালীয় মনে করে পাত্তা দেননি চার্লসের বাস্তববাদী পিতৃদেব।

সকাল থেকেই যথারীতি গমগমে গলায় মন্ত্রপাঠ এবং শ্লোক আউড়ে

চলেছে চার্লস। সারা বাড়ী যেন কাঁপছে তার চড়া গলার চেঁচানিতে। সেইসঙ্গে কি যেন পুড়ছে ঘরের মধ্যে। বাড়ীময় ছড়িয়ে পড়েছে ধোঁয়া আর গন্ধ—সে গন্ধের অনুরূপ গন্ধ এর আগে কখনো নাকে আসেনি। বিশেষ একটা মন্ত্র বার বার আবৃত্তি করছে চার্লস। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শেষ হতে না হতেই নতুন করে একই রকম এক ঘেয়ে একটানা সুরে উচ্চারণ করছে চড়া কড়া গলায়। প্রত্যেকটি শব্দ এত সুস্পষ্ট ভাবে উচ্চারিত যে মিসেস ওয়ার্ডের শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। ডক্টর উইলেটকে লিখেও দিয়েছিলেন পরে। পড়েই শিরদাঁড়া শিরশির করে উঠেছিল ডাক্তারের। কেন না মন্ত্রটা প্রায় আরেকটা কুখ্যাত মন্ত্রের মত। 'এলিফাস লেভি' কেতাবে অদৃশ্য জগতকে আবাহনের যে গুপ্ত মন্ত্র সংরক্ষিত আছে—অনেকটা সেইরকম। সে মন্ত্র পাঠ করলেই নাকি অন্ধকারের বিভীষিকারা মূর্ত হয়।

ঘণ্টাদুয়েক চলল এই একঘেয়েমি। তারপরেই আচমকা একসঙ্গে ঘেউ ঘেউ করে উঠল পাড়ার সবকটা কুকুর। সে কী চীৎকার! পরের দিন খবরের কাগজেও অকস্মাৎ সারমেয়-গর্জনির রহস্য নিয়ে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল। ওয়ার্ড ভবনে অবশ্য তখন কুকুরের ডাক নিয়ে ভাববার মত মনের অবস্থা কারো ছিল না। কেন না, কুকুরগুলো যেন শলা করে একই মুহূর্তে রাস্তায় রাস্তায় বাড়ীতে বাড়ীতে ঘেউ ঘেউ করে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এবার যে গন্ধ বাড়ীময় ছড়িয়ে গিয়েছিল, তা আরেক ধরনের গন্ধ। বিচিত্র অদ্ভুত সেই গন্ধের তুলনা দেবার ক্ষমতা ও বাড়ীর কারো নেই। উগ্র উৎকট গন্ধটা তীব্র থেকে তীব্রতর হতেই সহসা একটা চোখ ধাঁধানো দীপ্তি দিনের আলোকেও যেন ম্লান করে দিয়েছিল। প্রচণ্ড সেই বিদ্যুৎঝলক নাকি রাত্রে দেখা গেলে চোখের তারায় নির্ঘাৎ ঘা হয়ে যেত—মাথার উপর সূর্য ছিল বলে রক্ষে। চোখ ঝলসে যায়নি। আলোটা ঝলসে ওঠার মুহূর্তেই যে বজ্রগর্ভ ভয়াল ভয়ংকর কণ্ঠস্বর যেন শূন্য হতে ছড়িয়ে পড়েছিল দিকে দিকে—তা ইহজীবনে ভোলবার নয়। একশটা মেঘগর্জন একত্র করলেও দ্রিমি দ্রিমি সেই কণ্ঠস্বরের সমান হয় না। সুগম্ভীর সেই গলার আওয়াজে আচমকা বজ্রপাতের তীক্ষ্নতা নেই, আছে বহু দূর থেকে ভেসে আসা গুরু গুরু মেঘ গর্জনের চাপা ভয়াবহতা। এ গলা আর যার হোক—চার্লসের নয়। বজ্রগর্ভ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হতেই প্রতিধ্বনির তরঙ্গে খট খট করে কেঁপে উঠেছিল বাড়ীর প্রতিটি দরজাজানলা—ঘেউ ঘেউ চীৎকার ছাপিয়ে আওয়াজ পেঁৗছেছিল পাশের দুখানা বাড়ীতেও।

চার্লসের মায়ের মনে হয়েছিল মূর্ছা যাবেন। ঘড়ঘড়ে গম্ভীর গুরু-গর্জনের মধ্যে নাকি এমন একটা পৈশাচিকতা ছিল—যা রক্ত পর্যন্ত জমিয়ে দেয়। ঠিক এই ধরনের গলার বর্ণনা বহুবার তিনি শুনেছেন চার্লসের মুখে। তখন সে সুস্থ ছিল। জোসেফ কারওয়েনের নিধনের রাত্রে, পুঞ্জীভূত অমানিশা যেন এমনি করাল কুটিল কণ্ঠে অজ্ঞাত কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করেছিল অভিশপ্ত পটুক্সেট খামারবাড়ীর ঊর্ধ্বে—বায়ুস্তরে। চার্লস শব্দগুলো তেমনিভাবে উচ্চারণ করে বাবা-মাকে শোনাত মজা করার জন্যে। শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল বলেই মায়ের ভুল হল না—লুপ্ত বিস্মৃত প্রাচীন কোন এক ভাষায় অলৌকিক সেই কণ্ঠ বলে উঠল ভারী গলায়—DIES MIES JESCHET BOENE DOESEF DOU-VEMA ENITEMAUS.

মেঘমন্দ্র কণ্ঠ নীরব হতে না হতেই ক্ষণেকের জন্যে ঢেকে গিয়েছিল দিনের আলো—অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল চারিদিক। পরক্ষণেই সরে গেল অন্ধকার, ফুটে উঠল আলো, সেইসঙ্গে আরম্ভ হল চার্লসের নতুন করে মন্ত্রোচ্চারণ। পাগলের মত চেঁচিয়ে কলজে ফাটিয়ে প্রতিটি পংক্তি উচ্চারণ করার শেষে 'ইয়াঃ!' শব্দটা শূন্যে নিক্ষেপ করছিল সে সমস্ত আকুতি দিয়ে। আবার ভেসে এসেছিল নতুন একটা গন্ধস্রোত—বাতাস পর্যন্ত যেন শিউরে উঠেছিল গন্ধবিকটের আগমনে। চার্লস কিন্তু ক্ষিপ্তের মত কানের পর্দা ফাটানো শব্দে চেঁচিয়ে গেছে এক নাগাড়ে—বিরাম নেই, বিরতি নেই—সব মন্ত্রের শেষে সেই আহুতি—'ইয়াঃ!'

ঠিক তারপরেই ভয়ংকর স্মৃতির ভাণ্ডার পূর্ণ করেই যেন বিলাপ ধ্বনির মত একটা আতীক্ষ্ন আর্ত চীৎকার কখনো ক্ষীণ কখনো তীব্র হতে হতে দমাস করে ফেটে পড়েছে পৈশাচিক নারকীয় অট্টহাসিতে। দানবিক খল্ খল্ হাসি টেনে টেনে কখনো ঘুৎকারের মত কখনো কাশির মত উঠেছে আর পড়েছে—উন্মত্ত তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়েছে।

মায়ের মন আর সইতে পারে নি। বিষম ভয়ে কাঠ হয়ে গেলেও সন্তানের অমঙ্গল আশংকায় ধেয়ে গিয়ে দরজায় ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়েছেন—কান্নার সুরে ছেলেকে ডেকেছেন—কিন্তু কেউ সাড়া দেয়নি—আচমকা আর একটা তীব্র চীৎকারে তাঁর নিজের কণ্ঠস্বরও ভয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। এবারের ভয়াল চীৎকারটা তাঁর ছেলেরই কণ্ঠনিঃসৃত—কিন্তু যেন কিছুক্ষণ আগেকার মেঘডাকা গলায় গলা মিলিয়ে একই ভয়াবহতায় তা ফেটে পড়েছিল চিলেকোঠার ছোট্ট ঘরে। বীভৎস সেই চীৎকার

তাঁরই পেটের ছেলের গলা থেকে বেরিয়েছে ভেবে তিনি এমনই শিউরে উঠেছিলেন যে আর সইতে পারেন নি। নার্ভ ফেল করেছিল। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন চাতালে।

মিস্টার ওয়ার্ড কাজ থেকে ফিরলেন ছটা বেজে যাওয়ার পর। স্ত্রী-কে নীচের তলায় না দেখে চাকর-বাকরদের জিজ্ঞেস করতে শুনলেন, আজ খুবই বাড়াবাড়ি হয়েছে ওপর তলায়। চাকরদেরও হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে ঐ চীৎকার শুনে। মা ঠাকুরুণ ছেলেকে ডাকতে গিয়ে আর ফেরেন নি। ভয়ের চোটে ওরাও ওপরে ওঠেনি।

দৌড়ে ওপরে গিয়ে স্ত্রীকে চাতালে মুখ থুবড়ে শুয়ে থাকতে দেখলেন মিঃ ওয়ার্ড। জ্ঞান নেই। তাড়াতাড়ি এক গেলাস জল এনে মুখে ছিটিয়ে দিতেই চোখ মেললেন তিনি এবং দু'চোখের তারায় বিমূর্ত বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করে নিজেও শিহরিত হলেন। স্ত্রী অকারণে ভয় পান নি। দরজার ওদিক থেকে ভেসে এল চাপা গলায় কাদের কথোপকথন। এতক্ষণ ঘরটা নিস্তব্দ ছিল—হঠাৎ যেন কারা গলা খাটো করে কথাবার্তা শুরু করে দিল নিজেদের মধ্যে—এত নিম্নস্বরে যে বোঝা যায় না—কিন্তু অন্তরাত্মা পর্যন্ত শিউরে ওঠে।

মন্ত্রোচ্চারণ বা নিম্নকণ্ঠে স্তোত্রপাঠ চার্লসের গলায় নতুন কিছু নয়। কিন্তু এই বিড়বিড় বকুনি একেবারেই অন্য জাতের। এ যেন একজনের সঙ্গে আরেক জনের কথা কওয়া, প্রশ্ন করা এবং উত্তর শোনা, ঠিক যেন সংলাপের ঢঙে ঘড়ঘড়ে গলায় প্রতিবেদন পেশ করা, পথ নির্দেশ নেওয়া। অথচ তা এত খাটো গলায় যে দরজার কবাটে কান দিলেও স্পষ্ট শোনো যায় না। কিন্তু ভয়াবহ। গায়ে কাঁটা জাগানো। কান পেতে কিছুক্ষণ শোনার পর হিমস্রোত নেমে যায় যেন মেরুদণ্ড বেয়ে, শিউরে ওঠে অন্তরাত্মা। চার্লস যত চেষ্টাই করুক না কেন—এ হেন কদর্য কুৎসিত অনুকরণ ওর গলায় অসম্ভব। পৈশাচিক সেই কথোপকথন ভেসে আসছে দরজার ওপর থেকে—যে ঘরে চার্লস একা।

ঠিক এই সময়ে আর্ত চীৎকার করে উঠলেন চার্লসের মা। সম্বিৎ ফিরে পেলেন চার্লসের বাবা। উনি মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছিলেন—সম্মোহিতের মত দাঁড়িয়েছিলেন—অবশ অঙ্গুলি সঞ্চালনের ক্ষমতাও যেন ছিল না। কিন্তু স্ত্রীর চীৎকারে তিনি যেন মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এলেন নরককুণ্ড থেকে তারপরে যে সাহস দেখালেন তা নিয়ে এর পরে ঝাড়া একটি বছর বন্ধুদের কাছে বড়াই করেছেন। স্ত্রীকে দুহাতে পাঁজাকোলা করে ধরে দুড়দাড় করে নামতে লাগলেন নীচে—হাত-পা অচল মনে

হলেও, আতংকজমাট ঐ কণ্ঠস্বর নিঃসৃত একটা দুর্দান্ত দুর্দমনীয় অদৃশ্য শক্তি তাঁর দেহমনকে অসাড় করে দিলেও স্ত্রীর চীৎকার শুনে তাঁকে এই নারকীয় কণ্ঠের সান্নিধ্য থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার বাসনায় বিপজ্জনকভাবে টলতে টলতে হুড়-মুড় করে নেমে এলেন নীচে। নামতে নামতেও শুনলেন সেই প্রথম একটা স্পষ্ট চীৎকার। তালাবন্ধ ঘরের ভেতর থেকে স্ত্রীর ঐ কাতর চীৎকারের প্রত্যুত্তরেই যেন বিষম উত্তেজনায় চিলের মত চেঁচিয়ে উঠল সুস্পষ্ট একটি কণ্ঠ এবং সে কণ্ঠ চার্লসের বাবা ছেলের গলায় শুনে নামহীন আতংকে কাঠ হয়ে গিয়েছিলেন। তীক্ষ্ন তীব্র অমানুষিক গলায় চার্লস শুধু দুটি শব্দই উচ্চারণ করেছিল—'চুপ!—লিখুন!'

সেই রাতেই খেতে বসে স্বামী-স্ত্রীতে আলোচনা হল। দুজনেই ঠিক করলেন, আর না, এবার ছেলেকে শাসন করা দরকার। নইলে বাড়ীতে চাকর-বাকর কেউ টিঁকবে না। বাড়ীর শান্তিও বড় বেশী বিঘ্নিত হচ্ছে। আজকে যা ঘটল, তা চূড়ান্ত। নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলা চরম পাগলামির লক্ষণ। সুতরাং আজ রাতেই হেস্তনেস্ত হয়ে যাক।

খাওয়া শেষ হতেই ওপর তলায় ল্যাবোরেটরীর দিকে উঠে গেলেন মিস্টার ওয়ার্ড। তিন তলায় পেঁছেই দুমদাম আওয়াজ শুনে দেখলেন, লাইব্রেরী ঘরে দ্রুত হাতে তাক থেকে বই নামাচ্ছে চার্লস। অথচ এ লাইব্রেরীর চৌকাঠ মাড়ানো ছেড়ে দিয়েছে সে দীর্ঘদিন। ক্ষিপ্তের মত বই ছুঁড়ছে, কাগজ ফেলছে এবং সরু মোটা বিস্তর বই তাক থেকে নামিয়ে বুকের কাছে জড়ো করছে। সারা দেহের ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে। উদভ্রান্ত মুখচ্ছবি। বিস্রস্ত বেশবাস। চৌকাঠ থেকে ছেলেকে ডাকতেই চমকে উঠে হাতের বোঝা মেঝেতে ফেলে দিল চার্লস। তারপর বাপের হুকুমে বসল একটা চেয়ারে। মুখে যা এল বলে গেলেন মিস্টার ওয়ার্ড। অনেক আগেই যে বকুনি খাওয়া দরকার ছিল চার্লসের—সে রাতে তা সুদে আসলে খেতে হল। মিস্টার ওয়ার্ড বললেন, তার জন্যে বাড়ীতে আর কেউ টিঁকতে পারবে না। মাথা-টাথা খারাপ হয়েছে না কি? নিজে নিজে কথা বলা তো চরম উন্মত্ততা?

ঘাড় হেঁট করে স-ব শুনে গেল চার্লস। প্রতিবাদ করল না। ধমক-ধামক শেষ হলে স্বীকার করলে তার মন্ত্রোচ্চারণ, স্তোত্রপাঠে বাড়ীর লোকের শান্তি নষ্ট হওয়াটা স্বাভাবিক। সুতরাং পরে অন্য কোথাও গিয়ে এসব করা যাবে'খন। তবে এখনো সব কথা কাউকে বলার সময়

হয় নি—ঘরেও কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। আজ রাতে সে নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলে নাকি একটা মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি করছিল—গবেষণায় যা একান্ত দরকার। মা অজ্ঞান হয়ে গেছেন শুনে সত্যিই মুষড়ে গেল চার্লস। মিস্টার ওয়ার্ড ধাঁধায় পড়লেন ছেলের মুখে বহু অজ্ঞাত কেমিক্যালের নাম শুনে—সেই সঙ্গে ছেলের কথাবার্তায় সুস্পষ্ট সুস্থতা লক্ষ্য করে। ছেলে তাঁর পাগল নয় মোটেই, অন্ততঃ এই একটি ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি নীচে নেমে এলেন। ছেলেও বইয়ের গাদা বুকের কাছে তুলে নিয়ে চিলেকোঠায় উঠে গেল। শুধু দুটি জিনিস তিনি বুঝলেন না। ছেলে অত উত্তেজিত, উৎকণ্ঠিত এবং গম্ভীর কেন। আর কেনই বা ঘণ্টাখানেক আগে বাড়ীর কালো বেড়ালটাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে একতলায়—নিদারুণ ভয়ে পিঠ ধনুকের মত বেঁকে গিয়েছিল তার, চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল কোটর থেকে এবং দংস্ট্রা বিকশিত ব্যাদিত মুখেও প্রকাশ পেয়েছিল অপরিসীম আতংক।

লাইব্রেরী থেকে কি ধরনের বই নিতে এসেছিল ছেলে দেখতে এলেন বাবা-মা এবং হতভম্ব হয়ে গেলেন। চার্লস প্রতিটি বই বিষয় অনুসারে সংখ্যা দিয়ে সাজিয়ে রাখত। তাই একনজরেই দেখা গেল ঠিক কোন ধরনের বইগুলি সে বেছে নিয়ে গেছে চিলেকোঠায়।

অলৌকিক গুপ্তবিদ্যা সংক্রান্ত একখানি বইও সে নেয় নি—বরং হাতে ঠেকলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। অথচ এতদিন এই বই ছিল তার নয়নের মণি।

নিয়ে গেছে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন সংক্রান্ত আধুনিক বই, খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিন। দেখে তাক লেগে গেল মিস্টার ওয়ার্ডের। বুঝতে পারলেন না হঠাৎ এ ধরনের বই পড়ার ঝোঁক হল কেন চার্লসের। বুঝতে না পারলেও একটা আবছা আতংক ঘিরে ধরল তাঁর মনকে। সমস্ত চেতনা দিয়ে উপলব্ধি করলেন, অবস্থা আর আগের মত নেই—পালটেছে। তাই নামহীন আতংক যেন নখযুক্ত থাবা দিয়ে আঁকড়ে ধরল তাঁর হৃদপিণ্ডকে—যেন নিঃশ্বেস নিতেও কষ্ট হতে লাগল লণ্ডভণ্ড লাইব্রেরী ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে। ঘরে ঢোকার পর থেকেই ওঁর মনে হচ্ছিল কোথায় যেন কি একটা গোলমাল হয়েছে। কি যেন নেই ঘরের মধ্যে। কি জন্যে যেন একটা আমূল পরিবর্তন এসেছে ঘরের পরিবেশে। আচমকা তাঁর নজরে এল না থাকা সেই শূন্যতা।

উত্তরের সমস্ত দেওয়াল জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা জোসেফ কারুওয়েনের সুপ্রাচীন সুবৃহৎ তৈলচিত্রে অবশেষে কালের কুটিল ছোঁয়া লেগেছে।

অসম উত্তাপে রঙ চটে উঠে গিয়েছে। ঘরটা শেষ যেদিন ঝাঁট দেওয়া হয়েছিল, তৈলচিত্র বিনষ্ট হয়েছে তারপরেই। তাই দেড়শো বছর আগেকার অয়েল পেণ্টিংয়ের মানুষটি আর নির্নিমেষে তাকিয়ে নেই চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ডের সঙ্করমান মূর্তির পানে। ওলনি কোর্ট থেকে ছবিটা এ ঘরে আনার পর থেকে ছবির মানুষের প্রায়-জীবন্ত চোখ দুটো যেন অষ্টপ্রহর কড়া নজরে রেখেছিল চার্লসকে! কিন্তু সে চোখ, সে মুখ, সে চেহারা আর কোনোদিনই অতীতের প্রেতের মত প্রহরায় নিযুক্ত থাকবে না এ-ঘরে। কারণ তার পুরু প্রাচীন রঙ সহসা যেন ভৌতিক প্রক্রিয়ায় ঝরে পড়েছে তৈলচিত্রের বুক থেকে—শত-সহস্র টুকরোয় গুঁড়িয়ে গিয়ে অতি-মিহি নীলাভ-ধূসর ধুলো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে ঘরময়।

চতুর্থ পর্ব—একটি পরিবর্তন ও একটি উন্মত্ততা

গুডফ্রাইডের পরের সপ্তাহে চার্লস প্রায় বেরোতো ঘরের বাইরে। লাইব্রেরী থেকে গাদা গাদা বই নিয়ে যেত চিলেকোঠায়। মায়ের মন কিন্তু ছেলের চেহারা দেখে শিউরে উঠত। চার্লস যেন শুকিয়ে গেছে একদিনেই। চোখ মুখ সংযত, কথাবার্তাও গুছোনো—কিন্তু চাউনিটা কেমন জানি ভোঁতা। চোখের সে ধার আর নেই। ক্ষিদেও রাতারাতি বেড়ে গিয়েছে। রাঁধুনির ওপর হামলা চলছে কেন দ্বিগুণ খাবার দেওয়া হচ্ছে না এই অপরাধে।

ডক্টর উইলেট গুডফ্রাইডের পিলে চমকালো ব্যাপার-স্যাপার শুনে দৌড়ে এলেন চার্লসের কাছে। চার্লস এমন সুন্দর সংযত ভদ্র ব্যবহার করল তাঁর সাথে যে তিনি জোরের সঙ্গে বলে গেলেন, ছেলেটাকে পাগল ভাববার কোনো কারণ নেই। চার্লস এমন কথাও বলেছে তাঁকে যে লুকোছাপার অবসান ঘটতে আর বেশী দেরী নেই। তবে অন্য কোথাও একটা ল্যাবোরেটরী না বানালেই আর নয়। কারওয়েনের প্রতিকৃতি আচমকা গুঁড়িয়ে পাউডার হয়ে গেছে শুনে দুঃখিত হয়েছে বলে মনে হল বটে, কিন্তু ছদ্ম দুঃখের আড়ালে একটা চাপা কৌতুকও যেন প্রচ্ছন্ন রয়েছে মনে হল ডক্টরের।

পরের হপ্তায় ওলনি কোর্টের বাড়ীতে ঘন ঘন যাওয়া শুরু করল চার্লস। নিগ্রো মহিলাটি ওকে চেনে এতটুকু বয়স থেকে। তাই মস্ত একটা পোর্টম্যাণ্টো ব্যাগ নিয়ে পাতাল কুঠরিতে গিয়ে বসে থাকলেও বাধা দেয় নি—বরং সাহায্য করেছে। কিন্তু পাতাল কুঠরির মত একটা

এঁদো অন্ধকার ঘরে কি নিয়ে এত খোঁড়াখুঁড়ি, সে রহস্য নিগ্রো প্রৌঢ়ার কাছে ভাঙেনি চার্লস।

একই সময়ে খবর এল পটুক্সেট খামার বাড়ীর দিকেও যাতায়াত করছে নাকি চার্লস। পরে খোঁজ খবর নিলেন ডক্টর উইলেট। শুনলেন, চার্লস জনে জনে জিজ্ঞেস করেছে ঝোপঝাড় দিয়ে ঢাকা নদীর পাড় বেয়ে উত্তর দিকে যাওয়া যায় কিনা। তারপর প্রায় ঝোপের মধ্যে ঢুকে ফিরত অনেকক্ষণ পরে। অনুমান, সে উত্তরের ভগ্নস্তূপের দিকেই যেত বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে।

মে মাসের শেষের দিকে আবার শুরু হল গুডফ্রাইডের পুনরাভিনয়। একই রকম চাপা গলায় কথাকাটাকাটির আওয়াজ পাওয়া গেল দরজার বাইরে। দুরকম গলায় দারুণ ঝগড়া হচ্ছে যেন দুজনের মধ্যে। একজন রেগে গিয়ে কি চাইছে, অপরজন সমান রেগে বেঁকে বসছে। একজনের দাবী, অপরজনের প্রত্যাখ্যান। একটা গলা চার্লসের—অপরটা অপার্থিব পৈশাচিক। চার্লস যে এরকম রক্ত জমানো কণ্ঠস্বর অনুকরণ করতে পারে, তা না শুনলে বিশ্বাস হয় না। বাদানুবাদ শেষকালে চরমে উঠল। চাপা ঘড়ঘড়ে গলার হুংকারে বাড়ী যেন কাঁপতে লাগল। অথচ দুর্বোধ্য হুমকির একটা বর্ণও মিসেস ওয়ার্ড বুঝতে পারলেন না। সইতেও পারলেন না। দৌড়ে ওপরে গিয়ে দরজায় কান পাতলেন বটে, কিন্তু আচম্বিতে সব শব্দ যেন চাপা ঘুৎকার হয়ে মিলিয়ে গেল—ভাঙা ভাঙা স্বরে শেষ যে কথা ক'টি শুনলেন তা আগের মত অস্পষ্ট নয়। জোড়া তালা লাগালে মানে দাঁড়ায় এই—"অন্ততঃ তিন মাসের জন্যে লাল থাকা চাই।" ঠিক তখুনি দরজায় ধাক্কা দিয়েছিলেন চার্লসের মা—সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল চিলেকোঠা। পরে যখন চার্লসের বাবা ছেলেকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আবার এসব শুরু হয়েছে কেন বাড়ীতে, তখন ধানাই-পানাই করে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে কয়েকটা পরস্পর বিরোধী চেতন চক্রের সংঘাতে এই কথাবার্তা শোনা গিয়েছে—অতি কষ্টে চক্রগুলো আলাদা করতে হয়েছে।

জুন মাসের মাঝামাঝি গভীর রাতে আবার একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল বাড়ীতে। রাত যখন গভীর হয়নি, তখন চিলেকোঠার ল্যাবোরেটরীতে পা ঠোকার দুমদাম আওয়াজের সঙ্গে আরও কয়েকটা আওয়াজ শুনে মিস্টার ওয়ার্ড ওপরে যাবেন বলে যেই পা বাড়িয়েছেন, অমনি সব চুপচাপ হয়ে যায়। বাড়ীর সবাই শোবার ঘরে যাওয়ার পর সদর দরজায় তালা লাগাতে যাচ্ছিল খাস চাকর, এমন সময়ে অদ্ভুতভাবে হাতড়াতে হাতড়াতে

অচেনা আগন্তুকের মত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল চার্লস—হাতে একটা প্রকাণ্ড সুটকেশ। মুখে কিছু বলল না—কিন্তু চাউনি দিয়ে বুঝিয়ে দিলে বাইরে বেরোবে। হিমশীতল সেই চাউনি দেখেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল চাকরটির। দ্বিরুক্তি না করে খুলে দিয়েছে দরজা। পরের দিন চাকরী ছেড়ে দিয়ে চলে যাবার আগে মিসেস ওয়ার্ডকে বলে গিয়েছিল—এ বাড়ীতে একদণ্ড নয়। গতরাতে চার্লস যেভাবে তার দিকে তাকিয়েছে, ওভাবে কোনো মানুষ কারো দিকে তাকায় না। চাউনিটা হিংস্র, বর্বর, অমানবিক, পাশবিক। মিসেস ওয়ার্ড কিন্তু একটা কথাও বিশ্বাস করেন নি। ছেলের মাথায় অনেক উদ্ভট খেয়াল চেপেছে বলে তার চাউনিটা অমানুষিক হয়ে যাবে—এ কথা মা হয়ে মানতে তিনি রাজী নন।

পরের দিন সন্ধ্যা হতেই তিনমাস আগেকার আর এক সন্ধ্যার মত একতলায় নেমে এল চার্লস—খবরের কাগজটা নিয়ে উঠে গেল ওপরে। পরে দেখা গেল, তিনমাসে আগে যেরকম দৈবাৎ কাগজ পুড়িয়ে ফেলেছিল—ঠিক সেইভাবে সেদিনও একটা বিশেষ পাতা হারিয়ে ফেলেছে। ডক্টর উইলেট পরে বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী জোড়া তালা লাগানোর সময়ে হারিয়ে যাওয়া সেই বিশেষ পাতাটি খবরের কাগজের অফিসে গিয়ে দেখে এসেছিলেন। তাৎপর্যপূর্ণ দুটো সংবাদ ছাপা হয়েছিল সেখানে। খবর দুটো এই ঃ

কবর খোঁড়াখুঁড়ি বেড়েই চলেছে

উত্তর গোরস্থানের রাতের প্রহরী রবার্ট হার্ট আজ ভোররাতে নতুন করে কবর চোরদের তৎপরতা আবিষ্কার করেছে। গোরস্থানের প্রাচীন পরিত্যক্ত কবরগুলোর ওপর সমানে হানা দিয়ে চলেছে এই নিশিকুটুম্বরা। চোরের দল ১৮২৪ সালে মৃত এজরা উঈডেনের কবর খুঁড়ে তননছ করে গেছে—স্মৃতিফলক পাশবিক আক্রোশে চুরমার করে ফেলে গেছে।

প্রায় একশ বছর পরে কফিনের খানকয়েক পচা কাঠ ছাড়া কবরের মধ্যে কিছুই থাকার কথা নয়। সুতরাং চোরেরা কি নিয়ে গেছে, তা অনুমান করা যাচ্ছে না। কবরের পাশে লরীর চাকার দাগের বদলে দেখা গেছে দামী বুটপরা একজোড়া পুরুষ পদচিহ্ন।

রবার্ট হার্টের মতে তিনমাস আগে লরী নিয়ে যারা বাক্স নামাতে গিয়েও তাড়া খেয়ে পালিয়েছিল—আজকের ভোররাতে তারাই এসেছিল।

কিন্তু পুলিশের মতে তা সম্ভব নয়। কেন না, তিনমাস আগে চোরের দল কবরখানায় যেখানে মাটি খুঁড়েছিল, সেখানে কবর ছিল না কস্মিন কালেও। কিন্তু আজ ভোররাতে চোরের দল স্মৃতিফলক লাগানো নির্দিষ্ট একটা কবরই তছনছ করে গেছে এবং বিজাতীয় ঘৃণায় পাথরের ফলকটি আছড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে গেছে। অথচ কালকেও আস্ত দেখা গিয়েছে স্মৃতিফলকটিকে।

এজরা উঈডেনের বংশধর হ্যাজার্ড উঈডেন কিন্তু বলেছেন, তাঁর পূর্বপুরুষ এজরা উঈডেনের সেরকম কোনো শত্রু ছিল না। বিপ্লবের ঠিক আগে একটা ন্যক্কারজনক ঘটনায় তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন ঠিকই—কিন্তু পরবর্তীকালে এবং অধুনাকালেও তাঁর অথবা তাঁরা স্মৃতিরও কোনো শত্রু নেই। উঈডেন পরিবার তাই স্তম্ভিত হয়েছেন কবরের ওপর অজ্ঞাত আততায়ীর পাশবিক ঘৃণার বহর দেখে। পুলিশ তদন্ত চলেছে।

পটুক্সেটের অশান্ত কুকুর

রোডেশিয়ন-দি-পটুক্সেটের উত্তরে নদীর ধারেকাছে কোথাও গতকাল রাত তিনটের সময়ে সহসা বহু কুকুরের অস্বাভাবিক ডাকে নিদ্রাভঙ্গ ঘটে স্থানীয় বাসিন্দাদের। এরকম অদ্ভুতভাবে আর দলবদ্ধভাবে এত কুকুরকে একই সঙ্গে নাকি ঘেউ-ঘেউ করতে কখনো শোনা যায় নি। রোডসের রাতের রক্ষী ঠিক তখনি একটা করুণ কাতর তীব্র হাহাকার শুনতে পেয়েছিল। মরণান্তক যন্ত্রণায়, নিঃসীম বেদনায় কেঁদে উঠেছিল একজন পুরুষ। অতি অল্পক্ষণের জন্যে কিন্তু অতি তীব্র আকারের একটা বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় দেখা দিয়েছিল নদীর ধারে—সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিল নদীতীর—যেন ঝড় এসে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল অপার্থিব উৎপাতকে। অদ্ভুত অস্বস্তিকর একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছিল তারপরেই। খুব সম্ভব তেলের ট্যাঙ্কের গন্ধ। এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে উপসাগরের অয়েল ট্যাঙ্কের সচরাচর যোগ থাকে···কুকুরগুলো খুব সম্ভব ক্ষেপে উঠেছিল সেই কারণেই।

চার্লসের অবস্থা কিন্তু দিনে দিনে শোচনীয় হয়ে উঠতে লাগল। ঝড়োকাকের মত মত চেহারা দেখে মনে হত যেন ভূতে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে অহোরাত্র। অন্তর যন্ত্রণা সে আর সইতে পারছে না এবং যে

কোনোদিন এতদিনের এক্সপেরিমেণ্ট নিয়ে কথা বলতে পারে—এমন সন্দেহও দেখা দিল পরিচিতবর্গের মধ্যে। মায়ের মন ছাঁৎ করে উঠত প্রতি রাত্রে বহুবার বহুবিধ শব্দে। প্রতিটি শব্দ ভেসে আসত ছাদের চিলেকোঠা থেকে। কাউকে না বললেও মা বুঝতেন। রাত হলেই বেরিয়ে যায় চার্লস। কোথায় যায়, সে প্রশ্ন করা বিড়ম্বনা জেনেই জিজ্ঞেস করেন নি। তবে ঠিক এই সময়ে শুরু হয়েছিল ভ্যামপায়ারের উৎপাত। রক্তচোষার আবির্ভাব ঘটেছিল বিশেষ দুটি জায়গায়। ওয়ার্ড ভবনের কাছে পাহাড়ের এবং পটুক্সেট খামার বাড়ীর কাছে গাঁয়ে। রাত করে যারা বাড়ী ফিরত অথবা জানলা খোলা রেখে যারা ঘুমোতো তাদের ওপরেই নাকি ঝাঁপিয়ে পড়ত শীর্ণ, কৃশ এক শরীরী দানব। দুই চোখ জ্বলত দুটুকরো অঙ্গারের মত। লাফাতো ক্যাঙারুর মত এবং তীক্ষ্ন দাঁত বসিয়ে দিত গলা বা বাহুতে—আকণ্ঠ পান করত তাজা রক্ত। কামড় থেকে যারা প্রাণে বেঁচেছে—একবাক্যে তাদের সকলেই এই একই বর্ণনা দিয়েছে সেই মূর্তিমান বিভীষিকার।

এই ঘটনা সম্পর্কে ডক্টর উইলেট মন্তব্য করেছেন টিপেটিপে—হুঁশিয়ার হয়ে। উনি বলেছেন। 'চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড আর যাই হোক—দানব নয়। রক্তপান সে করে না, করতে পারে না। করলে তার চেহারা অমন রক্তহীন হত না—এবং দিনে দিনে রক্তহীনতা এত বৃদ্ধি পেত না। উদ্ভট এক্সপেরিমেণ্ট সে করেছে ঠিকই—মাশুলও দিয়েছে। কিন্তু সে পিশাচ নয়, দানব নয়। তবে একটা পরিবর্তন এসেছে। হাসপাতাল থেকে উন্মাদ মাংসপিণ্ডটি উধাও হয়েছে—তার আত্মা আর চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ডের আত্মা এক নয়।'

চার্লসের মা আর সহ্য করতে পারছিলেন না। গভীর রাতে তিনি ছাদের চিলেকোঠা থেকে ফুঁপিয়ে কান্না আর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পেতেন। ছোটখাট আওয়াজেও আঁৎকে উঠতেন। ডক্টর উইলেট লক্ষণ দেখে শংকিত হলেন। জুলাই মাসে একরকম জোর করেই তাঁকে পাঠালেন আটলাণ্টিক সিটিতে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে। স্বামী এবং পুত্রকে পইপই করে বলে দিলেন, তাঁকে লেখা চিঠি পত্রের মধ্যে যেন নিরাশা বা নিরানন্দ একদম না থাকে। বলতে গেলে এই ব্যবস্থা পত্রের দরুনই পাগল হওয়ার পরিণতি থেকে বেঁচে গেলেন চার্লসের মা।

২

মা চলে যেতেই চার্লস উঠে পড়ে লাগল পটুক্সেট খামার বাড়ী কেনবার জন্যে। বাড়ীটা আহামরি কিছু নয়। কাঠের তৈরী—গ্যারেজটা কেবল কংক্রিটের। কিন্তু এই শ্রীহীন বাড়ীখানাই কেনার জন্যে দালাল মারফৎ অনেক টাকা দিতে চাইল চার্লস। কিনে নেওয়ার পরেই গভীর রাতে অমাবস্যার অন্ধকারে গা ঢেকে পাচার করল চিলেকোঠার সমস্ত জিনিস পত্র পটুক্সেটে। অলৌকিক বই, আধুনিক বই, গবেষণার শিশি বোতল যন্ত্রপাতি—সব। লরীর পর লরী বোঝাই হয়ে গেল জিনিসপত্রে। লোকজনের ঘাম ছুটে গেল অত ভারী ভারী জিনিস নামাতে। নিজের ঘরে বসেই তাদের গালিগালাজ শুনেছিলেন মিস্টার ওয়ার্ড। মালপত্র পাচার করে দেওয়ার পর কিন্তু ভুতুড়ে চিলেকোঠায় চার্লস আর ওঠেনি—ডেরা নিয়েছিল আগের মত তিনতলায় নিজের ঘরটিতে।

চার্লসের যত কিছু গোপন রহস্য মালপত্রের সঙ্গে সঙ্গেই চালান হয়ে গেল পটুক্সেট খামার বাড়ীতে। দুজন রহস্যজনক ব্যক্তিকে সাগরেদ রূপে দেখা যেত সেখানে। একজনের নাম গোমেশ—বেজন্মা মুলাটো—চেহারাটা আস্ত শয়তানের মত। কথা বলত খুব কম—ইংরেজিতে। আরেকজন কৃশকায়, কালো চশমাধারী। গাল বোঝাই রঙ করা চাপ দাড়ি। নাম, ডক্টর অ্যালেন। স্বল্পবাক। পড়ুয়া চেহারা। কথা-বার্তা বলত চার্লস একাই। পাড়া প্রতিবেশীদের মন জুগিয়ে চলতে কসুর করেনি সে। কিন্তু পারে নি। রাত বিরেতে অদ্ভুত চেঁচানি শুনলে কার ভাল লাগে? প্রথম প্রথম শিশিবোতল নিয়ে অনেক এক্স-পেরিমেন্ট করেছে চার্লস—বোতল ঠোকাঠুকির আওয়াজ শোনা গেছে দূরে থেকেও। তারপর দেখা গেল আলো জ্বলছে সরারাত সব কটা জানলায়। আলো জ্বলা বন্ধ হল তো আরম্ভ হল অস্বাভাবিক পরিমাণে কাঁচা মাংসের আমদানী। মাত্র তিনটি প্রাণীর জন্যে এত মাংস? খটকা লাগল প্রতিবেশীদের। সন্দেহ তীব্রতর হল যখন গভীর রাতে মাটির তলা থেকে উঠে আসতে লাগল চাপা কণ্ঠে স্তোত্র পাঠের শব্দ, গোঙানি, মন্ত্রপাঠ এবং বুকফাটা চীৎকার। তবে কি ভ্যামপায়ারের ঘাঁটি ঐ-খানেই? প্রমাণস্বরূপ রক্তচোষার উপদ্রব বেড়ে গেল পটুক্সেটেরই আশপাশে।

বাড়ী ছেড়ে বেরোনো প্রায় ছেড়ে দিল চার্লস। ওয়ার্ড ভবনের তিন-তলা ছেড়ে বড় একটা নীচে নামত না। দিনে দিনে পাকিয়ে যাচ্ছিল

চেহারা। রক্ত যেন উবে যাচ্ছে শরীর থেকে। সে ফুর্তি নেই। গবেষণা নিয়ে সোৎসাহে গল্প করার আর মেজাজও নেই। শীর্ণ শুষ্ক মুখে কি যেন ভাবত দিবারাত্র। ডক্টর উইলেট প্রায় রোজ আসতেন তাকে দেখতে, তার সঙ্গে গল্প করতে। কথাবার্তার ধরন দেখেই ডক্টর বুঝে ফেলেছিলেন, এতগুলি বছর যে গবেষণা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়েছে—সহসা সেই উন্মাদনা তিরোহিত হয়েছে তার মন থেকে। চার্লস কোনোদিনই পাগল ছিল না—হঠাৎ নিরুৎসাহ হয়ে যাওয়ার পরেও নয়—জোর দিয়ে বলেছেন ডক্টর উইলেট।

চার্লস বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল মোটে দুবার। কোথায় যেন গিয়েছিল—ফিরেছিল দিন সাতেক পরে। এর কিছুদিন পরে পর পর কয়েকটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল হোপ ভ্যালীর কাছে একটা নির্জন জায়গায়। ছিনতাই-কারীদের ঘাঁটি সেখানে। লরী থেকে মদ ছিনতাই করে তারা কুখ্যাত। কিন্তু পরপর কয়েকটা লরী থেকে প্রকাণ্ড খানকয়েক বাক্স ছিনতাই করার পর তাদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। বাক্সের ডালা খুলেই মাথার চুল খাড়া হয়ে গিয়েছিল বলে ঝটপট বাক্স কটা পুঁতে ফেলল মাটিতে। কিন্তু খবর চাপা থাকে না। বিশেষ করে বাক্স ক'টার মধ্যে এমন বীভৎস বস্তু দেখা গিয়েছিল যা মানুষ দেখলে ভুলতে পারে না। কানাঘুসোয় কথাটা পুলিশ দপ্তরে পেঁছোলো। একজন ছিনতাইকারী পুলিশকে নিয়ে গিয়ে দেখালো মাটিতে পোঁতা বাক্সগুলো। দুঁদে পুলিশ অফিসাররাও নাকি তাই দেখে দমাস করে বাক্সের ডালা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

টেলিগ্রাম গেল ওয়াশিংটনে। বাক্সগুলো নাকি পাঠানো হয়েছিল চার্লসের নামে। পুলিশ এল পটুক্সেট খামারবাড়ীতে। চার্লস নিরক্ত পাংশুমুখে বললে, গবেষণার জন্যে কাটাছেঁড়া চলতে পারে, এমনি কয়েকটা নমুনা চেয়ে সে অর্ডার পাঠিয়েছিল এজেন্সীকে। কিন্তু এরকম নমুনা পাঠানো হবে সে কি করে জানবে? পুলিশ অফিসার বললেন—বাক্সের মধ্যে যা পাওয়া গেছে, তা শুধু পৈশাচিক নয়—অবিশ্বাস্য। দেশের লোক যদি শোনে এসব ভয়ংকর জিনিস চার্লসের নামে আসছে, ঢি-ঢি পড়ে যাবে যে। তাতো বটেই, সায় দিলে চার্লস। পাশে বসে স্বল্পবাক ডক্টর অ্যালেনও অদ্ভুত কাঁপা গলায় বললে একই কথা। চার্লস কি করে জানবে বাক্সের মধ্যে কি পাঠানো হয়েছে? তখন পুলিশ জিজ্ঞেস করল, এজেন্সীর ঠিকানা কি? নাম ঠিকানা দিল চার্লস। কিন্তু লাভ কিছু হল না। অবশেষে বাক্সভর্তি রক্তজমানো নমুনা-

গুলো চালান হয়ে গেল মাটির তলায়—যেখানে তাদের থাকবার কথা। দেশের লোক বিন্দুবিসর্গও জানতে পারল না কি ধরনের জিনিস ছিনতাইকারীরা ছিনিয়ে নিয়েও ফেলে পালিয়েছে—খবর দিয়েছে পুলিশকে।

১৯২৮ সালের নউই মার্চ ডক্টর উইলেট একটা চিঠি পেলেন চার্লসের কাছ থেকে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেই চিঠিখানাই নাকি চার্লসের উন্মত্ততার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—বললেন ডক্টর লাইমান। কিন্তু ঠিক উল্টো কথা বললেন ডক্টর উইলেট। যদিও চিঠির মধ্যে নিঃসীম নিরাশার সুর ধ্বনিত হয়েছে, যদিও চিঠির ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে স্নায়ু বিপর্যয়ের পূর্বলক্ষণ, তবুও চিঠিটা গুছিয়ে লেখা, অসংলগ্ন মোটেই নয়। সুতরাং সে পাগল তো নয়ই, বরং অত্যন্ত সুস্থ, সেই মুহূর্ত পর্যন্ত। চার্লসের নিজের হাতে লেখা চিঠিটা এই ঃ

১০০ প্রসপেক্ট স্ট্রীট,
প্রভিডেন্স
আটই মার্চ, ১৯২৮

প্রিয় ডক্টর উইলেট,

এত বছর যা শোনবার জন্যে ধৈর্য ধরেছেন, এতদিনে তা বলবার নময় হয়েছে। আপনার সহিষ্ণুতার জন্যে ধন্যবাদ।

আমি জিতেছি—কিন্তু জয়োল্লাসে উল্লসিত হতে পারছি না, আতংকে কুঁকড়ে রয়েছি। আমি যা চেয়েছি, তা পেয়েছি। কিন্তু এ আমার চরম পরাজয়। তাই আপনার কাছে এসেছি বাঁচবার জন্যে। আপনি সাহায্য না করলে গোটা পৃথিবীর সর্বনাশ আসন্ন। ধারণাতীত এবং গণনাতীত আতংক অচিরেই ছড়িয়ে পড়বে সারা পৃথিবীতে। পটুক্সেট খামারবাড়ীতে দেড়শ বছর আগে একরাতে যে নিধন-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল—ফেনারের লেখা সেই কাহিনী আপনার মনে আছে নিশ্চয়। সেই নিধন-যজ্ঞেরই পুনরনুষ্ঠান দরকার—পটুক্সেট খামারবাড়ীতে। ধ্বংস করতে হবে ঐ বাড়ী—সেখানকার সবকিছু। এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। নইলে যে বিভীষিকা ছড়িয়ে পড়বে এই পৃথিবীতে এবং পৃথিবীর বাইরেও—তা বোঝানোর মত ভাষা আমার নেই। যদি বলি, পৃথিবী-পৃষ্ঠের সব সভ্যতা, সব কানুনের ইতি ঘটতে চলেছে—এমন কি সৌরজগতের এবং ব্রহ্মাণ্ডের বিপর্যয়ও আসন্ন—অবাক হবেন না। নিছক জ্ঞানের খাতিরে যে দানবিক অসম্ভবকে আমি সম্ভব করেছি, পৈশাচিক অস্বাভাবিকতাকে রূপ দিয়েছি—তাকে আবার অন্ধকারের আলয়ে ফেরৎ

পাঠাতে চাই—বাঁচবার জন্যে---সারা পৃথিবীর মানুষকে বাঁচনোর জন্যে ? আপনার সাহায্য তাই একান্তই দরকার।

পটুক্সেট খামারবাড়ী জম্মের মত ছেড়ে এসেছি। ইহজীবনে সেখানে আর যাব না---মরে গেলেও যাব না---সেখানে থাকার প্রশ্নই উঠছে না। আমি ওখানে আছি শুনলেও বিশ্বাস করবেন না। কেন বললাম এ কথা সাক্ষাতে বলব। আমি বাড়ী ফিরে এসেছি আমৃত্যু এখানেই থাকব বলে। আপনি দয়া করে এখুনি আসুন---চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসুন---হাতে পাঁচ-ছ ঘণ্টা সময় নিয়ে আসবেন---আমার সব কথা ওর কমে বলা যাবে না। আসবেন আপনার ডাক্তারি কর্তব্যের তাগিদে—আমার জীবন, আমার যুক্তি, বুদ্ধি, চেতনা এখন সুতোয় ঝুলছে।

বাবাকে বললে বুঝতে পারবেন না বলে ওঁকে কিছু বলিনি। শুধু বলেছি আমার জীবনাশঙ্কা আছে। উনি চারজন গোয়েন্দা বসিয়েছেন বাড়ীতে। কিন্তু গোয়েন্দা দিয়ে সেই বিভীষিকাকে ঠেকানো যায় না। আপনি ধারণাতেও আনতে পারবেন না কি নারকীয় শক্তি আমাকে হনন করতে উদ্যত হয়েছে। যদি জীবিত দেখতে চান আমাকে, শুনতে চান আমার কথা—পত্রপাঠ চলে আসুন—শুনে যান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নরক জ্বলে ওঠা রোধ করা যায় কি ভাবে।

যখন খুশী আসুন—আমি বাড়ীতেই আছি। আগে ফোন করার দরকার নেই—হয়ত কেউ আড়ি পাততে পারে। ঈশ্বর করুন—আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ যেন হয়—বাগড়া না পড়ে।

মরিয়া হয়ে লিখলাম এই চিঠি---লিখলাম হৃদয়ের সমস্ত আকুতি ঢেলে। ইতি---

চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড

পুনশ্চ ঃ—ডক্টর অ্যালেনকে দেখলেই গুলি করবেন। লাশ অ্যাসিডে গলিয়ে ফেলবেন---পোড়াবেন না।

উক্টর উইলেট চিঠি পেলেন সকাল সাড়ে দশটায়। ঠিক করলেন, সারা বিকেলটা চার্লসের সঙ্গে কাটাবেন---দরকার হলে মাঝরাত পর্যন্তও কথা শুনবেন। যাবেন বিকেল চারটেয় হাতের সব কাজ শেষ করবার পর---থাকবেন ওর কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

মাঝখানের সাড়ে পাঁচটি ঘণ্টা একনাগাড়ে সাত পাঁচ অনেক কথাই ভেবে গেলেন ডক্টর---চার্লস কখনো এরকম ব্যাকুলভাবে তাঁকে ডাকেনি।

কেন? কি হয়েছে? চিঠির ভাষায় আবোলতাবোল অনেক প্রলাপ বকুনি আছে মনে হয়---কিন্তু ভাষা সংযত, সুসংবদ্ধ। ব্যাপারটা কি? ডক্টর অ্যালেনের ওপর তার জাতক্রোধ এসেছে দেখা যাচ্ছে। অথচ রহস্যময় এই লোকটি ছাড়া একদণ্ডও চলেনি চার্লসের। হঠাৎ চাকা ঘুরে গেল কেন? ডক্টর অ্যালেনকে চাক্ষুস কখনো দেখেননি ডক্টর উইলেট---কেবল লোকমুখে শুনেছেন তার ধরনধারন চলনবলন নাকি সৃষ্টিছাড়া, সবচাইতে রহস্যজনক ঐ কালো চশমা। কেন? কি আছে চোখে? ঠুলি দিয়ে ঢেকে রাখার দরকারটা কি?

কাঁটায় কাঁটায় চারটের সময়ে ওয়ার্ডভবনে হাজির হলেন ডক্টর উইলেট, কিন্তু মেজাজ খিঁচড়ে গেল চার্লসকে না দেখে। ছোকরা কথা দিয়েও কথা রাখেনি। গোয়েন্দাদের কাছে শুনলেন সকালবেলা কে নাকি তাকে টেলিফোন করেছিল। খুব তর্কাতর্কি হয়েছিল।

ছাড়া ছাড়া কথাগুলো এইরকম: 'মাপ করবেন, এখন কারো সঙ্গে দেখা করতে পারব না।'...'এখুনি কিছু করবার দরকার নেই, আগে একটা মিটমাট হোক, তারপর।'...'দুঃখিত, লম্বা ছুটি দরকার আমার, বড় ক্লান্ত, এখন আর কথা নয়, পরে যা বলবার বলব।'

কড়া গলায় এত কথা বলবার পরেও নিশ্চয় মন ঘুরে গিয়েছিল চার্লসের। তাই ফোন করার পরেই বেরিয়ে গিয়েছিল বাইরে, কেউ দেখতেও পায়নি। ফিরে এসেছিল একটা নাগাদ। কারো সঙ্গে কথা না বলে সটান উঠে গিয়েছিল তিন তলায়। ঘরে ঢুকেই অন্তরের আতংককে আর চাপতে পারেনি, নীচতলা থেকেও শোনা গিয়েছিল তার তীক্ষ্ন ভয়ার্ত চীৎকার—তারপরেই দম আটকে যাওয়ার মত শব্দ—হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলে যা হয় আর কি।

চেঁচানি শুনে খাস চাকর উঠে গিয়েছিল তিন তলায়। বুকের পাটা বটে চার্লসের—অত ভয় পাওয়ার পরেও বেরিয়ে এসে যেন কিছুই হয়নি এমনি ভান করে হাতের ইসরায় চাকরকে নেমে যেতে বলেছিল নীচে। দ্বিরুক্তি না করে দুড়দুড়িয়ে নেমে এসেছিল চাকর—কেন না চার্লসের চোখের মধ্যে এমন একটা বস্তু ছিল যা সে এর আগে কখনো দেখেনি। রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল তার সেই চাউনি দেখে এবং ডক্টর উইলেটের কাছে ওষুধ চেয়েছিল ছেড়ে যাওয়া ধাতকে ফিরিয়ে আনার জন্যে।

চার্লস ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে বইয়ের তাক নিয়ে টানাটানি করেছিল কিছুক্ষণ। দুমদাম আওয়াজ ভেসে এসেছিল লাইব্রেরী

থেকে। তারপর নিঃশব্দে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল কারও কথা না শুনে।

ঝাড়া দুটি ঘণ্টা লাইব্রেরী ঘরে চার্লসের প্রতীক্ষায় বসে রইলেন ডক্টর উইলেট। কিন্তু চার্লস ফিরল না। ধূলিধূসরিত বইয়ের তাকগুলির দিকে চেয়ে মনটা মুচড়ে উঠল অতীতের কথা ভেবে। বইপাগল চার্লস কত বই না কিনে এনে ঠেসে রেখেছিল তাকগুলোয়—এখন তার প্রায় সব অদৃশ্য—চালান হয়েছে পটুক্সেট খামারবাড়ীতে। উত্তর দিকের বিরাট ওভারম্যাণ্টেলের ওপরকার দেওয়ালটিও শূন্য—জোসেফ কারওয়েনের সুপ্রাচীন প্রতিকৃতি আর তাকিয়ে নেই টেবিলের পানে। আস্তে আস্তে অন্ধকার গাঢ় হতে লাগল ঘরের মধ্যে। সেইসঙ্গে গা ছমছম করতে লাগল ডক্টরের। কেন, তা তিনি বলতে অক্ষম। তিনি কড়া ধাতের পুরুষ—লৌহকঠিন তাঁর স্নায়ু। তা সত্ত্বেও মনে হতে লাগল ঘরের কোণে কোণে জমাট বাঁধা অন্ধকারগুলো যেন নীরবে নির্নিমেষে তাঁকে দেখছে। ছবিটা নেই—কিন্তু ছবির অশুভ প্রভাব যেন ঘরের মধ্যেই রয়ে গিয়েছে। এ ঘর আর নিরাপদ নয়—বাইরে বেরোতে পারলে ভাল হত।

ঠিক এই সময়ে চার্লসের বাবা ফিরে এলেন। ছেলে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট রাখেনি শুনে তিনি বিরক্ত হলেন। কাঁহাতক আর ডাক্তারকে বসিয়ে রাখা যায়। তাই অভব্য ছেলের হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বিদায় দিলেন ডাক্তারকে।

স্বস্তির নিঃশ্বেস ফেলে ঘরের গুমোট অস্বস্তি থেকে বাইরের খোলা হাওয়ায় এসে বাঁচলেন ডক্টর উইলেট।

৩

পরের দিন সকালে ডাক্তারকে ফোন করলেন মিস্টার ওয়ার্ড। ছেলে এখনো বাড়ী ফেরেনি। তবে ডক্টর অ্যালেন ফোন করেছিলেন। বলেছেন, চার্লস হঠাৎ প্ল্যান পালটেছে। এখন থেকে পটুক্সেট খামারবাড়ীতেই থাকবে এবং এই সময়ে তাকে যেন একদম বিরক্ত করা না হয়। ডক্টর অ্যালেনকেও বাইরে যেতে হচ্ছে—কাজেই সব কাজ একা চার্লসকেই করতে হবে। ডক্টর অ্যালেনের গলা সেই প্রথম শুনলেন মিস্টার ওয়ার্ড। শুনে ইস্তক বুক কাঁপছে তাঁর। কারণটা কিন্তু বুঝতে পারছেন না। মনে

হচ্ছে যেন এরকম গলা কোথাও শুনেছেন, কিন্তু পলাতক স্মৃতি ধরা দিচ্ছে না কিছুতেই।

মহা ফাঁপরে পড়লেন ডক্টর উইলেট। চিঠিতে চার্লস স্পষ্ট লিখেছে পৈশাচিক আবিষ্কার করে এখন সে পস্তাচ্ছে, পটুক্সেট খামারবাড়ীতে আর কোনোদিন যাবে না। অথচ এখন গিয়ে বসে রয়েছে সেখানেই। চিঠিখানা ফের পড়লেন ডাক্তার। ছত্রে ছত্রে যে আতংক আর আকুতি, তা পাগলের পাগলামি নয়। সুস্থ মস্তিষ্কে লেখা। অথচ এই চিঠির পরেও সে রহস্যের কেল্লা ঐ পটুক্সেট খামারবাড়ীতেই পালিয়ে গেল ডাক্তারের সঙ্গে দেখা না করে।

সাত দিন চার্লসের অদ্ভুত আচরণ নিয়ে ভাবলেন ডাক্তার। ইতিমধ্যে টাইপ করে চার্লস চিঠি লিখে জানিয়েছে বাবা আর মাকে, ভাবনার কোন কারণ নেই, সে ভালই আছে। চিঠির ভাষা সড়গড় নয়, আড়ষ্ট। দুর্বোধ্য সেকেলে শব্দে ভারাক্রান্ত। দেখেশুনে ডাক্তার ঠিক করলেন চার্লসের সঙ্গে দেখা করবেন পটুক্সেট খামারবাড়ীতেই। আজ পর্যন্ত ও অঞ্চলে ওয়ার্ড ভবনের কেউ যায়নি, কিন্তু উনি যাবেন। যাবেন দুটি কারণে; দেড়শ বছর আগেকার জোসেফ কারওয়েনের কুকর্ম-কুখ্যাত ঘাঁটি স্বচক্ষে দেখবেন; সেইসঙ্গে চার্লসকে জিজ্ঞেস করবেন চিঠিতে সাহায্য প্রার্থনা করে পালিয়ে আসা হল কেন।

সুতরাং বুক ঠুকে গাড়ী নিয়ে রওনা হলেন ডাক্তার। পটুক্সেট খামারবাড়ী কৌতূহলবশে এতদিন দূর থেকে দেখেছেন, কাছে যাননি। এখন এগোলেন সেইপথ ধরে, যে পথে একশ সাতান্ন বছর আগে শখানেক লোক মৃতুপণ করে এগিয়েছিল জোসেফ কারওয়েনকে জাহান্নমে পাঠানোর জন্যে।

লোকালয় থেকে দূরে বিজন প্রান্তরে ঈষৎ উঁচু জমির ওপর দেখা গেল বহু কিংবদন্তীর উৎস পটুক্সেট খামারবাড়ী। নুড়ি বিছানো পথের নীচে গাড়ী রেখে খড়্মড়্ শব্দে ওপরে উঠলেন ডাক্তার। কড়া নাড়লেন সশব্দে এবং পর্তুগীজ মুলাটো দরজা ফাঁক করতেই হেঁকে বললেন, চার্লসের সঙ্গে জরুরী কথা আছে। দেখা করতে না চাইলে চার্লসের বাবাকে ডেকে আনবেন। মুলাটো ভ্রূকুটি করে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছে দেখে ফাঁকে পা গলিয়ে দিলেন ডাক্তার এবং চেঁচিয়ে উঠলেন বাজখাঁই গলায়। অমনি ভেতর থেকে ঘসঘসে ফিসফিসানির সুরে কে যেন বললে—"টনি, আসতে দাও ওঁকে। হেস্তনেস্ত হয়ে যাক আজ।" শুনেই কেন যে বুকটা ছাঁৎ করে উঠেছিল ডাক্তারের, কিছুতেই তখন

বুঝতে পারেননি। ভীষণ চমকে উঠলেন এরপর যখন দেখলেন কণ্ঠস্বরের অধিকারী তাঁরই একান্ত পরিচিত চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড।

চার্লসের সঙ্গে সেদিন ডাক্তার যা কিছু বলেছিলেন, তার প্রতিটি অক্ষর মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। চার্লসের প্রকৃত উম্মত্ততার শুরু নাকি টাইপ করে বাবা-মা'কে চিঠি লেখা থেকে। চিঠির ভাষা সুপ্রাচীন—যে ভাষা নিয়ে এই সেদিনও চর্চা করেছে চার্লস। মাঝে মাঝে আধুনিক হওয়ার চেষ্টা আছে বটে শব্দ চয়নের মধ্যে—কিন্তু তা অচিরে হারিয়ে গিয়েছে সেকেলে অপ্রচলিত বাক্যবিন্যাসের আড়ালে। ছেলেবেলা থেকে পুরাতত্ত্ব নিয়ে মেতেছিল চার্লস। আচম্বিতে সেই পুরাতত্ত্বই যেন মাথা চাড়া দিয়েছে মনের সংগোপন থেকে।

হঠাৎ প্রাচীন-হয়ে-যাওয়া চার্লসের কথাবার্তা শুনে নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারলেন না ডাক্তার। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে সেকেলে কায়দায় ডাক্তারকে দোরগোড়া থেকে অন্ধকার ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল চার্লস। নিজে বসেছিল একটা প্রায়ান্ধকার কোণে। ঘসঘসে ফিসফিস কণ্ঠে বলেছিল, নদীর স্যাঁৎসেঁতে ঠাণ্ডায় গলা বসে গিয়ে এই কাণ্ড হয়েছে। গলা ছেড়ে কথা বলা যাচ্ছে না। যাক গে, ডাক্তার যখন এসেছেন, রোগও পালাবে। কাজেই বাবার আর আসার দরকার নেই।

তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চার্লসের মুখ দেখবার চেষ্টা করেছিলেন ডাক্তার আর কানের মধ্যে গেঁথে নিচ্ছিলেন অদ্ভুত উচ্চারণের সেকেলে শব্দগুলো। মুখ দেখা যাচ্ছিল না স্পষ্ট, তা সত্ত্বেও গা শিরশির করছিল তাঁর। মনে পড়ল, চার্লসের চাউনি দেখে ওয়ার্ডভবনের একজন খাস চাকর নাকি চাকরী ছেড়ে পালিয়েছে এই সেদিন। খড়খড়ি তুললে মুখখানা ভাল করে দেখা যেত। কিন্তু সে কথা না বলে ধীর স্থির কণ্ঠে শুধোলেন ডাক্তার, সাত দিন আগে অত ভয় পেয়ে চিঠি লেখা হয়েছিল কেন।

চার্লস বললে—"খেটে খেটে নার্ভ দুর্বল হয়ে পড়েছিল বলে। শরীর এমনিতে ভেঙে পড়েছে, এতদিনের গবেষণায় মাথারও ঠিক নেই। তার ওপর বাড়ীতে গোয়েন্দা বসিয়েছেন বাবা। কি জাতীয় গবেষণা নিয়ে এত বছর আমি ব্যস্ত, আপনি তা জানেন। লোকে আমাকে মন্দ বলে। ভাল কি মন্দ সেটা আর ছ মাসেই টের পাইয়ে দেব।"

"আপনি হয়তো জানেন পুরাকালের বহু ব্যাপার আমার মুখস্ত। ইতিহাস যা জানে না···আমি তা জানতে পারি। এ বিদ্যে আরও ভাল জানতেন আমার পূর্বপুরুষ। কতকগুলো মূর্খ তাঁকে খুন করে দেশের ক্ষতি করেছিল। সে বিদ্যে আমার মধ্যেও জেগেছে—কিন্তু এবার আর আমার

গা ছুঁতেও কাউকে দেব না। যা লিখেছি, ভুলে যান। ডক্টর অ্যালেন অত্যন্ত ভাল লোক। কাজের ব্যাপারে উনি আমার সঙ্গে পাল্লা দেন। ঈর্ষার বশে তাই মাঝে মাঝে রক্ত চড়ে যায় মাথায়। তবে উনি ছাড়া আমার গতিও নেই।"

ডক্টর উইলেট সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করলেন এ যেন আরেক চার্লসের সঙ্গে কথা বলছেন। বদ্ধ উন্মাদ না হলে এ ভাবে অতীতের লুপ্ত ভাষায় কেউ কথা বলে না। বিলুপ্ত বিষয় নিয়ে গড়গড়ে করে কথা বলতে পারে না। পরীক্ষা করার জন্যে চার্লসের ছেলেবেলার কয়েকটা ব্যাপার নিয়ে কথা শুরু করলেন। দেখলেন, কি এক আশ্চর্য দুর্ঘটনায় চার্লসের মন থেকে তার আশৈশব স্মৃতি একেবারেই মুছে গেছে—আধুনিক যুগের সব কিছুর নির্বাসন ঘটেছে---জেগে উঠেছে পুরাকাল। চার্লসের সমস্ত সত্তায় যেন বিরাজ করছে এমন একটা যুগের স্মৃতি আর আচরণ---যা মহাকালের গর্ভে বিলীন হয়েছে বহু শত বছর আগে। সব চাইতে আশ্চর্য ব্যাপার। চার্লস তার এই অতীতে ফিরে যাওয়া অবস্থাটা গোপন করবার চেষ্টা করছে---কিন্তু ব্যর্থ হচ্ছে বার বার। কথা বলছে অনিচ্ছার সঙ্গে---ডাক্তার বিদেয় হলেই যেন বাঁচে। কিন্তু নাছোড়বান্দা ডাক্তার খামারবাড়ী ঘুরে দেখতে চাইলেন। তৎক্ষণাৎ চার্লস তাঁকে নিয়ে গেল চিলেকোঠা থেকে পাতাল কুঠরী পর্যন্ত। বাইরের ঘরে লাইব্রেরী দেখে খটকা লাগল ডাক্তারের। ল্যাবোরেটরীও কেমন ফাঁকা ফাঁকা। লাইব্রেরীটা খান কয়েক বই দিয়ে সাজানো---যেন লোককে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে। নিঃসন্দেহে এর চাইতে বড় লাইব্রেরী আর ল্যাবোরেটরী কোথাও আছে।

যাই হোক, শহরে ফিরে চার্লসের বাবাকে সব বললেন ডাক্তার। দুজনেই ঠিক করলেন এখুনি চট করে কিছু করাটা হঠকারিতা হবে। অপেক্ষা করা যাক। মিসেস ওয়ার্ডকেও কিছু জানানো এখন সঙ্গত হবে না---শক্ সইতে পারবেন না।

তবে এরই মধ্যে একদিন একরকম জোর করেই ছেলের সঙ্গে কথা কয়ে এলেন মিস্টার ওয়ার্ড। ডক্টর উইলেট গাড়ী করে তাঁকে নিয়ে গিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে রইলেন বাইরে। কিছুক্ষণ পরে মিস্টার ওয়ার্ড বেরিয়ে এলে দেখলেন মুখ তাঁর সাদা হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, ছেলে তাঁর সঙ্গেও কথা বলেছে ঐ রকম অদ্ভুত বসে যাওয়া গলায়। নদীর হাওয়ায় নাকি গলার বারোটা বেছে গিয়েছে। মিস্টার ওয়ার্ড কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারছেন না গলার স্বরটা। বোঝাতেও পারছেন না কেন

তার চামড়ার তলা পর্যন্ত শিউরে উঠছে কানে লেগে থাকা ফিসফিসানি মনে করলেই।

হাড়ে হাড়ে বুঝলেন, এতদিনে ছেলে তার সত্যিই পাগল হয়েছে। খোঁজখবর নিয়ে জানলেন চার্লসের ইদানীংকালের আচরণ মোটেই সুবিধের নয়। ভ্যামপায়ারের উপদ্রব বেড়েই চলেছে। অনেক বিচিত্র রহস্যের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে এই খামারবাড়ী। রাতবিরেতে কোথায় যায় চার্লস? গভীর রাতে অত লরী আসে কেন? লম্বা লম্বা বাক্স লরী থেকে খামারবাড়ীর ভেতরে পাচার হয় কেন? মুলাটো চাকরটা অত কাঁচা মাংস আর টাটকা রক্ত কশাইয়ের দোকান থেকে নিয়ে যায় কেন? প্রাণী তো মোটে তিনজন—অত মাংস আর রক্ত খায় কে?

এ ছাড়াও আছে গভীর রাতে মাটির তলায় স্তোত্র পাঠের একখানা একঘেয়ে শব্দ। পাতালপুরীতে কোথায় যেন বলিদান পর্ব এবং আহ্বান ক্রিয়া চলেছে বিরামবিহীনভাবে। দেড়শ বছর আগে নাকি ঠিক এই রকম আওয়াজ উঠে আসত জোসেফ কারওয়েনের আমলে। তখন পাতালে ছিল বহু রন্ধ্র, কক্ষ, সুড়ঙ্গ। সে সব এখন কোথায়? কারা এখন সেখানে ঘাঁটি গেড়েছে? বৃথাই ডাক্তার নদীর ধারে গিয়ে সেই দরজাটা খুঁজলেন—কিন্তু পেলেন না।

৪

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই জাল চেকের পর জাল চেক পেঁছতে লাগল বিভিন্ন ব্যাঙ্কে। ব্যাংক থেকে কর্তা ব্যক্তিরা দৌড়ে এলেন পটুক্সেট খামারবাড়ীতে। চার্লসকে তাঁরা চেনেন, হৃদ্যতাও আছে। জিজ্ঞেস করলেন, এ সব কি ব্যাপার? হঠাৎ হাতের লেখা পালটে গেল কেন? সইটা অন্যরকম কেন? চেক জাল যেই করুক না কেন, জালিয়াতির কিসসু জানে না সে। ব্যাপারটা কি?

চার্লস প্রায়ান্ধকার ঘরে বসে মাথা নাড়তে নাড়তে বললে ঘসঘসে ফিসফিসানির সুরে—"কি করব বলুন, স্নায়ুর ওপর মারাত্মক চোট পড়েছে। হাত তাই কাঁপছে। আগের লেখা একদম লিখতে পারি না—চেষ্টা করি—আপনাদের মনে হয় জালিয়াতি। সেই দুঃখেই তো বাবা আর মা'কে পর্যন্ত টাইপ করে চিঠিপত্র লিখেছি—পাছে ওরাও ভাবেন জাল চিঠি।"

এরপর আর কিছু বলার থাকে না। কিন্তু খটকা গেল না মন থেকে। পুরো ব্যাপারটা কেমন জানি গোলমেলে। রীতিমত সন্দেহজনক। দুদিন আগেও কোন ব্যাংকে কত টাকা আছে, চার্লস মুখে মুখে বলে দিতে পারত। হিসেব মুখস্থ ছিল। কিন্তু এখন নেই। স্মৃতি পুরোপুরি লোপ পেয়েছে মস্তিষ্ক থেকে। এ কেমনতর অসুস্থতা? কথাবার্তাও বিদঘুটে। জোর করে প্রাচীন সাজবার চেষ্টা। কথার টান মোটেই একেলে নয়—সেকেলে। শব্দগুলোও এখন আর চলে না—পুরোনো পুঁথিতে মানায়। মাঝে মাঝে উলটো-পালটা দু'চারটে আধুনিক শব্দ এসে যাওয়ায় একটা উদ্ভট জগাখিচুড়ি ভাষা কানে পীড়া জাগায়। এমন কেন হল? রোগটা সত্যিই গুরুতর মনে হচ্ছে। চার্লসের বাচনভঙ্গীই শুধু নয়, অঙ্গভঙ্গী পর্যন্ত মান্ধাতার আমলের—এখন একেবারেই অচল—ঐতিহাসিক নাটকেই কেবল দেখা যায়। ব্যাপারটা বাস্তবিকই গুরুতর। চার্লসের বাবার সঙ্গে কথা বলা দরকার। অনেক টাকার ব্যাপার তো।

চার্লসের বাবা সব শুনে ডেকে পাঠালেন ডক্টর উইলেটকে। ব্যাংকের লোকের সঙ্গে তিনি বসলেন দীর্ঘ অধিবেশনে। চেকগুলো দেখলেন। হাতের লেখা সত্যিই প্রাচীন—যেন ক্ষুদে ক্ষুদে কাঁকড়া সাজানো হরফের আকারে। কিন্তু বড় চেনা মনে হল হস্তাক্ষর। কোথায় যেন দেখেছেন এর আগে। চার্লস এখন সত্যিই বদ্ধ উন্মাদ। কিন্তু উন্মাদকে দিয়ে তো টাকা পয়সার লেনদেন করা যায় না।—দরকার চিকিৎসার। এই সেদিন চার্লস নিজের হাতে চিঠি লিখেছিল তাঁকে—চেকের হাতের লেখার সঙ্গে সেই লেখার আকাশ-পাতাল তফাৎ। রাতারাতি স্নায়ু-বৈকল্য ঘটেছে—হাতের লেখা, বাচনভঙ্গী, অঙ্গভঙ্গী—সব পালটে গিয়েছে।

বড় বড় ডাক্তারদের ডেকে পাঠালেন ডক্টর উইলেট। তাঁরা সব শুনলেন, চার্লসের পড়ার ঘর দেখলেন। তারপর বললেন, একনাগাড়ে দীর্ঘদিন পুরাতত্ত্ব নিয়ে নিবিষ্ট থাকার ফলে পাগল চার্লস এখন নিজেকে প্রাচীন আমলেরই একজন মনে করছে। হাল আমলের সব ছাপ মুছে গেছে মস্তিষ্ক থেকে। রোগটা বিচিত্র—নজীরহীন। তাই বাংলোয় গিয়ে রোগীকে চাক্ষুস দেখা দরকার।

৮ই মার্চ বৃহস্পতিবার মনের ডাক্তারদের নিয়ে ডক্টর উইলেট হাজির হলেন বাংলো বাড়ীতে। চার্লসকে খবর দেওয়া হল মুলাটো মারফৎ। কিন্তু বসতে হল অনেকক্ষণ। ইতিমধ্যে নাকে ভেসে এল হরেক রকম

উগ্রকটু তেজালো ঝাঁঝালো গন্ধ। তারপরে আবির্ভূত হল চার্লস। বিষম বিরক্ত এবং উত্তেজিত। সারা গায়ে সেই সব বিচিত্র গন্ধ। ডাক্তারদের অভিপ্রায় শুনে স্থির হয়ে বসল চার্লস। এত সুন্দরভাবে প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেল যে উন্নত বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা না করে পারলেন না ডাক্তাররা। চার্লস বদ্ধ উম্মাদ হতে পারে—কেন না তার কথাবার্তা চলাফেরা সবই খাপছাড়া—কিন্তু তার ব্রেন উঁচু দরের। প্রতিটি প্রশ্নের জবাব সে দিলে—এড়িয়ে গেল না। এ বাড়ী থেকে অন্যত্র তাকে যেতে হবে শুনে বাধা দিল না। দেখে-শুনে বেশ ধাঁধায় পড়লেন বড় ডাক্তাররা। আরও আশ্চর্য লাগল চার্লসের একটা অদ্ভুত আচরণ দেখে। কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে ঘাড় কাৎ করে কি যেন একটা শোনবার চেষ্টা করছিল একমনে।

যাই হোক, তাকে নিয়ে আসা হল কোনানিকাট দ্বীপের হাসপাতালে। চিকিৎসার শুরুতেই কয়েকটি বিসদৃশ ব্যাপার লক্ষ্য করে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ডক্টর উইলেট। যেমন, চার্লসের গায়ের চামড়া আগের মত নেই, কেমন জানি ছাড়াছাড়া---ঠাস বুনন বলতে যা বোঝায়, তা নয়। মেটাবলিজম অর্থাৎ বিপাক স্বাভাবিক নয়। স্নায়ুগুলোও অনুপাত মেনে চলছে না। চার্লসকে তিনি জম্মাতে দেখেছেন। পাছায় জলপাই রঙের এক ধ্যাবড়া জরুল চিহ্ন নিয়ে যার জম্ম, রাতারাতি সেই চিহ্নটি মুছে গিয়েছে তার পাছা থেকে। তার বদলে বুকে একটা মস্ত তিল---কড়া পড়ার মত কর্কশ কালো দাগ---যা চার্লসের বুকে জম্মের সময়ে ছিল না। দাগটা তাহলে এল কোত্থেকে? এই সময়ে তাঁর মনে পড়ল অনেকদিন আগে চার্লস তাঁকে ডাকিনী বিচারের কয়েকটা বিবরণ পড়ে শুনিয়েছিল। ঘটনাগুলো ঘটেছিল নাকি সালেমে। অমাবস্যার নিশুতি রাত্রে শয়তানের চরণ-চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়েছিল যাদের বুকে তাদের নাম---ব্রিগেট এস, জোনাথন এ, সাইমন ও, ডেলিভারান্স ডব্লিউ, জোসেফ সি, ইত্যাদি।

সবচাইতে পিলে চমকানো পরিবর্তনটা এসেছে চার্লসের ডান চোখের ভুরুতে। গভীর একটা কাটা দাগ সেখানে---ঠিক যে রকমটি ডক্টর দেখেছিলেন জোসেফ কারওয়েনের তৈলচিত্রে। তবে কি একই গুপ্তবিদ্যায় দীক্ষিত দুজনে? এই দাগ কি সেই দীক্ষার চিহ্ন? দীক্ষিত দুই পুরুষের মধ্যে ব্যবধান কিন্তু একশো সাতান্ন বছরের? ভাবতেও রোমাঞ্চিত হলেন ডক্টর উইলেট। না জানি কি পৈশাচিক অনুষ্ঠানের অন্তে এইভাবে পুড়িয়ে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে চার্লসের ভুরু।

চার্লসকে হাসপাতালে রেখে ডাক্তাররা যখন এই সব বিস্ময় নিয়ে ভাবিত, ঠিক তখনি বাংলোবাড়ীর ঠিকানায় আসা চিঠিপত্র বাজেয়াপ্ত করবার ব্যবস্থা করে ছিলেন মিস্টার ওয়ার্ড। মার্চের মাঝামাঝি একটা চিঠি এল প্রাহা থেকে ডক্টর অ্যালেনের নামে। চিঠি লিখেছেন সাইমন ও নামে এক ভদ্রলোক। হাতের লেখাটি প্রাচীন---যেন কাঁকড়া আকারের হরফ। বিষয়বস্তু চমকপ্রদ---লোম খাড়া করে দেবার মত। ভাষা---অচল ইংরেজি। এ যুগের নয়।

চিঠিখানা এই ঃ

প্রাহা

এগারোই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮

ভায়া,

জান্তব-চূর্ণ থেকে যা পেয়েছো, এইমাত্র তার বিবরণ পেলাম। সব গুবলেট হয়ে গেল। কবরের স্মৃতিফলক নিশ্চয় পালটাপালটি করা ছিল। বারনাবাস নমুনাটাই এনেছে অন্য বস্তুর। প্রায় এ রকম হয়। তোমার মনে আছে নিশ্চয় ১৭৬৯ সালে কিংস চ্যাপেল গোরস্থান থেকে তুমি কি জিনিস তুলে এনেছিলে। ১৬৯০ সালে ওল্ড বেরিজ পয়েন্ট কবরখানা থেকে অসম্পূর্ণ ভুল বস্তু তোলার ফলে জ্যান্ত বিভীষিকার আক্রমণে খতম হয়ে গিয়েছিল এইচ। ঠিক এই রকম একটা জিনিস ৭৫ বছর আগে মিশর থেকে পেয়েছিলাম আমি---ফলে যে ক্ষতচিহ্নটা আঁকা হয়ে গিয়েছে আমার গায়ে, সেইটাই ঐ ছোকরা দেখে গিয়েছে ১৯২৪ সালে। এর আগেও বলেছি তোমাকে যাকে তুমি কফিনে ফিরোতে পারবে না---কফিন থেকে তাকে জাগিও না। মৃত জান্তবচূর্ণ থেকে অথবা অন্য চক্র বা লোক থেকেও যদি তার আবির্ভাব ঘটার সম্ভাবনা থাকে তাকে সেই লোকে বা সেই চূর্ণের মধ্যেই আটকে রেখে দিও---ইহলোকে আসতে দিও না, বিপদে পড়বে। তোমার কথা যেন থেকে যায়, কিন্তু যার তার হাতে না পড়ে। দশটা কবরের নটারই স্মৃতিফলক পালটে দেওয়া হয়েছে। আজকে এইচ লিখেছে সৈন্যদের উৎপাতে একটু ঝামেলায় পড়েছে সে। ট্রানসিলভানিয়া হাঙ্গারী থেকে রুমানিয়ায় চলে যাওয়ায় খুবই মুস্কিল হয়েছে। কেল্লাবাড়ীতে ঐ সব জিনিসপত্র না থাকলে কোন কালে অন্য জায়গায় ঘাঁটি গাড়ত। এই একটি ব্যাপারে তোমার সঙ্গে ও একমত। পরের বার প্রাচ্যদেশ থেকে পাহাড়ী কবর খুঁড়ে আনা এমন একটা জিনিস পাঠাবো যে খুশী তুমি হবেই। ইতিমধ্যে যদি বি. এফ.

পাও, আমাকে পাঠিয়ে দেবে। ফিলাডেলফিয়ার জি-কে তুমি আমার চাইতে ভাল চেন। যদি পারো ওকেই আগে জাগাও। তবে বেশী কচলাকচলি করতে যেও না---টিঁকিয়ে রেখো---শেষটা আমার ওপর ছেড়ে দিও-- দরকার আছে।

সাইমন ও

মিস্টার জে. সি.

প্রভিডেন্স সমীপেষু

চিঠি পেয়ে ডক্টর উইলেট এবং মিস্টার ওয়ার্ড কিছুক্ষণ হাঁ করে বসে রইলেন। একটু একটু করে ভয়ংকর সত্যটা পরিস্ফুট হল মগজের মধ্যে। পটুক্সেট খামারবাড়ীর চারধারে এত পৈশাচিক কাণ্ডকারখানার মূল তাহলে ডক্টর অ্যালেন—চার্লস নয়। এই কারণেই সুস্থ মস্তিষ্কে লেখা শেষ চিঠিতে চার্লস পুনশ্চ দিয়ে লিখেছিল ডক্টর অ্যালেনকে দেখলেই যেন গুলি করা হয়। যাক, একটা রহস্য পরিষ্কার হল। কিন্তু সেই সঙ্গে দানা বাঁধল আর একটি রহস্য। দাড়িওলা চশমাধারী অ্যালেনকে 'মিস্টার জে. সি' এই নামে উদ্দেশ করা হল কেন? জবাবটা মনের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে এসে গেলেও মুখে বলতে সাহস পেলেন না ডক্টর উইলেট। পৈশাচিক কল্পনারও একটা সীমা আছে। জোসেফ কারওয়েনই স্বয়ং ডক্টর অ্যালেন এ কথা বললে লোকে পাগল বলবে না?

চিঠিখানায় সই দিয়েছেন জনৈক সাইমন ও। তিনি আবার কে? তাঁর সঙ্গে চার বছর আগে নাকি চার্লস গিয়ে দেখা করে এসেছিল। কিন্তু সাইমন ও ওরফে সাইমন ওর্নে নামক আর এক সাক্ষাৎ শয়তান ১৭৭১ সালে সালেম থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। তার হাতের লেখা ডক্টর উইলেট চিনতেন। ওর্নের স্বহস্তে লেখা মন্ত্র আর ফর্মুলার ফটোস্ট্যাট কপি তিনি দেখেছিলেন চার্লসের কাছে। সেই হাতের লেখা আর এই চিঠির হাতের লেখা হুবহু এক—এতটুকু তফাৎ নেই কাঁকড়া আকৃতি হরফে। একশ সাতান্ন বছর পরে আবার কি ভয়াবহ নাটকের সূচনা দেখা দিয়েছে গম্বুজ গির্জে শোভিত শান্তির দেশ প্রভিডেন্সে?

দুজনেই এমন ঘাবড়ে গেলেন যে সেই দণ্ডেই গেলেন হাসপাতালে চার্লসের কাছে। চিঠির কথা পাড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন ডক্টর অ্যালেন আদতে কে, প্রাহায় গিয়ে সে কার সঙ্গে দেখা করেছিল, সালেমের সাইমন বা জেডেডিয়া ওর্নে সম্বন্ধে কি-কি জানা আছে। চার্লস প্রশ্নের জবাবে হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। মৃত বিস্মৃত বহু ব্যক্তির প্রেতাত্মার সঙ্গে নাকি

দহরম মহরম আছে ডক্টর অ্যালেন নামক লোকটির। যারা ওকে চিঠি লিখছে, তাদেরও এই ক্ষমতা থাকা অসম্ভব কিছু নয়, প্রশ্নের জবাবে অশ্বডিম্ব লাভ করে বেরিয়ে আসার পর আসল সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করলেন উইলেট। সুচতুর চার্লস নিজের কোন কথা ভাঙেনি, কিন্তু ওঁদের দুজনের পেট থেকে সাইমন লিখিত উদ্ভট চিঠির প্রতিটি পংক্তি বার করে নিয়েছে। মিস্টার ওয়ার্ডের খটকা লাগল আর একটা কারণে। টেলিফোনে অ্যালেনকে যেভাবে কথা বলতে তিনি শুনেছেন, ঠিক সেইভাবে চার্লসও কথা বলছে কেন ?

মনের ডাক্তাররা অবশ্য এইসব আষাঢ়ে গল্প বিশ্বাস করলেন না। তাঁরা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, একশ্রেণীর বুজরুক এইভাবে লোক ঠকায়। চার্লসকে কব্জায় আনবার জন্যে ডক্টর অ্যালেন প্রাচীন চিঠির কায়দায় কাউকে দিয়ে চিঠি লেখাচ্ছে। পুরো চিঠিটাই জালিয়াতির কারসাজি। চার্লসকে বুঝিয়েছে, দীর্ঘদিনের গবেষণায় সে জোসেফ কারওয়েন হয়ে গিয়েছে। তাঁর সব অলৌকিক ক্ষমতা চার্লসের বর্তেছে। সে এ যুগের অবতার হয়ে গিয়েছে। মন বড় দুজ্ঞের্য় বস্তু। চার্লস মনের ধোঁকায় ভুলে নিজেকে তাই মনে করেছে। পাগলকে প্রতারক শোষণ করছে।

ডক্টর উইলেটের খুঁতখুঁতুনি কিন্তু গেল না। জাল চেকে চার্লসের হাতের লেখা দেখে তাঁর কেমন জানি চেনা চেনা মনে হয়েছিল, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছিলেন না। এখন খেয়াল হল জোসেফ কারওয়েন একশো সাতান্ন বছর আগে প্রায় একই ছাঁদে লিখে গিয়েছিলেন তাঁর স্মৃতি চারণ। হাতের লেখাটা পর্যন্ত কি নকল করেছে উম্মাদ চার্লস ?

সাতুই এপ্রিল আবার একখানা চিঠি এল ডক্টর অ্যালেনের নামে। খামের ওপরকার হাতেই লেখাটা দেখেই গা হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এল মিস্টার ওয়ার্ডের। এ সেই হাতের লেখা যা তিনি দেখেছেন হাচিনসনের সাংকেতিক লিপিতে। চিঠিখানা এসেছে ট্রানসিলভানিয়ার রাকুস থেকে। গালামোহর ভাঙতে গিয়েও তাই থমকে গেলেন উইলেট। তারপর মনের জোর ফিরিয়ে এনে ছিঁড়ে ফেললেন খামের মুখ। ভেতর থেকে বেরোলো আর একখানা লোমহর্ষক চিঠি ঃ

ফেরেংকজি কাসল
মার্চ ৭, ১৯২৮

প্রিয় সি.

গাঁয়ের লোক কেন এত গুজব ছড়াচ্ছে জানাতে এসেছিল কুড়িজন সৈন্য। বলে গেল গর্তগুলো আরো গভীর করে খুঁড়তে। রুমানিয়ার এই সৈন্যগুলোকে একটু মদ আর খাবার গিলিয়ে ট্যাঁকে রাখা যায়। যাঁকে আমি আবাহন করেছিলাম, তিনি এসে বলে গিয়েছিলেন অ্যাক্রোপোলিসে গেলে স্ফিংক্স পাওয়া যাবে। এম. আমাকে সেখান থেকেই পাঁচটা পাথরের শবাধার পাঠিয়ে দিয়েছে। শবাধার থেকে জাগিয়ে ওদের সঙ্গে তিনবার কথা বলেছি। এখান থেকে ওগুলো সোজা পাঠাবো প্রাহাতে এস. ও-র কাছে· ·সেখান থেকে পাবে তুমি। কেন এত কড়াকড়ি তা তুমি জানো। আগের মত তুমি আর বাড়াবাড়ি করছ না শুনে খুশী হলাম। প্রহরীদের শরীরী করে রাখলে মাথা চিবিয়ে খায়। ঝামেলায় পড়লে তখন আর তাল সামলাতে পারবে না। দরকার হলে অন্য কোথাও গিয়ে কাজ চালিয়ে যেও···এখুনি খুন করার দরকার হবে না। অবশ্য আমার মনে হয় না সে পথ তোমাকে নিতে হবে···ওতে হাঙ্গামা অনেক। বাইরের চক্রের ওদেরকে এড়িয়ে যাচ্ছো শুনে প্রীত হলাম। ওতে ঝুঁকি সাংঘাতিক ...ভীষণ বিপজ্জনক। গতবার সেই জিনিসটাকে পুরোপুরি মিলিয়ে দেওয়ার আগে হাত পাততে গিয়ে কি বিপদ ডেকে এনেছিলে ভুলে যেও না। মন্ত্র আর ফর্মুলা জোগাড়ের দিক দিয়ে তুমি দেখছি আমাকেও ছাড়িয়ে গেলে। সাবধান, সেই মন্ত্র যেন অন্য কেউ উচ্চারণ করে না বসে। অবশ্য ঠিক শব্দ ঠিক মত উচ্চারণ করতে না পারলে পরিশ্রমই সার···বলেছেন বোরিলাস। ছোকরা কি হরবখৎ মন্ত্র আওড়াচ্ছে ? ছোঁড়াটা হঠাৎ বেঁকে বসেছে শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। অবশ্য ও যে একদিন বিগড়ে যাবেই তা বুঝেছিলাম পনেরো মাস আগে···যখন আমার কাছে এসেছিল। তবে তুমি জানো এ সব ঢ্যাঁটা ছোকরাদের কিভাবে ঢিট করতে হয়। মন্ত্র আউড়ে মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারবে না। কিন্তু মন্ত্র বলে যাদের জান্তব-চূর্ণ থেকে জাগানো হয়, মন্ত্রবলেই তাদের কেবল জান্তব-চূর্ণে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। তবে তোমার হাতে জোর আছে, সঙ্গে ছুরী পিস্তলও আছে। কবর খোঁড়াও এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। অ্যাসিড দিয়ে গালিয়ে ফেলাও সহজ। দরকার হলে এইভাবেই খতম কোরো ছোঁড়াকে। ও বলছিল তুমি ওকে বি. এফ. দেবে বলেছো। আমিও চাই···পরে। বি. যাচ্ছে তোমার কাছে···অন্ধকারের সেই জগৎ

সম্বন্ধে মেমফিস যা বলেছে, ওর মুখেই শুনতে পাবে। যাকেই আবাহন করো না কেন, হুঁশিয়ার থেকো, আর ঐ ছোঁড়াটাকে নজরে রেখো। বাড়তে দিও না---শেষ করে দেবে। আর তো মোটে বছর খানেক। তারপরেই পাতাল থেকে উঠে আসবে অন্ধকারের বাহিনী---অসাধ্য তখন আর কিছুই থাকবে না। যা চাইব, তাই পাব। আস্থা রেখো আমার ওপর। মনে রেখো, তোমার চাইতে দেড়শ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা আমার আর ওর্ণের।

ইতি
এডওয়ার্ড এইচ

মিস্টার জে. কারওয়েন
প্রভিডেন্স সমীপেষু

বুক কাঁপানো এই চিঠির কথা স্রেফ চেপে গেলেন ডক্টর উইলেট এবং মিস্টার ওয়ার্ড। মনের ডাক্তারদেরও কিছু বললেন না। কিন্তু ডক্টর অ্যালেন সম্পর্কে কথাগুলো ঢেকে রাখা গেল না। চোখে চশমা, গালে দাড়ি রহস্যময় এই আগন্তুক কোত্থেকে এসেছে কেউ জানে না। কিন্তু তাকে জামাই আদরে পটুক্সেটে রেখেছে চার্লস। তার দুজন প্রাণের বন্ধু আছে দূর-বিদেশে···দু'জনেই দুটি মূর্তিমান প্রহেলিকা···নিজেদের বহু যুগ আগে জীবিত পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিক পুরুষের অবতার মনে করে। চার্লস বিদেশ বেড়াতে গিয়ে এই দুজনের সঙ্গেই দহরম-মহরম করে এসেছে। ডক্টর অ্যালেন নিজেও নিজেকে অবতার বলে মনে করে··· অর্থাৎ জন্মান্তরিত জোসেফ কারওয়েন। আর ডক্টর অ্যালেন নাকি এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

এই পর্যন্ত অলীক কল্পনা মনে করে উড়িয়ে দিলেই নিশ্চিন্ত থাকা যেত। কিন্তু উড়ে এসে জুড়ে বসা ডক্টর অ্যালেন চার্লসকে জবাই করার ফিকিরে আছে। এই খবর পেয়ে আর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা গেল না। ডিটেকটিভদের ডেকে কাজ বুঝিয়ে দিলেন মিস্টার ওয়ার্ড। মিচকেপোড়া মহাভয়ংকর ডক্টর অ্যালেনের ঠিকুজীকোষ্ঠী বার করতে হবে। পটুক্সেট খামার বাড়ীতে যে ঘরে অ্যালন থাকত, সেই ঘরটি তালা দিয়ে আসা হয়েছিল চার্লসকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়ে। চাবিটা বার করে দিলেন মিস্টার ওয়ার্ড। কথাবার্তা বললেন চার্লসের পুরোনো লাইব্রেরী ঘরে দাঁড়িয়ে। গা ছমছম করতে লাগল কি সেই কারণেই? ঘরটায় জোসেফ কারওয়েনের প্রতিকৃতি আর নেই···কিন্তু তার অদৃশ্য

চাউনি যেন থেকে গিয়েছে। অথবা ঘরের বাতাসে এমন সব ভয় দেখানো ভয়ানকরা বাসা নিয়েছে যাদের চোখে দেখা যায় না---কিন্তু শিহরিত লোমকূপ দিয়ে অনুভব করা যায়।

পঞ্চম পর্ব একটি নৈশাতংক এবং একটি মহা-বিপর্যয়

ডক্টর উইলেট রাতারাতি এক যুগ বয়স বাড়িয়ে ফেলেছেন এর ঠিক পরেই একটা ভয়াবহ কদাকার অভিজ্ঞতার পর।

কয়েকটা গুরুতর বিষয়ে তিনি একমত হয়েছিলেন মিস্টার ওয়ার্ডের সঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনার পর। অথচ মনের ডাক্তারের কাছে বলতে পারেন নি পাছে টিটকিরি খেতে হয় বলে।

দু'জনেই অন্তর দিয়ে বুঝেছিলেন বিশ্বব্যাপী এক মহা-ভয়ংকর ষড়যন্ত্র চলেছে সালেম-কেলেংকারীর অনেক আগে থেকে। ক্রূর কুটিল এই আন্দোলনের বয়স যে কত, তা সঠিক অনুমান করা কঠিন। তবে পিশাচ-তন্ত্র ধরা পড়ার কয়েকশ' বছর আগে থেকে তো বটেই। অন্ততঃ দুজন ব্যক্তির নাম তাঁরা জানেন, সে নাম মুখে না আনাই মঙ্গল, যারা ১৬৯০ খৃস্টাব্দ কি তারও আগে থেকে সক্রিয়। তারা শতাব্দীর শাসন মানে না, প্রাকৃতিক নিয়মের নিগড় তাদের কাছে পরাজিত, বহু-যুগ বহু-শতাব্দীর ওপর থেকে তারা একই মন আর একই ব্যক্তিত্ব নিয়ে আজও সক্রিয়। এদের লক্ষ্য কি, চিঠিপত্র থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। চার্লস তাদের আন্দোলনে সাহায্য করেছে। তারা পৃথিবীর সব কবর-খানা থেকে লুঠ করে আনছে এমন সব মহামানব, অতিমানব বা পিশাচ-গুরু মহাভয়ংকরদের দেহসার যারা এককালে মহাজ্ঞানী অথবা শয়তান-শিরোমণি রূপে খ্যাতি বা কুখ্যাতি অর্জন করেছে পৃথিবীতে।

শতাব্দী-সঞ্চিত কফিন-ধুলো থেকে তারা তিল তিল করে জ্ঞান ও শক্তি আহরণ করে চলেছে। বহু শতাব্দীর বহু-মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা জ্ঞান ও শক্তি কেন্দ্রীভূত হচ্ছে একজন বা দুজনের মধ্যে যা এর আগে কখনো হয় নি, সম্ভব ছিল না।

এরা অত্যন্ত করাল কুৎসিত পন্থায় সজীব রেখেছে নিজেদের মস্তিষ্ককে, জয় করেছে জরাকে, মহাকালের ভ্রূকুটিকে তারা ভয় পায় না। কখনো একই দেহে, অধিষ্ঠিত হয়ে চালিয়ে যাচ্ছে কাজ। এরা মড়া জাগায়। মৃত চৈতন্য থেকে জ্ঞান ও শক্তি আকর্ষণ করার গুপ্ত বিদ্যে জানে। প্রাচীন রসায়নবিদ বোরিলাস বলেছিলেন, সারভূত চূর্ণ অথবা

দেহসার অথবা জান্তব-চূর্ণ থেকে অনেক আগে মারা যাওয়া মানুষকেও কবর থেকে তুলে আনা যায়। বিশেষ একটি ফরমুলা বা মন্ত্রপাঠ করলে ছায়াশরীর নিরেট হয়, আরেকটা ফরমুলা বা মন্ত্রপাঠে নিরেট দেহ গলে গিয়ে দেহসার বা জান্তব-চূর্ণে পর্যবসিত হয়। এ মন্ত্র শেখানো যায়—কিন্তু প্রয়োগ করায় ঝুঁকি আছে। কবরখানায় স্মৃতিফলক পালটা-পালটি থাকে। সেক্ষেত্রে মহামানবের বদলে মানব-দানবরা জেগে উঠতে পারে।

শুধু কবর থেকে নয়, অজ্ঞাত অঞ্চল থেকেও অশরীরী বা অমূর্ত কণ্ঠস্বরকে আবাহন করার কালো বিদ্যে পরলোকগত জোসেফ কারওয়েন রপ্ত করেছিলেন। নিষিদ্ধ রহস্য নিয়ে চর্চা করেছিলেন—রহস্যলোকে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। মৃত্যুর বহু পরেও তাঁর অদৃশ্য শক্তি অব্যাখ্যাত উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করেছে হতভাগ্য চার্লসের মনকে—তার মনে পুরাতত্ত্ব চর্চার ঝোঁক জাগিয়েছে। সেই অদৃশ্য নির্দেশেই চার্লস মাঠ-বন-প্রান্তর পেরিয়ে প্রাহা গিয়েছে, ট্রানসিলভানিয়ার পর্বত-দুর্গে এক শরীরী ভয়ংকরের সঙ্গে দীর্ঘকাল থেকে এসেছে। তারপর এক সময়ে জোসেফ কারওয়েনের কবরও খুঁজে পেয়েছে। চার্লসের মা গভীর রাতে ভুল শোনে নি। গুডক্রাইডের ঘটনাও কপোলকল্পনা নয়। সত্যিই সেদিন চার্লসের সঙ্গে চিলেকোঠার বন্ধ ঘরে একজন চাপা গলায় কথা বলেছিল—সিসের কফিন খোলবার পর। ঘসঘসে খসখসে সেই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আর একটি কণ্ঠস্বরের বেশ মিল আছে—ডক্টর অ্যালেনের। তাই স্বকর্ণে টেলিফোনে শুনে ইস্তক ধাঁধায় পড়েছিলেন মিস্টার ওয়ার্ড। কী ভয়ংকর!

গন্ধদ্রব্য পুড়িয়ে মন্ত্রপাঠ করে চার্লস যাকে দেহসার থেকে জাগিয়েছিল, শূন্যগর্ভ ভয়াল কণ্ঠে সে একদিন বলেছিল—'অন্ততঃ তিন মাসের জন্যে লাল থাকা চাই।' লাল মানে কি রক্ত-লাল? ঠিক তার আগে থেকেই ভ্যামপায়ারের উপদ্রব দেখা গিয়েছিল পটুক্সেটে এবং ওয়ার্ড ভবনের ধারেকাছে। কেন? কার এত রক্তপিয়াসা? এজরা উঈডেনের কবর তছনছ করেছিল কে? বহু যুগের ওপার থেকে ফিরে এসে মড়াকে কবর থেকে জাগিয়ে প্রতিহিংসা নিয়েছিল কোন্‌ জন? পটুক্সেটের শয়তানি কাণ্ডকারখানার পীঠস্থানে কে ফিরে গিয়েছে? দাড়িওয়ালা চশমাধারী ডক্টর অ্যালেনকে দেখলে পাড়া প্রতিবেশীর বুক ধড়াশ করে ওঠে কেন? কোনো সন্দেহই নেই আর—মানবদানব জোসেফ কারওয়েনের প্রেতাত্মা সত্যিই আবার দেহধারণ করেছে মাটির পৃথিবীতে। শুরু করেছে

নরহত্যা, রক্তচোষণ এবং পৈশাচিক লীলা ! অ্যালেন একটা মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে এই ব্যাপারে···চার্লস পাগল হয়েছে অ্যালেনের আসার পর। সুতরাং ডিটেকটিভরা লেগে থাকুক তার পেছনে। ইতিমধ্যে ডক্টর উইলেট মিস্টার ওয়ার্ডকে নিয়ে যাবেন পটুক্সেটে—দেখবেন কোথায় আছে পাতাল পুরীর প্রবেশ পথ—পৈশাচিকতা তো সেইখানেই।

ছউই এপ্রিল সকাল সাড়ে সাতটায় গাঁইতি, শাবল আর থলি নিয়ে পটুক্সেট খামার-বাড়ী গেলেন দুজনে। অনেক খোঁজবার পর, অনেকবার ব্যর্থ হওয়ার পর পাতাল ঘরের এক কোণে দেখলেন কতকগুলো কাঠের গামলা—তার পাশে একটা সিমেণ্টের মঞ্চ। সব দেখার পর কোথাও কিছু না পেয়ে মরিয়া হয়ে এই মঞ্চটাই তুলতে চেয়েছিলেন মিস্টার ওয়ার্ড—এবং সত্যিই তা কব্জার ওপর ঘুরে গিয়েছিল ওপর দিকে। তলায় দেখা গিয়েছিল একটা ম্যানহোল। ম্যানহোল ফাঁক করতেই ভক্ করে বিষবাষ্প এসে লাগল নাকে—টলে পড়ে গেলেন মিস্টার ওয়ার্ড। ডক্টর উইলেট তৎক্ষণাৎ তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে আনলেন বাইরে—গাড়ী চাপিয়ে রেখে এলেন বাড়ীতে।

ফিরে এসে এসে নাকে তুলো চাপা দিয়ে ইলেকট্রিক টর্চের আলো ফেললেন ম্যানহোলের মধ্যে। বিষবাষ্প তখন অনেকটা বেরিয়ে গিয়েছে। দেখা গেল একটা চোঙার মত সিমেণ্টের কূপ—দশ ফুট গভীর। একটা লোহার মই নেমে গেছে কূপের তলদেশে—সেখানে দেখা যাচ্ছে খুব সেকেলে পাথরের একসার সিঁড়ি—নেমে গেছে আরো পাতালে।

২

ডক্টর উইলেট মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন, কারওয়েন-কিংবদন্তী মনে পড়তেই দুর্গন্ধময় পাতাল কূপে নামতে মন চায় নি তাঁর। মনে পড়েছিল লুক ফেনার বর্ণিত শেষের সেই রাত্রের অবিশ্বাস্য ঘটনাবলী। কিন্তু কর্তব্য শেষ পর্যন্ত তাঁকে নামিয়েছে পাতাল কূপে। সঙ্গে নিয়েছেন একটা মস্ত থলি—কাগজপত্র পেলে ওর মধ্যে রাখবার জন্যে। তারপর লোহার মই বেয়ে আস্তে আস্তে নীচে নামবার সময়ে দেখেছেন শতাব্দী সঞ্চিত সবুজ শ্যাওলা পুরু হয়ে জমে রয়েছে পাথরের দেওয়ালে। পায়ের তলায় শ্যাওলা সমাকীর্ণ পিচ্ছিল পাথুরে সিঁড়ি ঠেকতেই টর্চের আলোয় পথ দেখে নেমেছেন আরো নীচে। সিঁড়িটা খুবই সরু—পাশাপাশি

দুজনের বেশী যাওয়া যায় না। ঘোরানো নয়—সিধে নামতে নামতে তিনবার অতর্কিতে বেঁকেছে। তিরিশটা পর্যন্ত ধাপ তিনি গুনে ছিলেন। তারপর খুব মৃদু একটা শব্দ কানে ভেসে আসতেই ধাপ গোনার কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

শব্দটা যেন নরকের কোলাহল। অতিশয় নিম্নগ্রামে নারকীয় গোঙানি। চাপা কাতরানিও বলা যায়। অথবা অভিশপ্ত গজরানি অথবা মনবুদ্ধিহীন মাংসপিণ্ডের সম্মিলিত নিষ্ফল দাঁত কিড়মিড়ানি। সে শব্দ শুনলে কিসসু বোঝা যায় না···কিন্তু অন্তরাত্মা পর্যন্ত হিম হয়ে যায়।

চার্লসকে যেদিন মনের ডাক্তাররা পটুক্সেট থেকে আনতে গিয়েছিলেন, সেদিন কথা বলতে বলতে থেমে গিয়ে ঘাড় কাৎ করে কি যেন শোনবার চেষ্টা করেছিল যেন। সেটা কি এই শব্দ? শব্দটা আসছে চারিদিক থেকে··· নির্দিষ্ট কোনো দিক থেকে নয়। এ রকম অপার্থিব শব্দ এর আগে কখনো শোনেন নি ডাক্তার। টর্চের আলোয় শেষ ধাপে পা দেওয়ার পর দেখলেন দানবীয় খিলেনের পর খিলেন। অসংখ্য অন্ধকার-ময় প্রকোষ্ঠ দুই পাশে। উনি দাঁড়িয়ে আছেন একটা প্রশস্ত গলিপথে। চওড়ায় দশ বারো ফুট···খিলেন আকারের ছাদ চোদ্দ ফুট উঁচু। পায়ের তলায় কুচো পাথরের মেঝে। দেওয়াল মসৃণ পাথর দিয়ে বাঁধানো। গলি পথের শেষ দেখা গেল না টর্চের আলোয়। দুপাশের খিলেনের তলায় মাঝে মাঝে কাঠের তক্তা মারা পেল্লায় দরজা।

একটির পর একটি দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিতে লাগলেন ডাক্তার। অধিকাংশই ফাঁকা। কয়েকটিতে অদ্ভুত গড়নের ভাঙা যন্ত্রপাতি। প্রায় প্রতিটিতে ঘর গরম করার চুল্লী এবং চিমনি ··নির্মাণ কৌশল তারিফ করার মত। যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে এককালে জোসেফ কারওয়েন অনেক এক্সপেরিমেণ্ট করেছিলেন···কিন্তু ভেঙ্গে চুরে ফেলে গিয়েছে হানাদাররা। সর্বশেষ প্রকোষ্ঠ কিন্তু টেবিল, চেয়ার, আলমারি দিয়ে সাজানো। সাম্প্রতিক বসবাসের চিহ্ন সুস্পষ্ট। প্রাচীন এবং আধুনিক বিস্তর কাগজপত্র সাজানো টেবিলে, তাকে। রয়েছে অনেকগুলো মোমবাতি আর তেলের বাতি। নিঃসন্দেহে চার্লস এখানে এসে বসত···লেখাপড়া করত। দেশলাই টেবিলেই ছিল। তুলে নিয়ে অনেকগুলো বাতি জ্বাললেন ডাক্তার।

জোরালো আলোয় দেখা গেল আসবাবপত্রের বেশীর ভাগ এ যুগের··· চার্লস বাড়ী থেকে এনেছে···ডাক্তার দেখেই চিনলেন। বইগুলোও

লাইব্রেরীতে দেখেছেন। এইসব দেখে কৌতূহল জাগ্রত হওয়ায় সাময়িক-ভাবে আমল দিলেন না অদ্ভুত সেই গজরানি আর দাঁত কিড়মিড়ির শব্দকে ...শব্দটা এখানে আরো প্রবল। কাগজপত্র হাঁটকাতে লাগলেন। রাশি রাশি কাগজের প্রতিটিতে কিম্ভূত প্রতীকচিহ্ন এবং সংখ্যার সারি। এত সংকেতের অর্থ বুঝতে কয়েক বছর চলে যাবে। এক জায়গায় ওর্নের হাতে লেখা এক বাণ্ডিল চিঠি পেলেন...রাখলেন ব্যাগেয় মধ্যে। পেলেন হাচিনসনের লেখা চিঠিও।

মেহগনী আলমারী খুলতেই পেলেন যা চাইছিলেন—কারওয়েনের নিজের হাতে লেখা ডাইরী। ভ্রমণ বৃত্তান্ত—কারওয়েনের পেণ্টিংয়ের পেছনকার খুপরি থেকে চার্লস যা উদ্ধার করেছিল। রাখলেন ব্যাগের মধ্যে। তারপর কাগজপত্রের হাতের লেখা খুঁটিয়ে দেখলেন এবং স্তম্ভিত হলেন। জোসেফ কারওয়েনের হস্তাক্ষর হুবহু নকল করে ফেলেছে চার্লস। মাস দুয়েকের মধ্যে যা লিখেছে, কারওয়েনের কাঁকড়া আকৃতি হরফে। তার আগে কিছু কাগজ ওর নিজের হাতে লেখা।

কিন্তু পালের গোদা ডক্টর অ্যালেনের হাতে লেখা একখানা কাগজও পাওয়া গেল না। মহা ঘুঘু লোক। নিজে কিছু করেনি—চার্লসকে দিয়ে করাচ্ছে।

নতুন ফাইলে দুটো মন্ত্র দেখতে পেলেন ডাক্তার। দুটোই পাঁচ লাইনের ছোট্ট মন্ত্র। বাঁ দিকের মন্ত্রটা মোটামুটি উল্টো দিক আওড়ালে দ্বিতীয় মন্ত্র হয়ে যায়। পাশাপাশি লেখা দুটি মন্ত্র দুটি অদ্ভুত প্রতীক চিহ্ন দিয়ে ঘেরা। বাঁ দিকের প্রতীক চিহ্নটির নাম—ড্রাগনের মাথা। ডান দিকেরটির নাম—ড্রাগনের ল্যাজ। চিহ্নগুলো চেনা ছিল ডাক্তারের। মন্ত্রের শব্দগুলোও কেমন জানি শুনেছেন বলে মনে হল। বিড়বিড় করে আওড়াতে আওড়াতে যখন প্রায় মুখস্থ হয়ে এসেছে, বিদ্যুৎ ঝলকের মত তখন মনে পড়ল এই শব্দগুলোই না গুডফ্রাইডের দিন শোনা গিয়েছিল বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে ?

মন্ত্রদুটো পাশাপাশি লিখলে এই দাঁড়ায়ঃ

Y'AI 'NG'NGAH	OGTHROD AI'F
YOG-SOTHOTH	GEB'L-EE'H
H'EE—L'GEB	YOG—SOTHOTH
F'AI THRODOG	'NGAH'NG AI'Y
UAAAH	ZHRO

ভাবতেই যেন দম আটকে এল ডাক্তারের। এই মন্ত্র উচ্চারণ করেই জোসেফ কারওয়েনকে যদি জাগিয়ে থাকে চার্লস—তাহলে এই নরককুণ্ডে ও মন্ত্র উচ্চারণ করা আর বিধেয় নয়। বিশেষ করে যখন দূরের গজরানি যেন বেড়েই চলেছে আস্তে আস্তে। কাগজপত্র সব ব্যাগে পুরে টেবিলে রেখে শুধু টর্চটা নিয়ে ডাক্তার রওনা হলেন আরো অতলে··· যেদিক থেকে ভেসে আসছে অপার্থিব গোঙানিগুলো।

যেতে যেতে আরো প্রকোষ্ঠ দেখতে পেলেন ডাক্তার। ঘরের যেন আর শেষ নেই। খিলেনের ফাঁকে ফাঁকে একটা করে ঘর। সে সব ঘরে গাদা করা অবস্থায় পড়ে রয়েছে ভাঙা প্যাকিং কেস আর সিসের কফিন। আশ্চর্য কিছু নয়। সারা পৃথিবী থেকে কফিন আমদানী করেছিলেন কারওয়েন···আস্ত রাখেননি নবরূপী দেবতা বা দানবদের কবর। জাহাজ ভর্তি কাফ্রীদের উধাও করে দিয়েছিলেন·· নাবিকরা এখানে এসেছে আর ফেরেনি। কি বিরাট ভাবে গবেষণা চালিয়েছিলেন ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়।

আচম্বিতে ডাক্তার দেখলেন ডানদিক থেকে একটা চওড়া পাথরের সিঁড়ি ওপরে উঠে গিয়েছে। নিশ্চয় সেই প্রস্তর কারাগারে···যার দেওয়ালে জানলা নেই, আছে কেবল সরু ফুটো। যার ছাদ থেকে একদা আলোর ঝলক ছুটে গিয়েছিল আকাশ পানে।

এগিয়ে চললেন। আচমকা দুপাশের দেওয়াল সরে গেল দূরে। টর্চের আলো ঘুরিয়েও আশে পাশে দেওয়াল দেখতে পেলেন না। শুধু চোখে পড়ল একসারি থাম গোলাকারে সাজানো। ঠিক মাঝখানে একটা বিচিত্র গড়নের পাথরের বেদী। থামগুলো অনেক উঁচুতে ধরে রেখে দিয়েছে ছাদকে। একটা প্রকাণ্ড হলঘরে দাঁড়িয়ে আছেন উনি·· মাঠের মত পেল্লায় পাতাল ঘর···দেওয়ালগুলো এত দূরে যে দেখা যাচ্ছে না।

টর্চের আলোয় পাথরের বেদী দেখতে গিয়ে আঁৎকে উঠলেন ডাক্তার। বেদীর গায়ে বিচিত্র খোদাই কর্মের দিকে একবার তাকিয়েই আর দুবার তাকাতে পারলেন না। বেদীর ওপরে গাঢ় যে বস্তুটি জমে গিয়েছে এবং তরলাকারে বেদীর গা দিয়ে সুতোর মত সরু ধারায় গড়িয়ে পড়েছে—সেটিও তাঁর অপরিচিত নয়। বলিদানের বেদী মূলে দাঁড়িয়ে শিহরিত অন্তরে উপলব্ধি করলেন অত রক্ত কোন হতভাগ্যদের।

আওয়াজটা ভীষণ বেড়ে গিয়েছে। টর্চ নিয়ে উনি দেওয়ালের চেহারা দেখলেন। অগুন্তি অন্ধকারময় প্রকোষ্ঠ নির্মিত হয়েছে পাথরের গায়ে। সামনে লোহার গরাদ। ভেতর দিকে বক্র দেওয়ালের গায়ে লোহার আংটা

আর বেড়ি লাগানো। এখন সে সব আংটা শূন্য। কিন্তু এককালে ওখানে কাদের আটকে নির্যাতন করা হত, কাদের মৃত্যু-গোঙানি পাতাল থেকেও মর্তে গিয়ে পেঁছোতো—নিঃসীম অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তা ভাবতেই লোমখাড়া হয়ে গেল ডাক্তারের। ঠিক এই সময়ে অপার্থিব সেই গোঙানি আর গজরানির শব্দও যেন বেড়ে গেল অকস্মাৎ। সেইসঙ্গে শোনা গেল ক্লেদাক্ত অস্পষ্ট থপথপ শব্দ।

৩

শুধু শব্দ নয়। পাতাল পুরীতে ঢোকবার মুহূর্তে যে বিকট গন্ধটা নাকে এসেছিল, যা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে—এখন তা অত্যুগ্র মাত্রায় আছড়ে পড়ল গন্ধ ইন্দ্রিয়ের ওপর। দম আটকে আসা গন্ধ আর রক্ত জমানো গোঙানি উপেক্ষা করে টর্চের আলোয় পাথরের দেওয়ালে অনেক-গুলো সুড়ঙ্গ দেখলেন ডাক্তার। সিঁড়ি নেমে গেছে আরো পাতালে—ঈশ্বর জানেন কোন নরকে। আর রয়েছে অগুন্তি খুপরি ঘর।

টর্চ নিয়ে পায়চারী করতে করতে হঠাৎ একটা মই দেখতে পেলেন ডাক্তার। যে দুর্গন্ধ পাতাল পুরীর সর্বত্র—মইয়ের গায়ে যেন তা চূড়ান্ত। আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলেন ডাক্তার। পায়ের তলায় পাথর দিয়ে বাঁধানো মেঝের মাঝে মাঝে একটা করে চৌকোনা পাথরে ঝাঁঝরির মত অজস্র ফুটো এবং বমি-জাগানো বিকট গন্ধটা সব চাইতে উগ্র সেইখানেই—আওয়াজও বটে।

পায়ের তলায় ছিদ্রযুক্ত পাথরের নীচে কারা অমন চেঁচাচ্ছে, কাঁদছে, নিষ্ফল রাগে দাঁত কিড়মিড় করছে এবং থপথপ করে পা ঠুকছে দেখবার জন্যে হেঁট হলেন ডাক্তার। পাথরে আঙুল বুলিয়ে দেখলেন খাঁজে আঙুল বসিয়ে পাথরটাকে টেনে তোলা যায়। অতিকষ্টে একটা চৌকানা পাথর তুলে আনবার পরেই পাতাল রন্ধ্র থেকে এমন ঝাঁঝালো পচা গন্ধ আছড়ে পড়ল নাকের ওপর যে আর একটু হলেই মাথা ঘুরে গর্তের মধ্যেই পড়ে যেতেন ডাক্তার—সামলে নিলেন কিনারায় মুখ থুবড়ে আছাড় খেয়ে। অমনি হাঁউমাউ শব্দে একযোগে চেঁচিয়ে উঠল অপার্থিব সেই কণ্ঠস্বরগুলো।

পাথরের ডালাটা এক গজ চৌকোনা। কিন্তু টর্চ ফেলে দেখলেন নীচের গর্তটা চোঙা আকারে পাতকুয়োর মত নেমে গেছে অনেক নীচে।

গর্তের ব্যাস প্রায় দেড়গজ। ইঁটের দেওয়াল। সবুজ শৈবালে আচ্ছাদিত। টর্চের আলো নীচে পর্যন্ত পেঁছোচ্ছে না। কেন না তা প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ ফুট গভীর। কিন্তু গন্ধবিকটের ঠেলায় নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে চাইছে গলা দিয়ে। সেই সঙ্গে বেড়েছে ক্লেদাক্ত থপথপ শব্দ। টর্চের আলো নীচে গিয়ে পড়তেই ভয়ংকর আর্তনাদের পর আর্তনাদে গর্ত যেন ফেটে গেল, নিষ্ফল দেওয়াল আঁচড়ানোর শব্দ ভেসে এল—চেষ্টা করেও পারছে না দেওয়াল বেয়ে উঠতে। নরক গহ্বরের দৃশ্যটা দেখতে না পেলেও কল্পনা করে কেঁপে উঠলেন ডাক্তার। হাত বাড়িয়ে টর্চের আলো আরো নামিয়ে দেখতে চাইলেন পাতাল-ভয়ংকরকে। কিন্তু উন্মাদ অন্ধকার বাধা দিল আলোক রশ্মিকে—আস্তে আস্তে চোখ সয়ে আসতে দেখলেন কালো মতন কি যেন একটা লাফাচ্ছে গর্তের তলদেশে—কিন্তু প্রতিবারেই খড়মড় থপ্-থপাস্ শব্দে পিছলে পড়ে যাচ্ছে দেওয়ালের গা বেয়ে। চার্লস তাকে এই কটা মাস দেখেনি—হাসপাতালে রয়েছে। বুভুক্ষু জীবটা শুতেও পারেনি। সংকীর্ণ গর্তে বসে থাকাই যায়—শোয়া যায় না। মেঝেতে ঝাঁঝরি-পাথর ঢাকা এমনি আরো গর্তের মধ্যে আছে এমনি আরো বিভীষিকা। এই ক'টা মাস তারা স্রেফ বসে থেকেছে অনাহারে—আর কেঁদেছে করুণ বীভৎস কণ্ঠে। নয়ত লাফিয়েছে অশক্ত দুর্বল পায়ে—কেউ আসেনি।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নৈশাতংকে ভুগতেন না ডাক্তার যদি এই পর্যন্ত দেখেই গর্তের মুখে পাথর চাপা দিয়ে দিতেন। চোখ তখন গর্তের অন্ধকারে সয়ে গেছে—দুরন্ত কল্পনাতেও আসে না এমনি একটা মূর্তিমান আতংককে তিনি লাফাতে দেখলেন জমাট অন্ধকারে। তিনি ডাক্তার মানুষ। কাটাছেঁড়া করে অভ্যস্ত। বীভৎসতায় তাঁর স্নায়ু নিষ্কম্প। কিন্তু সেদিন ভূগর্ভ কূপের তলদেশ নিরন্ধ্র তমিস্রার মধ্যে টর্চের ম্লান আভায় যে ভয়াবহ বস্তুটির শুধু দেহরেখা দেখলেন—তা দেখবার পর নিমেষ মধ্যে পাগলা গারদের পাগলদের মত চীৎকার করে উঠলেন গলা চিড়ে—হাত থেকে জ্বলন্ত টর্চ খসে পড়ল গর্তের মধ্যে—শূন্য পথেই তা ব্যাদিত মুখে লুফে নিল নরকের কীটটা এবং কড়মড় আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আলো উধাও হওয়ায় বুঝলেন টর্চের পরিণতি। ডাক্তার তখন চেঁচিয়েই চলেছেন। পাগলের মত অর্থহীনভাবে চেঁচাতে চেঁচাতে সাপের মত বুকে হেঁটে সরে সরে যাচ্ছেন গর্তের কাছ থেকে। শুধু একবার দেখেই কিছুক্ষণের জন্য অন্ততঃ তিনি পাগল হয়েই রইলেন—বুক ঘষটে এগোতে গিয়ে অন্ধকারে কতবার মাথা ঠুকে গেল

দেওয়ালে, আঙুল রক্তাক্ত হয়ে গেল—তবুও চেঁচানি থামল না—বুক ঘষটানি বন্ধ হল না। ওঁর উন্মত্ত চীৎকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কেঁদে পা থপথপিয়ে দেওয়াল আঁচড়ে ভয়ানক ঐকতানের সৃষ্টি করল ডজন ডজন পাতকুয়োর আতংকরা। অনেকক্ষণ চেঁচিয়ে অনেক গড়িয়ে সম্বিৎ ফিরে পেলেন ডাক্তার। ঘামে তখন ভিজে গেছেন। দেশলাই পর্যন্ত কাছে নেই যে আলো জেবলে দেখবেন। অথচ পায়ের তলায় ডজন ডজন অন্ধ-কূপে ওরা এখনও কাঁদছে, লাফাচ্ছে, আঁচড়াচ্ছে এবং ওদের একজনের মাথা থেকে ডালা খুলে রেখে এসেছেন ডাক্তার। মসৃণ দেওয়ালে খাঁজ যদি থাকে, যদি সেই খাঁজে পা দিয়ে নিশার আতংক উঠে আসে……

কিন্তু সেই নৈশাতংকটি দেখতে ঠিক কি রকম, উইলেট তা একবারও বলেননি। বলিদানের রক্তমাখা বেদীর গায়ে যেসব দুরন্ত কল্পনা খোদিত আছে—তাদেরই একটি। প্রকৃতির হাতে সৃষ্টি নয় সে মূর্তি…কেন না তা অসম্পূর্ণ। বিসদৃশভাবে অসমাপ্ত। ঘাটতিগুলো ঠিক কোথায়, তা ভাষায় বোঝানো যায় না। উইলেট শুধু এইটুকুই বলেছেন যে অসম্পূর্ণ দেহসার থেকে যাদেরকে চার্লস আবাহন করেছিল—এরা তারা। জীইয়ে রাখা হয়েছে অন্ধকূপে বলি দেওয়ার জন্যে। ঠিক এমনি কিম্ভূতদেরই দরকার শয়তানের পুজোয়—বেদীর গায়ে নইলে ও মূর্তি খোদাই করা থাকত না। আরও কদাকার মূর্তিও দেখেছেন উনি বেদীর গায়ে… কিন্তু চাক্ষুস দেখবার আগ্রহ ছিল না অন্যান্য পাথর সরিয়ে। সেইমুহূর্তে অবশ্য মনে পড়েছিল সাইমন বা জেডেডিয়া ওর্ণের কটি লাইন:

'কবরখানা থেকে অসম্পূর্ণ ভুল বস্তু আনার ফলে জ্যান্ত বিভীষিকার আক্রমণে খতম হয়ে গিয়েছিল এইচ।'

মনে পড়ল দেড়শ বছর আগেকার আরও একটি ঘটনা। জোসেফ কারওয়েনকে নিধন করার দিনসাতেক পরে মাঠের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল একটা আগুনে পোড়া বীভৎস বিকৃত মূর্তি…আকারে সে মানুষ নয়, জানোয়ারও নয়।

শ্যাওলা-স্যাঁতসেঁতে পাথুরে মেঝেতে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে সামনে পেছনে দুলতে লাগলেন ডাক্তার…মনে মনে আওড়াতে লাগলেন ঈশ্বরের স্তব। তারপর হঠাৎ মাথার মধ্যে ফের ধ্বনিত হল অদ্ভুত সেই জোড়া মন্ত্র…যা একটু আগেই মুখস্থ করে এসেছেন। মন্ত্রদুটি মুখে আসতেই বিড়বিড় করে গেলেন ডাক্তার এবং যেন যাদুমন্ত্রবলে ফিরে এল মনের জোর…শান্ত হল স্নায়ু। উঠে বসে মাটিতে পা ঘষটে ঘষটে এগিয়ে

চললেন আলোর সন্ধানে। আসবার সময়ে অনেকগুলো বাতি জ্বালিয়ে এসেছিলেন। নিশ্ছিদ্র এই অন্ধকারে সেই আলোর ছটা কি দেখা যাবে না? পা বাড়ালেন সেই আশাতেই···প্রতি মুহূর্তে আশংকা হল এই বুঝি গিয়ে পড়লেন ঢাকনি খোলা গর্তের মধ্যে। অতি সন্তর্পণে গিরগিটির মত তাই বুকে হেঁটে চললেন আলোর সন্ধানে। অনেকক্ষণ পরে জমাট আঁধারের এক জায়গায় সত্যিই যেন একটা আলোর আভা দেখতে পেলেন।

এই সময় হাতে ঠেকল সিঁড়ির খানকয়েক ধাপ। নিশ্চয় শয়তান পুজোর সেই রুধিররঞ্জিত বেদীর সিঁড়ি। ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মত অমনি ছিটকে সরে এলেন তফাতে। আর একবারে হাতে ঠেকল সেই আলগা ঝাঁঝরি পাথরখানা—যা তিনি গর্তের মুখ থেকে তুলে সরিয়ে রেখেছিলেন। সেই মুহূর্তে তাঁর মানসিক অবস্থা অবর্ণনীয়। কেঁচোর মত কুঁচকে নিঃসীম আতংকে কাঁপতে কাঁপতে অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে দেখতে লাগলেন গর্তটা কোথায়। বৃথাই অত ভয় পেলেন অবশ্য—কেন না গর্ত থেকে উঠে এল না অন্ধকারের আতংক—নিজেও হড়কে নেমে গেলেন না নরকের গর্তে। গর্তের তলদেশে বন্দী সেই বর্ণনাতীত জিনিসটা নড়াচড়াও করল না—গজরানো তো দূরের কথা। ইলেকট্রিক টর্চ কামড়ে মিইয়ে গেছে নিশ্চয়। ঝাঁঝরি পাথর যতবার হাতে ঠেকল, ততবারই থরথরিয়ে কেঁপে উঠলেন উইলেট। ঝাঁঝরির ওপর দিয়ে নিঃশব্দে বুক টেনে গেলেও বন্দী বস্তুগুলো গুঙিয়ে উঠল প্রতিবার। বহু দূরের আবছা আলোগুলো মনে হল যেন কাঁপছে। উইলেট সভয়ে বুঝলেন, একে একে নিভে যাচ্ছে লম্ফ আর মোমবাতিগুলো। এই জমাট অন্ধকারে সব কটা আলো যদি নিভে যায়, তাহলে পরিণতিটা কল্পনা করে আর বুকে হেঁটে শম্বুকগতিতে যেতে পারলেন না উইলেট। ছিলেছেঁড়া ধনুকের মত তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বেগে ছুটলেন সামনে। এখন ছুটলেও আর ভয় নেই। মুখ খোলা গর্তটা ছাড়িয়ে এসেছেন অনেকক্ষণ। শেষ আলোটা নেভবার আগে যদি পেঁছোতে না পারেন—পাতালপুরীর নিরন্ধ্র অন্ধকারে পথ খুঁজে পাবেন না কোনদিনই। মিস্টার ওয়ার্ড উদ্ধারকারীদের নিয়ে এলে তবে যদি বেরোতে পারেন বাইরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই খোলা চত্বর থেকে এসে পড়লেন প্রশস্ত গলিপথে। দেখতে পেলেন অদূরে একটা দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে আলোকরশ্মি। ছুটতে ছুটতে ঢুকলেন ভেতরে—হ্যাঁ, চার্লস ডেক্সটার

ওয়ার্ডের পড়ার ঘরই বটে। সর্বশেষ লম্ফটা পট্ পট্ শব্দ আরম্ভ করে দিয়েছে নেভবার সময় হয়েছে বলে।

৪

ঝড়ের বেগে সব কটা লম্ফে তেল ঢাললেন তেলের টিন থেকে। তারপর জিনিসপত্র হাঁটকে দেখলেন লণ্ঠনের আশায়। কাজ এখনো শেষ হয়নি। চার্লস কেন পাগল হয়েছে, তা না দেখে তিনি পাতালপুরী ছেড়ে যাবেন না। গবেষণাগারের সন্ধানে যেতে হবে উন্মুক্ত চত্বর পেরিয়ে ওপাশের গা ছমছমে অন্ধকারের মধ্যে—নামতে হবে সুড়ঙ্গ দিয়ে। তাই দরকার জোরালো লণ্ঠন। কিন্তু অনেক খুঁজেও লণ্ঠন না পেয়ে পকেট ভরে নিলেন বিস্তর মোমবাতি আর দেশলাই। একহাতে নিলেন একটা লম্ফ, আরেক হাতে এক গ্যালন তেল।

সৌভাগ্যক্রমে খোলামুখ গর্ত আর বীভৎস বেদীটা যাওয়ার পথে পড়ল না। দূর থেকে লম্ফের আলোয় দেখে দূরে সরে গেলেন। দেওয়ালের গায়ে বক্র খুপরিগুলোয় স্তূপীকৃত বিচিত্র বস্তু দেখে অবাক হলেন। একটা খুপরিতে বিস্তর পোশাকের গাঁটরি তাগাড় করা রয়েছে দেখে এগিয়ে গিয়ে দেখলেন জামাকাপড় সবই দেড়শ বছর আগেকার। আবার পাশের কুঠরিতে গাঁটরি গাঁটরি নতুন জামাকাপড় স্তূপাকারে সাজানো রয়েছে—যেন অগুন্তি বস্ত্রহীনকে বস্ত্র পরানোর আয়োজন সেখানে সম্পূর্ণ। সবচাইতে গা ঘিন ঘিন করল অনেকগুলো পেতলের কড়া দেখে। পেল্লায় কড়াগুলোর গায়ে কদর্য মূর্তি আঁকা। জায়গায় জায়গায় গাদা করা সিসের বাটি দেখে আর বিকট গন্ধ শুঁকে প্রবল ইচ্ছে হল বমি করার। বাটিগুলো আস্ত নেই মোটেই—কিন্তু ভাঙা বাটির গায়েও সেই বিদঘুটে শয়তানি মূর্তি আঁকা এবং দুর্গন্ধের ঠেলায় কাছে ঘেঁষা মুস্কিল। প্রকাণ্ড গোলাকার চত্বরটার অর্ধেক ঘুরে আসার পর দেখতে পেলেন আগের মত আর একটা প্রশস্ত গলিপথ। এই গলিপথের দুপাশে সারি সারি ঘর।

একটার পর একটা ঘর সন্ধানী চোখে দেখতে লাগলেন ডাক্তার। তিনটে মাঝারি সাইজের ঘরে বৃথাই হাল্লাক হলেন—উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু চোখে পড়ল না। চতুর্থ ঘরটি বেশ বড়—আয়তাকার। ঘর বোঝাই জলাধার, টেবিল, আগুনের চুল্লী, আধুনিক যন্ত্রপাতি, বই, লম্বা টানা

তাকে বয়েম এবং বোতল। ল্যাবোরেটরীই বটে—শুধু চার্লসের নয়—জোসেফ কারওয়েনেরও।

তেলভরা তিনটে লম্ফ ছিল টেবিলে। একে একে জ্বালিয়ে নিলেন ডাক্তার। জোরালো আলোয় আতীক্ষ্ন আগ্রহ নিয়ে দেখতে লাগলেন ঘরের জিনিসপত্র। হরেকরকম রসায়ন দ্রব্য থরে থরে সাজানো তাকে। নাম দেখে মনে হল, নিশ্চয় অরগ্যানিক কেমিস্ট্রির বিশেষ কোনো শাখা নিয়ে গবেষণা করছিল চার্লস। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম দেখে এর বেশী বোঝা মুশ্কিল। যেমন একটা প্রকাণ্ড কদাকার লাশ কাটার টেবিল। রাশি রাশি বইপত্রের মধ্যে চেনা বই বলতে কেবল একটাই—বোরিলাসের শতচ্ছিন্ন পাতামোড়া একটি কপি···কালো হরফে ছাপা বইখানির বিশেষ একটি জায়গায় বিশেষ একটি পরিচ্ছেদ কালি দিয়ে বার বার দাগ দিয়ে রেখেছে চার্লস ··ঠিক যেভাবে দেড়শ বছর আগে জোসেফ কারওয়েন সেই বিশেষ পরিচ্ছেদটিতে দাগ দিয়েছিলেন এবং দেখে শিউরে উঠেছিলেন সদাশয় মিস্টার মেরিট। কারওয়েনের সেই বই অবশ্য হানাদাররা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে লাইব্রেরীর অন্যান্য বই নিয়ে বহ্ন্যুৎসবের সময়ে।

ঘর থেকে তিনটে খিলেন পথ গিয়েছে তিন দিকে। শেষে তিনটে ঘর। প্রথম দুটি কারওয়েনের ভাঁড়ার ঘর বললেই চলে···অথবা গুদোম ঘর। ভাঙাচোরা কফিন জড়ো করা স্তূপাকারে। খানকয়েক কফিনপ্লেট আস্ত থাকায় কষ্টেসৃষ্টে নামগুলো পড়েছিলেন উইলেট এবং ক্লেদাক্ত সরীসৃপের মত আতংক পেঁচিয়ে ধরেছিল অবশ অন্তরকে। অবিশ্বাস্য হলেও চোখকে তো অবিশ্বাস করা যায় না। অনেক জামাকাপড়ও জড়ো করা ঘরদুটিতে। রয়েছে পেরেক দিয়ে আঁটা বিস্তর বাক্স···খোলবার সাহস হল না ডাক্তারের। সবচাইতে কৌতূহলোদ্দীপক হল রাশি রাশি ভাঙাচেরা যন্ত্রপাতি। বিদঘুটে, অদ্ভুত দর্শন। এককালে নিশ্চয় জোসেফ কারওয়েনের কিম্ভূত গবেষণার কাজে লেগেছে···হানাদাররা বিজাতীয় ক্রোধে তছনছ করে গিয়েছে যাবার সময়ে। সব কলকব্জাই জর্জিয়ান আমলের ···এ যুগের নয়।

তৃতীয় খিলেনপথ গিয়ে শেষ হয়েছে বেশ বড়সড় সাইজের একটা ঘরে। ঘরের চার দেওয়ালে কেবল তাক আর তাক। মাঝখানে একটা পেল্লায় টেবিলে দুটি লম্ফ। লম্ফদুটি জ্বালিয়ে অত্যুজ্জ্বল আলোয় তাকগুলির দিকে তাকিয়ে তাজ্জব হয়ে গেলেন ডাক্তার। ওপরের তাকগুলি প্রায় শূন্য বললেই চলে। কিন্তু হাতের কাছে নীচের তাকে সাজানো অগুন্তি বোতল। বোতল না বলে বয়েম বলাই উচিত। হরেকরকম নয়···মাত্র

দুরকম। কাঁচের নয়, চীনেমাটির নয়···সিসের। গড়ন অতি বিদঘুটে। কতকগুলোর হাতল নেই···গ্রীসিয়ান লেকিথস্ টাইপের···অর্থাৎ তেলের বয়েম। অন্যগুলোর ধরবার হাতল আছে···গড়ন অনেকটা ফ্যালেরন বয়েমের মত। প্রত্যেকটির মুখ ধাতুর ছিপি দিয়ে কষে আঁটা···সারা গায়ে উঁচু উঁচু হরফের সাংকেতিক লিপি এবং প্রতীক চিহ্ন।

এক নজরেই ডাক্তার বুঝলেন বয়েমগুলো বিভিন্নশ্রেণীতে সযত্নে ভাগ করা। ঘরের একদিকে লেকিথস্ বয়েম···মাথায় কাঠের ফলকে লেখা "কাস্টোডিস্"। আরেক দিকে ফ্যালেরন্ বয়েম···মাথায় কাঠের ফলকে লেখা "মেটিরিয়া"। ওপরের তাকে সাজানো খানকয়েক বয়েম নিশ্চয় শূন্য···তাই তার গলায় সুতোয় বাঁধা কালি দিয়ে লেখা লেবেল ঝুলছে না। কিন্তু বাদবাকী প্রতিটি বয়েমের গলায় কণ্ঠহারের মত ঝুলছে লেবেল এবং প্রতিটি লেবেলে পরিপাটি ভাবে লেখা একটি সংখ্যা··· নিঃসন্দেহে তালিকা অনুযায়ী সংখ্যা, যে তালিকায় লেখা আছে সংখ্যার পাশে নামগুলো।

সেই মুহূর্তে তালিকা না খুঁজে ডাক্তার মন দিলেন বয়েমের ভেতরে। দু'ধরনের বয়েম টেনে নামালেন এবং দেখলেন সব বয়েমের ভেতরেই রয়েছে এক রকমের অতি মিহি অতি হাল্কা গুঁড়ো। বিভিন্ন রঙের গুঁড়ো। ম্যাড়মেড়ে রঙ—কিন্তু তারতম্য আছে। শুধু ঐ রঙ ছাড়া চূর্ণগুলোর চেহারা দেখে বোঝার সাধ্য নেই ওদের মূলগত পার্থক্য। এলোপাতাড়ি বহু বয়েম নামালেন ডাক্তার—কিন্তু রঙের পার্থক্য ছাড়া চেহারায় কোনো পার্থক্য দেখতে পেলেন না। লেকিথসে আর ফ্যালেরনে একই রকমের চূর্ণ—কখনো গোলাপী-সাদা, কখনো নীলচে-ধূসর। সবকটা পাউডারের একটা বৈশিষ্ট্য কিন্তু লক্ষণীয়—হাতে লাগে না। তালুতে ঢেলে দেখবার পর—বয়েমে ফের ঢেলে দিলেন ডাক্তার—কিন্তু কণামাত্র লেগে রইল না তালুতে।

চিহ্ন দুটোর মানে নিয়ে ধাঁধায় পড়লেন উইলেট। ল্যাবোরেটরীর একদিকে এক ধরনের কেমিক্যাল—আর একদিকে আরেক ধরনের কেমিক্যাল। কেন? কেন ওরা সৈন্যবাহিনীর মত সাজানো সারি সারি—গলায় নামাংকিত কবচের মত লেবেল? কেন একদলের মাথায় লেখা 'কাস্টোডিস,' আরেকদলের মাথায় 'মেটিরিয়া'? শব্দদুটো কিন্তু ল্যাটিন—এই পর্যন্ত ভাবপেই বিদ্যুৎ চমকের মত মনে পড়ে গেল ভয়াল রহস্যের পুরোনো একটি অধ্যায়।

ল্যাটিন 'কাস্টোডিস্' মানে গার্ড অর্থাৎ প্রহরী। 'মেটিরিয়া' মানে

মেটিরিয়াল অর্থাৎ বস্তু। প্রহরী শব্দটা রহস্যাবৃত একটা চিঠিতে তিনি দেখেছেন—ডক্টর অ্যালেনকে লেখা বুড়ো থুত্থুরে এডোয়ার্ড হাচিনসনের চিঠিতে। চিঠির একটি লাইন ভোলবার নয়—'প্রহরীদের শরীরী করে রাখলে মাথা চিবিয়ে খায়। ঝামেলায় পড়লে তখন আর তাল সামলাতে পারবে না।' তার মানে? কি বলতে চেয়েছিল থুত্থুরে বুড়ো শনের নুড়ো হাচিনসন? মনে পড়েছে—আরও একটা কথা মনে পড়েছে ডাক্তারের। প্রহরী শব্দটার উল্লেখ আছে আরো এক জায়গায়। চার্লসের মুখে উনি শুনেছিলেন স্মিথ আর উঈডেনের ডাইরী-কাহিনী। কারওয়েনের ওপর দিনের পর দিন নজর রেখে দুই বন্ধু যা দেখেছিল, যা শুনেছিল…তা লিখে রেখেছিল ডাইরীতে। ওরা শুনেছিল পটুক্সেট খামার বাড়ীর ভেতরে বিভিন্ন ভাষায় কারা যেন কথা বলছে, কাদের ওপর উৎপীড়ন করা হচ্ছে। মনে হত যেন খামারবাড়ীর মধ্যে অনেক লোক আছে—'কারওয়েন, অনেক কয়েদী আর কয়েদীদের প্রহরী।' হাচিনসন কি মূর্তিমান বিভীষিকা এই প্রহরীদেরই শরীরী রাখতে বারণ করেছেন? পাছে তারা মাথা চিবিয়ে খেয়ে নেয়? শরীরী রাখার অভিপ্রায় নেই বলেই কি বয়েমের মধ্যে চূর্ণ আকারে তাদের বন্দী রাখা হয়েছে? চূর্ণ মানে, জান্তব চূর্ণ? দেহসার? সারভূত সল্ট? কত মানুষের দেহকে কত নরকংকালকে পিশাচগুরু ডক্টর অ্যালেন চূর্ণ বানিয়ে বয়েমে কয়েদ করে রেখেছে ভাবতেও গা কেঁপে উঠল ডাক্তারের।

এতক্ষণে বোঝা গেল ফ্যালেরন বয়েমের চূর্ণ রহস্য। বহু যুগ বহু শতাব্দীর বহু দানবিক মেধাকে অন্ধকারের ওপার থেকে আহ্বান করার মন্ত্র জানে ডক্টর অ্যালেন। বিবিধ আচার-অনুষ্ঠান যজ্ঞ পুজোর মাধ্যমে অদৃশ্য শক্তিকে দৃশ্যমান করে তোলা হয় বয়েমে বন্দী ঐ চূর্ণের ভেতর থেকে। নারকীয় স্তোত্রপাঠে তারা জেগে উঠে, শরীর ধারণ করে। উৎপীড়নে অত্যাচারে নির্যাতনে শয়তানগুরুর পদানত থাকে—যা বলে তা শোনে—অধীত বিদ্যা, অর্জিত শিক্ষা নিঃশেষে শিখিয়ে দিয়ে যায় মাস্টারকে। একই পন্থায় জাগে লেকিথস্ চূর্ণ থেকে দানবিক প্রহরীরা—মাস্টারের হুকুমে অমানুষিক, অবর্ণনীয় অত্যাচার চালিয়ে যায় শরীরী মেধাদের ওপর—অনিচ্ছাকে ইচ্ছায় পরিণত করে অকথ্য অত্যাচারে। হাতের তালুতে ভয়াবহ সেই চূর্ণ ঢেলেছেন ভাবতেই মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল ডাক্তারের—ইচ্ছে হল সব ফেলে ছড়িয়ে দিয়ে সেই মুহূর্তে ঊর্ধ্বশ্বাসে উধাও হন পাতালপুরী থেকে। মনে হল যেন সারি সারি প্রহরী চূর্ণবন্দী

অবস্থায় কুটিল চোখে নিরীক্ষণ করেছে তাঁকে—ছাড়া পেলেই চিবিয়ে খাবে মাথা। হা ভগবান! লেকিথস্ বয়েমে বন্দী জগতের প্রায় অর্ধেক মহামনীষীর মেধাকে এইভাবে সুপরিকল্পিতভাবে শোষণ করা হচ্ছে বলেই কি চার্লস সজ্ঞানে সর্বশেষ চিঠিতে লিখেছিল—'পৃথিবীপৃষ্ঠের সব কানুনের ইতি ঘটতে চলেছে—এমন কি সৌরজগৎ ও ব্রহ্মাণ্ডের বিপর্যয়ও আসন্ন?' ডক্টর মেরিনাস বিকনেল উইলেট তাদের জান্তব-চূর্ণ হাতে ঢেলে দাঁড়িয়ে আছেন! ধুলো দেখেও কুল কুল করে ঘামছেন!

এই সময়ে চোখে পড়ল ঘরের প্রান্তে আর একটা দরজা। দরজায় মাথায় একটা বদখৎ বর্বরোচিত প্রতীক চিহ্ন কাঠ খুদে আঁকা। প্রতীক চিহ্ন দেখেই কিন্তু ডক্টর উইলেটের অর্ধেক প্রাণ উড়ে গেল—কেননা অনেকদিন আগে ওঁর এক তন্ত্রমন্ত্র জানা বন্ধু চিহ্নটা কাগজে এঁকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন—বলেছিলেন সামান্য এই চিহ্নের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে চির-তিমিরের রহস্য···প্রেতলোকের প্রবেশ পথ···যমালয়ের ঠিকানা। বিশেষ এক গোধূলিতে কৃষ্ণকালো এক বুরুজের গায়ে অঙ্কিত প্রতীক চিহ্নটি হুবহু নকল করে এনেছিলেন তাঁর প্রেততত্ত্ব-বিদ বন্ধুটি··· সামান্য এক প্রতীক চিহ্নের অসামান্য শক্তির বর্ণনা শুনে গা শিরশির করে উঠেছিল বলে আর শুনতে চান নি ডাক্তার। করাল সেই চিহ্নই দেখলেন শক্ত মজবুত দরজায় মাথায়।

থমকে দাঁড়িয়েছিলেন ডক্টর···পরমুহূর্তেই বন্ধুবর্ণিত চিহ্ন-কাহিনী তিরোহিত হয়েছিল মন থেকে একটা সম্পূর্ণ নতুন ভয়াল বিকট দুর্গন্ধে। জান্তব গন্ধ নয়···কেমিক্যালের গন্ধ। গন্ধটা দমকা ঝাপটায় নাকের ওপর আছড়ে পড়ল দরজার ওপারের ঘর থেকে। চার্লসকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে মনের ডাক্তাররা এসে ঠিক এই বীভৎস অজ্ঞাত গন্ধই পেয়েছিলেন তার জামাকাপড় থেকে। অর্থাৎ চার্লস এই ঘরেই নিমগ্ন ছিল গোপন গবেষণায়···এমন সময়ে ডাক পড়েছিল ওপর থেকে। জোসেফ কারওয়েনের মত গোঁয়ার-গোবিন্দ নয় বলেই বাধা দেয়নি।

সপ্ত-নরকের সহস্র বিভীষিকা দেখতেও রাজী, কিন্তু শেষরহস্য উদঘাটন না করে পাতালপুরী ছেড়ে যাবেন না উইলেট···এই সংকল্প মনে মনে আর একবার আউড়ে নিয়ে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে ঢুকলেন ডাক্তার। নামহীন আতংক সমুদ্রে তরংগের মত যেন ধেয়ে এল নিমেষ মধ্যে···কিন্তু অদৃশ্য তরংগে ব্যাহত হল না তাঁর অগ্রগতি... খেয়ালখুশীর বশবর্তী হয়ে পেছন ফিরে দৌড় দিলেন না। শেষ দেখতে এসেছেন···শেষ দেখেই যাবেন। তাছাড়া তাঁর ক্ষতি করার মত সজীব

কেউ এখানে নেই। বিদেহীদের ভয়ে পেছিয়ে যেতে তিনি রাজী নন। পিশাচ পরিকল্পিত যে নরক-কুহেলীতে আবৃত চার্লসের বিবেক বুদ্ধি চেতনা...তার হেস্তনেস্ত না করে তিনি নড়বেন না...কিছুতেই না।

ঘরটা মাঝারি সাইজের। মাঝখানে একটা টেবিল, একটা চেয়ার

কেউ এখানে নেই। বিদেহীদের ভয়ে পেছিয়ে যেতে তিনি রাজী নন। পিশাচ পরিকল্পিত যে নরক-কুহেলীতে আবৃত চার্লসের বিবেক বুদ্ধি চেতনা—তার হেস্তনেস্ত না করে তিনি নড়বেন না—কিছুতেই না।

ঘরটা মাঝারি সাইজের। মাঝখানে একটা টেবিল, একটা চেয়ার আর দুকোণে খান দুই সৃষ্টিছাড়া মেশিন ছাড়া আর কিছু নেই। উদ্ভট দর্শন মেশিন দুটোয় বিস্তর স্ক্রু দিয়ে আঁটা লোহার আঁকড়া এবং চাকা। প্রথমে নিরর্থক মনে হলেও পর মুহূর্তে বুঝলেন ডাক্তার দুটো যন্ত্রই বানানো হয়েছে শরীরকে যন্ত্রণা দেওয়ার জন্যে। যন্ত্রণার যন্ত্র ঝুলছে দরজার পাশে দেওয়াল থেকেও—সারি সারি হিলহিলে চাবুক। ওপরে একটা তাকে সারি সারি পায়া-লাগানো সিসের শূন্য কাপ। টেবিলের ওপর একটা শক্তিশালী আর্গাণ্ড লম্ফ, একতাড়া সাদা কাগজ, একটা পেন্সিল এবং দুটো লেকিথস্ বয়েম। দুটো বয়েমের ছিপি আঁটা—কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে বসানো টেবিলে—যেন তাড়াহুড়োয় সাজিয়ে রাখবার সময় পাওয়া যায় নি। লম্ফটা জ্বালিয়ে কাগজের তাড়ায় চোখ নামালেন ডাক্তার—তড়িঘড়ি যাওয়ার সময়ে চার্লস কি লিখছিল দেখবার জন্যে। কিন্তু চার্লসের হাতের লেখার বদলে দেখতে পেলেন জোসেফ কারওয়েনের কাঁকড়া আকারের তেড়াবেঁকা হরফে লেখা কয়েকটা সাংকেতিক কথা—দেখে মানে বুঝলেন না একবিন্দুও।

'বি মরল না। হাত ফসকে সুড়ঙ্গ দিয়ে নিচে পালিয়েছে।'

'বৃদ্ধ পঞ্চমকে দেখলাম। স্তোত্রপাঠ শিখিয়ে দিল—অনুষ্ঠান পদ্ধতিও।'

'যোগ সোদোদ'কে তিনবার জাগালাম।'

'চক্রের বাইরে থেকে ওদের জাগানোর জ্ঞান-বিদ্যে মুছে দিতে চেষ্টা করল এফ।'

অত্যুজ্জ্বল আর্গাণ্ড লম্ফর দৌলতে ঘরের প্রতিটি বর্গ-ইঞ্চি সুস্পষ্ট

দেখতে পাচ্ছিলেন ডাক্তার। দেখলেন, দরজার বিপরীত দিকের দেওয়ালে কাঠের আলনা থেকে ঝুলছে অনেকগুলো ঢলঢলে বিশ্রী আলখাল্লা। হলদেটে সাদা রঙ। ঝুলন্ত আলখাল্লার দুপাশে রয়েছে যন্ত্রণার যন্ত্রদুটো।

তার চাইতে বিস্ময়কর হল দুপাশের দেওয়াল দুটো শূন্য দেওয়াল। কিন্তু প্রতিটি পরিচ্ছন্ন পাথরে সযত্নে নিপুণ হাতে খোদাই করা অলৌকিক প্রতীক চিহ্ন, বিবিধ মন্ত্র আর ফর্মুলা। পায়ের তলায় মেঝেতেও রয়েছে ছেনির কাজ। স্যাঁৎসেতে পাথুরে মেঝের ঠিক কেন্দ্রে একটা প্রকাণ্ড পঞ্চভুজ এবং পঞ্চভুজের চারদিকে ঘরের চারকোণে খোদাই করা চারটে তিন ফুট ব্যাসের বৃত্ত। একটা বৃত্তের ওপর যেন গা থেকে খসে পড়েছে একটা হলদে-সাদা আলখাল্লা—পাশেই একটা সিসের কাপ-চাবুক-সারির ওপরের তাক থেকে নামানো। পাশের ঘরের তাক থেকে একটা ক্যালেরন বয়েম এনে রাখা হয়েছে বৃত্তের ঠিক বাইরে—গলায় ঝোলানো লেবেল লেখা ১১৮। বয়েমটার ছিপি খোলা এবং শূন্য। কিন্তু সিসের কাপটা ভর্তি—দেখেই উত্তাল হল ডাক্তারের হৃদপিণ্ড। ম্যাড়মেড়ে নীলচে রঙের শুকনো গুঁড়োটা ঢালা হয়েছে নিশ্চয় ১১৮ সংখ্যক বয়েম থেকে এবং পাতালপুরীতে হাওয়ার ঝাপটা নেই বলেই এখনো তা অগভীর সিসের পাত্র থেকে উড়ে গিয়ে ছড়িয়ে পড়েনি ঘরময়। বয়েম, কাপ, গুঁড়ো, আলখাল্লা, যন্ত্রণার যন্ত্র এবং কাগজ পেন্সিল দেখে বারবার কেন শিউরে উঠেছিলেন ডাক্তার—এতক্ষণে তা স্ফটিকস্বচ্ছ হয়ে উঠল মগজের মধ্যে। সব কটা বস্তুর যোগসূত্র একটাই। চাবুক আর যন্ত্রণার যন্ত্র দিয়ে শায়েস্তা করা হবে কাকে? 'মেটিরিয়া' অর্থাৎ বস্তু চিহ্নিত বয়েম থেকে কার ধুলো বা জান্তব-চূর্ণ ঢালা হয়েছে সিসের কাপে? 'কাসটোডিস্' বা প্রহরী চিহ্নিত বয়েম যুগল থেকে শরীরীরূপ দেওয়া হচ্ছে কোন যন্ত্রণার যন্ত্রীদের? দেওয়ালে অত মন্ত্র আর ফর্মুলা কাদের আহ্বানের নিমিত্ত? কাগজ, পেন্সিল কাদের জ্ঞান বুদ্ধির নিষ্কর্ষ লেখবার জন্যে? শত সহস্র খণ্ড রহস্য, স্মৃতি, দুঃস্বপ্ন, নৈশাতংক যেন বন্যার মত দানবিক প্রমত্ততায় আছড়ে পড়ল ডাক্তারের বিবশ মনের ওপর। উনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করলেন চার্লস অনুশোচনায় জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়ে কেন পাগল হয়ে গিয়েছে—সব রহস্যের নাভিবিন্দু ঐ শুষ্ক সবুজ পাউডার—যা সযত্নে রক্ষিত বৃত্তের মধ্যে মেঝেয় রাখা অগভীর সিসের কাপে।

এক ঝটকায় ক্লেদাক্ত ভয়কে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দেওয়ালে

উৎকীর্ণ মন্ত্রগুলো পড়তে শুরু করলেন ডাক্তার। সবই জোসেফ কারওয়েনের আমলে লেখা এবং তাঁর লেখা বা ভাষা পড়া না থাকলে মন্ত্রপাঠও অসম্ভব। একটা মন্ত্র তো খুবই পরিচিত মনে হল। গুড ফ্রাইডের দিন যে মন্ত্রপাঠ শুনে মুখস্থ করে ফেলেছিলেন মিসেস ওয়ার্ড—অনেকটা সেই রকম। ডাক্তারকে মন্ত্রটা লিখে দিয়েছিলেন। এক মন্ত্রবিশেষজ্ঞকে ডাক্তার সেই মন্ত্র দেখাতে তিনি আঁৎকে উঠে শুধু বলেছিলেন—আরে সর্বনাশ! এ যে অপদেবতা আহ্বানের মন্ত্র—এবং তাঁরা কেউই মামুলী চক্রের বাসিন্দা নয়! কী ভীষণ! কী ভীষণ!

এই গেল বাঁ দিকের দেওয়ালের ব্যাপার। ডানদিকের দেওয়ালেও শুধু মন্ত্র আর মন্ত্র—এক ইঞ্চি জায়গাও ফাঁকা নেই কোথাও। দুটো মন্ত্র খুবই চেনা মনে হল। খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে মিলটা আবিষ্কার করলেন ডাক্তার। লাইব্রেরীতে দেখে এসেছেন মন্ত্রদুটো যার একটার শিরোনামা 'ড্রাগনের ল্যাজ', আর একটার 'ড্রাগনের মাথা'। সেখানে মন্ত্রদুটো লেখা হয়েছিল চার্লসের হাতে। কিন্তু এখানে পাথরের গায়ে একই মন্ত্র উৎকীর্ণ অন্য কায়দায়। জোসেফ কারওয়েনের নিজস্ব উচ্চারণ-ভঙ্গী অনুসারে মন্ত্রদুটি এখানে লেখা হয়েছে। তাই হরফগুলো পর্যন্ত উল্টোপাল্টা হয়ে গিয়েছে—প্রথমে তাই চিনতে পারেন নি। চার্লস্ শুধু মামুলী মন্ত্রটাকে লিখেছিল—কিন্তু জোসেফ কারওয়েন যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন মন্ত্রের প্রতিটি শব্দের মধ্যে, শব্দ ব্রহ্মর ওপর জোর দিয়েছেন আশ্চর্য কায়দায়। পড়তে পড়তে যেন সম্মোহিত হয়ে গেলেন ডাক্তার। মনে মনে কখন জানি উচ্চারণ করতে আরম্ভ করে দিয়েছিলেন মন্ত্রের প্রথম লাইনটি। চার্লস যে শব্দটা উচ্চারণ করেছে ইয়াঃ—জোসেফ কারওয়েন তার উচ্চারণ ভঙ্গী লিখেছেন—"উ-আ-আ-আ-আ-হাঃ।"

মন্ত্রটা এই ঃ

"Y'AI'NG'NGAH
YOG—SOTHOTH
H'EE – L'GEB
F'AI' THRODOG
UAAAAH!"

নীরবে প্রথম পংক্তির পর শুরু করলেন দ্বিতীয় পংক্তি, তারপর তৃতীয় ...শেষ করলেন পঞ্চমে। সরবে আবার শুরু করলেন প্রথম থেকে। একই শব্দ উচ্চারণের মধ্যে কি অপূর্ব ধ্বনি ব্যঞ্জনা...তাঁকে যেন নেশায় পেয়ে

বসল। নিস্তব্দ পাতালপুরীম রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে গেল তার স্পষ্ট কণ্ঠের উচ্চারণ…এক একটি শব্দকে মুচড়ে দুমড়ে কখনো উদারা মুদারা ছাড়িয়ে তারায় তুলে পরক্ষণেই নিক্ষেপ করলেন খাদে। মৃত্যুপুরীর নিশ্চুপ পরিবেশে ধ্বনি আর আর প্রতিধ্বনির গমগমে সুরলহরী মাতাল করে তুলল যেন স্বয়ং ডাক্তার উইলেটকেই।

কিন্তু হঠাৎ কোত্থেকে একটা ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস ধেয়ে এল পাতাল প্রকোষ্ঠে। প্রথম পংক্তির প্রথম থেকেই শুরু হয়েছিল নিথর বাতাসে মৃদু আলোড়ন…মন্ত্রধ্বনি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই তা যেন ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে রূপান্তরিত হল তুহিন ঝাপটায়। লম্ফশিখাও আর স্থির নয়…দুলছে, কাঁপছে, শিউরোচ্ছে। অন্ধকারও আর ফিকে নয়…ঘন হচ্ছে ক্রমশঃ। নিষ্ফল চেষ্টায় লম্ফশিখা আলো দিয়ে ঠেকাতে চাইছে আগুয়ান অন্ধকারকে…পারছে না। কোত্থেকে যেন তাল তাল তমিস্রা কুণ্ডলী পাকিয়ে স্পন্দিত হচ্ছে ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে…মন্ত্র লিখনও আর স্পষ্ট নয়…ঢেকে যাচ্ছে সেই আগন্তুক অন্ধকারের দাপটে…ম্লান হয়ে আসছে দীপশিখা। সেই সঙ্গে কোত্থেকে জড়ো হচ্ছে পুঞ্জপুঞ্জ ধোঁয়া …ধোঁয়ার সঙ্গে চুপিসারে আসছে গন্ধবিকটের দল। এ গন্ধ শোঁকার দুর্ভাগ্য ডাক্তারের পূর্বেই হয়েছে…কিন্তু আগের চাইতেও এখন তা আরো বিকট, আরও অসহ্য। দেওয়ালের মন্ত্র আর পড়তে না পেরে ঘরের মধ্যে দৃষ্টি ঘুরিয়ে আনলেন এবং দুড়মুশ পেটা বুকে দেখলেন এক অভাবনীয় দৃশ্য।

মাথা ঘুরে গেল ডাক্তারের। অসাড় মস্তিকের কোষে কোষে দুরন্ত ঝটিকার মত ধেয়ে গেল জোসেফ কারওয়েন এবং চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড সম্পর্কে এতদিন যা শুনেছেন, দেখেছেন, পড়েছেন। মনে পড়ল সেই কটি কথা—'তাই ফের বলছি, যাকে তুমি কফিনে ফিরোতে পারবে না—কফিন থেকে তাকে জাগিও না…সাবধান, সেই মন্ত্র যেন অন্য কেউ উচ্চারণ করে না বসে……শবাধার থেকে জাগিয়ে ওদের সঙ্গে তিনবার কথা বলেছি……' হে ভগবান, দয়া করো। করুণা করো! ধুম্রকুণ্ডলী দু ফাঁক হয়ে যাচ্ছে—আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে ও কে?

৫

দরদী মহল ছাড়া এ-কাহিনী কেউ বিশ্বাস করবে না বুঝেই মেরিনাস

বিকনেল উইলেট একান্তঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাড়া কাউকে এত কথা বলেন নি। উনি নিজমুখে না বললেও কথা কখনো চাপা থাকে না। মুখে মুখে ছড়িয়েছিল। হেসে কুটিপাটি হয়েছিল অধিকাংশ। এমন মন্তব্যও শোনা গিয়েছিল যে বয়স হয়েছে ডাক্তারের। ভীমরতি ধরেছে। অবসর নিলেই হয়। রোগী দেখার আর দরকার নেই—বিশেষ করে মানসিক রোগী।

মিস্টার ওয়ার্ড কিন্তু একটা বর্ণও অবিশ্বাস করেননি। করবেন কি করে? উনি যে দেখেছেন বাংলোর একতলায় পাতাল ঘরের দুর্গন্ধময় ম্যানহোল। বিষবাষ্পে জ্ঞান হারিয়েছিলেন বলেই তো উইলেট তাঁকে বেলা এগারোটার সময়ে ওয়ার্ড ভবনে রেখে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যের পর থেকে বাংলো বাড়ীতে টেলিফোনের পর টেলিফোন করে গেছেন মিস্টার ওয়ার্ড, সাড়া পাননি। পরের দিন সকালবেলাও টেলিফোন ধরতে কেউ আসেন নি। দুপুর হতেই গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন মিস্টার ওয়ার্ড। বাংলোবাড়ীতে ঢুকে বন্ধুকে অজ্ঞান অক্ষত অবস্থায় শুয়ে থাকতে দেখেছিলেন ওপর তলায় একটা সোফায়। গাড়ী থেকে ব্র্যাণ্ডি এনে মুখে ফোঁটা ফোঁটা দিতেই সঘন নিঃশ্বাসের পর চোখ মেলেছিলেন ডাক্তার। কিন্তু চোখের পাতা পুরোপুরি খোলার আগেই বলেছিলেন 'এ কার দাড়ি……কার চোখ……হা ঈশ্বর, কে আপনি?' অথচ সেই মুহূর্তে ওঁর মুখের একান্ত সন্নিকটে মুখ এনে যিনি চেয়েছিলেন, যাঁকে তিনি ছেলেবেলা থেকে চেনেন—যাঁর দুই চোখ আকাশের মত হাল্কা নীল, গোঁফ দাঁড়ি নিখুঁতভাবে কামানো। তবে এ স্বগতোক্তি কিসের? কার উদ্দেশে?

রোদ ঝলমলে বাংলো আগের দিনের মতই পরিপাটি। উইলেটের জামাকাপড় থেকে অদ্ভুত সেই গন্ধটা নাকে এল মিস্টার ওয়ার্ডের—চার্লসকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার দিন পেয়েছিলেন ছেলের গা থেকে। ডাক্তারের জামাকাপড় অবিন্যস্ত নয়—কেবল হাঁটুর কাছে প্যাণ্ট ছিঁড়ে সুতো বেরিয়ে পড়েছে—শ্যাওলায় ময়লা হয়ে গিয়েছে। টর্চলাইট উধাও কিন্তু যে থলি নিয়ে গর্তে নেমেছিলেন—সেটি পাশেই রয়েছে। তবে ভেতরে কিছু নেই, খালি। যে ভাবে নিয়ে গিয়েছিলেন। উইলেট কিন্তু টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন। একটি কথাও না বলে বন্ধুর কাঁধে ভর দিয়ে একতলায় নামলেন। গামলার ধারে মঞ্চর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। দুজনে মিলে কত টানা-হ্যাঁচড়া ঠেলাঠেলি করলেন—তুলতে পারলেন না। শেষকালে শাবল আর গাঁইতি নিয়ে দমাদম করে ভেঙে

তুলতে লাগলেন একটার পর একটা তক্তা। তলায় কংক্রিট মঞ্চ দেখা গেল বটে—কিন্তু গতকাল যে এই মঞ্চই ডালার মত তুলেছিলেন সেরকম কোন চিহ্ন দেখতে পেলেন না। ভাঙাচোরা ফুটোফাটা—কিস্‌সু নেই। মসৃণ সিমেণ্টে আঁচড় পর্যন্ত নেই। অথচ গতকাল চার্লসের বাবা এই সিমেণ্টের মঞ্চই শাবলের চাড় দিয়ে তুলেছিলেন। তারপর পূতিগন্ধময় পাতাল কূপে নেমেছিলেন ডাক্তার…দেখেছিলেম সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ, লাইব্রেরী, গবেষণাগার, সিসের কাপ, বয়েম, মন্ত্র; শুঁকেছিলেন পচা গন্ধ; শুনেছিলেন গভীর কূপে কাদের করুণ গোঙানি…মাত্র একজনের আবছা দেহরেখা দেখেই পাগল হয়ে গিয়েছিলেন কিছুক্ষণের জন্যে। আজ আর সে সবের চিহ্নমাত্র নেই মসৃণ কংক্রিট মঞ্চে। মাথার ওপর রোদ্দুরে ঝলমলে আকাশ…কিন্তু পায়ের তলায় ক্লেদাক্ত পংকিল নরক গুলজার নিস্তব্দ…নরককুণ্ড নিশ্চিহ্ন।

বিহ্বল চোখে মিস্টার ওয়ার্ডের পানে চাইলেন ডক্টর উইলেট। স্খলিত কণ্ঠে বললেন…'গতকাল‥ এইখানে তুমি…গন্ধ পেয়েছিলে?' স্তম্ভিত হতবাক মিস্টার ওয়ার্ড নীরবে ঘাড় হেলিয়ে সায় দিতে উইলেট বললেন…'তাহলে সব বলব তোমাকে…শুধু তোমাকেই।'

ওপর তলায় যে ঘরে রোদ্দুর সব চাইতে বেশী, সেই ঘরে পুরো একটি ঘণ্টা বসে রইলেন দুই বন্ধু। গলা চড়িয়ে কথা কইতে পারলেন না ডাক্তার…পুরো ষাট মিনিট শুধু ফিসফিস করেই গেলেন। রক্ত জমানো সেই কাহিনী শুনতে শুনতে মিস্টার ওয়ার্ডের নাড়ীর স্পন্দন বেড়ে গেল, রক্ত চাপ বৃদ্ধি পেল,…দুনিয়ার সমস্ত আতংক যেন তাথৈ তাথৈ নাচতে লাগল উত্তাল রক্তস্রোতে। সিসের কাপ থেকে উত্থিত নীলচে কালো গাঢ় অস্বচ্ছ ধোঁয়ার আবরণ সরিয়ে উঁকি দিল কে…এ প্রশ্ন করবার মতও মনের অবস্থা আর রইল না। অনেকক্ষণ চুপচাপ মুখোমুখি বসে থাকার পর জিজ্ঞেস করলেন ভাঙা গলায়…'কি মনে হয় তোমার? কংক্রিট খুঁড়ে দেখব?' জবাব দিলেন না উইলেট। কিন্তু তাঁর মনের কথাটা যেন সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করলেন মিস্টার ওয়ার্ড। অজ্ঞাত লোক থেকে যিনি ইহলোকে পদার্পণ করেছেন… তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া কি আর সমীচীন হবে? মিস্টার ওয়ার্ড তখন ফের শুধিয়েছিলেন—'কিন্তু তিনি গেলেন কোথায়? তোমাকে বয়ে নিয়ে এসেছেন—গর্তটাও বন্ধ করে দিয়েছেন। তারপর?' নীরব থেকেছেন উইলেট—জবাব দিতে পারেননি।

কিন্তু ঘটনার শেষ হয়নি। উঠে দাঁড়িয়ে পকেটে হাত দিয়েছিলেন

ডাক্তার রুমাল বার করার জন্যে। রুমালের সঙ্গে সঙ্গে হাতে উঠে এল এক টুকরো কাগজ। পকেট ভর্তি মোমবাতি আর দেশলাই নিয়ে যখন আরো পাতালে দৌড়েছিলেন—তখন তো পকেটে কোনো কাগজ ছিল না। কাগজটা হাতে নিয়েই কিন্তু কেঁপে উঠলেন ডাক্তার। এ যে সেই কাগজ! যন্ত্রণার যন্ত্র যে ঘরে, যে কক্ষের দেওয়ালে মন্ত্র,—ঠিক তার মাঝখানের টেবিলে পেন্সিলের পাশে রাখা ছিল সন্ত্যাদরের এই কাগজ। খুব সন্তর্পণে এক ভাঁ কাগজ ভাঁজ করে কে যেন রেখে দিয়েছে পকেটে। কাগজে লেগে সেই গন্ধ—যন্ত্রণার কক্ষে যা অতিশয় উগ্র। ঐ গন্ধ ছাড়া কাগজে অন্য কোনো দুনিয়ার ছাপ নেই। কিন্তু ভেতরের লেখাটিতে ছাপ রয়ে গেছে হারিয়ে যাওয়া অতীতের। মধ্যযুগীয় দুর্বোধ্য ভাষায় তেড়া বেঁকা হরফে পেন্সিল দিয়ে লেখা সেই বার্তায় দন্তস্ফুট করতে অক্ষম হলেন দুই বন্ধু। কিন্তু গা ছমছম করতে লাগল প্রখর রৌদ্রালোকেও…পরলোকের বার্তার রহস্য উদ্ধারের জন্য সেই মুহূর্তেই নেমে এলেন নীচে। গাড়ী হাঁকিয়ে গেলেন পাহাড়ের গায়ে জন হে লাইব্রেরীতে।

প্রত্নলিপি বিদ্যার বিস্তর বই নামালেন বিভিন্ন তাক থেকে। সন্ধ্যে হয়ে গেল…তবু উঠলেন না টেবিল ছেড়ে। ধীরে ধীরে বোধগম্য হল দুর্বোধ্য ভাষাটা। ঝাড়বাতির তলায় স্পষ্ট হয়ে এল চার লাইনের বার্তা। এ ভাষা এ যুগের নয়…হরফগুলোও অতি প্রাচীন। অষ্টম কি নবম শতাব্দীতে দেশজুড়ে যখন পুরাতন ধর্ম আর খৃষ্টধর্মের নতুন করে সংঘাত শুরু হয়েছে…বিস্মৃত সেই অধ্যায় থেকে রহস্যময় এক পুরুষ মূর্ত হয়েছেন বর্তমান লোকে…জীবন্ত হাতে পেন্সিল ধরে লিখে গিয়েছেন কটুর ল্যাটিনে...'কারওয়েনকে খুন করতেই হবে। লাশ অ্যাসিডে গালিয়ে ফেলতে হবে…ছাই যেন না থাকে। এ কথা আর কেউ যেন না জানে।'

স্থানুর মত বসে রইলেন দুই বন্ধু…কারো মুখে কোনো কথা নেই। মন অসাড়...জিভও। অনেকক্ষণ পরে লাইব্রেরিয়ান এসে ওঁদের উঠিয়ে দিল টেবিল থেকে…বন্ধ হয়ে গেল লাইব্রেরী। দেড় দিনের ধকলে শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন ডাক্তার বন্ধুর সঙ্গেই গেলেন ওয়ার্ড ভবনে…রাতেও আর কথা বলতে পারলেন না। খেয়ে দেয়ে ঘুমোলেন সেখানেই। রইলেন রোববার দুপুর পর্যন্ত…তারপর টেলিফোন এল একজন ডিটেকটিভের কাছ থেকে…ডক্টর অ্যালেনের খোঁজ করতে বলা হয়েছিল তাকে।

ড্রেসিং গাউন পরে অশান্ত চরণে পায়চারী করছিলেন মিস্টার

ওয়ার্ড। টেলিফোন তিনিই ধরলেন। রিপোর্ট তৈরী হয়ে গিয়েছে শুনে পরের দিন সকালেই আসতে বললেন গোয়েন্দাদের। উইলেটও খুশী হলেন অ্যালেন-অন্বেষণ পর্ব শেষ হয়েছে শুনে। অদ্ভুত ভাষায় চার লাইনের পথনির্দেশ পকেটে যেই রাখুক না কেন, অ্যালেনই যে কারওয়েন তাতে আর সন্দেহ নেই এবং এই অ্যালেনকে অ্যাসিডে গালিয়ে ফেললেই কারওয়েনকেও অ্যাসিডে গালানো হয়ে যাবে। চার্লসও বলেছিল অ্যালেনকে দেখলেই গুলি করতে এবং লাশ অ্যাসিডে গালিয়ে ফেলতে। কারওয়েনকে উদ্দেশ করে অ্যালেনের নামে যে সব চিঠি আসছে ইউরোপ থেকে···তা থেকে স্পষ্ট বোঝা গিয়েছে···চার্লসকে খুন করার পরিকল্পনা আছে অ্যালেনের··হাচিনসন নামধারী প্রাণীটিও বলেছে বেশী বাড়াবাড়ি করলে এবং দরকার হলে চার্লসকে খুন করতে হবে বই কি। অ্যালেনকে সে 'কারওয়েন' বলেছে···অর্থাৎ অ্যালেনই দেড়শ বছর আগে নিহত কারওয়েনের জন্মান্তরিত রূপ···অবতার। এখন অষ্টম অথবা নবম শতাব্দী থেকে আর এক বিদেহী দেহধারণ করে লিখে বলে গেলেন সেই ভয়ংকর সত্য ··কারওয়েনকে খুন করতেই হবে। ঘটনা অনেকগুলো...কিন্তু ছাড়া ছাড়া মনে হলেও যোগসূত্র একটাই··· অ্যালেনরূপী কারওয়েনই সেই রহস্যসূত্র।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুই বন্ধু গেলেন মানসিক হাসপাতালে···চার্লসের কাছে। পাতাল গহ্বরে গিয়ে যা কিছু দেখেছেন, শুনেছেন, শুঁকেছেন··· স-ব সবিস্তারে বর্ণনা করলেন ডাক্তার। শুনতে শুনতে ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল চার্লসের মুখ। বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলো নাটকীয়ভাবে বললেন ডাক্তার···চার্লসের মুখে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্যে। যেমন, মস্ত চত্বরের মেঝের কূপে দানবিক জিনিসগুলোকে না খাইয়ে রাখা খুব অন্যায়···এত নিষ্ঠুরতা চার্লসের পক্ষে শোভন নয়··· এই অভিযোগের প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত ছিল তীব্র অনুশোচনা। কিন্তু চার্লসের চোখে মুখে প্রকট হল আতীব্র আশ্লেষ। ঘসঘসে খসখসে গলায় ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে···'বলছেন কি, না খাইয়ে রেখেছি এক মাস? ওরা খায় বই কি···কিন্তু না খেলেও চলে। আর ওদের কান্নাকাটি? জানেন সেবার একটা চাকর কালা হয়ে গিয়েছিল ওদের কান্না শুনতে শুনতে? গর্তে আর নামত না সেই থেকে। জানেন, একশ সাতান্ন বছর আগে যেদিন কারওয়েনকে সিসের কফিনে পোরা হল··· সেদিন থেকে ওরা একনাগাড়ে চেঁচিয়েই যাচ্ছে?''

এর বেশী মন্তব্য চার্লসের পেট থেকে বার করতে পারলেন না

উইলেট। উনি চাইছিলেন আবিষ্কারের আকস্মিকতা দিয়ে চার্লসের পাগলামি ঘুচিয়ে দিতে—শক ট্রিটমেণ্ট করতে। তাই এবার শুরু করলেন মন্ত্র লেখা যন্ত্রণাকক্ষের কাহিনী। সবুজাভ ধুলো আর সিসের কাপের উল্লেখ করতেই সেই প্রথম চাঞ্চল্য দেখা গেল তার চোখে মুখে—তার আগে পর্যন্ত এমন মুখভঙ্গী করে বসেছিল যেন আকাশ থেকে আতংক টেনে নামিয়ে তার সয়ে গেছে—এই তিনমাসেই ছোকরার এতখানি পরিবর্তন আশা করেননি ডাক্তার। কিন্তু যেই শুরু করলেন যন্ত্রণার যন্ত্র, মন্ত্র আর সবজে ধুলোর বর্ণনা—ভীষণ চমকে উঠল চার্লস। কাগজপত্র আজকের ভাষায় লেখা নয় শুনে অদ্ভুত দ্যুতি দেখা দিল চোখে। চিবিয়ে চিবিয়ে দেড়শ বছর আগেকার কারওয়েন বাচনভঙ্গী অনুকরণ করে বললে—"কত নাম্বার লেখা ছিল বয়েমের গায়ে মনে আছে? ১১৮। পাশের ঘরে নামের লিস্টে ১১৮-র পাশে লেখা নামটা দেখলে পালিয়ে আসতেন। —আজ পর্যন্ত ওকে আমি জাগাই নি। জাগাবো বলেই সেদিন তৈরী হচ্ছিলাম—এমন সময়ে গিয়ে পড়লেন আপনারা।"

এর পরেই উইলেট বললেন কি ভাবে মন্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে চূর্ণ থেকে কালচে সবুজ থকথকে ঘন ধোঁয়া উঠে এসেছিল। বলতে বলতে লক্ষ্য করলেন সেই প্রথম আতংকে নীল হয়ে আসছে চার্লসের মুখ। ভয়বিকৃত কর্কশ কণ্ঠে ধ্বনিত হল যেন স্বয়ং শয়তানকে প্রত্যক্ষ করার বিভীষিকা। প্রায় রুদ্ধশ্বাসে ভাঙা ভাঙা কাঠচেরা গলায় শুধু বললে—"কী! তার আসার পরেও আপনি বেঁচে আছেন!"

ডক্টর উইলেট নির্বোধ নন। উপস্থিত বুদ্ধি তাঁর অতিশয় প্রখর। পরিস্থিতি অনুযায়ী জবাব তৈরী করতে জানেন। তাই চার্লস কিসের ভয়ে শিউরে উঠছে অনুমান করে সান্ত্বনার সুরে তৎক্ষণাৎ আউড়ে গেলেন হাচিনসনের চিঠি থেকে কয়েকটা লাইন—"ভয় কি! আজকাল স্মৃতিফলক প্রায় পালটাপালটি হয়ে যায়। দশটার মধ্যে নটাই ঠিক থাকে না। জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত তাই সঠিক জানা যায় না কে এসেছে!"

এই পর্যন্ত বলেই ঝটিতি চার্লসের চোখের সামনে মেলে ধরলেন সস্তা কাগজে চার লাইনে লেখা কিম্ভূতকিমাকার বার্তা। ফল হল সাংঘাতিক। অজ্ঞান হয়ে গেল চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড।

পাছে রুগীকে ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে এই কথা মনের ডাক্তাররা বলে বসেন, তাই গোড়া থেকেই ধারে কাছে কাউকে থাকতে দেননি উইলেট এবং মিস্টার ওয়ার্ড। তাই চার্লসের অজ্ঞান হওয়া কেউ দেখতে পেল না। দুই বন্ধু ধরাধরি করে চার্লসকে তুলে শুইয়ে দিলেন সোফায়। জ্ঞান

ফিরে পেয়েই কিন্তু চার্লস একটা কথাই ঘ্যান ঘ্যান করে বলে চলল বারবার —ওর্গে আর হাচিনসনকে এক্ষুনি চিঠি লেখা দরকার। শেষকালে ডাক্তারকে বলতেই হল, হাচিনসনের চিঠির কথা। চার্লসের পরম শত্রু সে। অ্যালেনের সঙ্গে ষড় করেছে চার্লসকে খতম করার জন্যে। খবরটা শুনে কিন্তু চমকে উঠল না চার্লস। তবে শোনবার পর দেখা গেল ভয় পেয়েছে। যেন তাড়া খাওয়া শিকারের মত ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে। এর পর আর কথা বলানো গেল না ওকে দিয়ে। চলে এলেন দুই বন্ধু। আসবার সময়ে সাবধান করে দিয়ে এলেন অ্যালেন সম্পর্কে। শুনে বিশ্রীভাবে খিক খিক করে হেসে উঠল চার্লস। বলল, ভয় নেই। সে পথ বন্ধ হয়ে গেছে। হাসির ধরন দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল দুজনেরই। কিন্তু আর কথা বাড়ালেন না। ওর্গে আর হাচিনসনকে চিঠি লিখলেও সে চিঠি হাসপাতাল থেকে ছাড়া হবে না জেনে ও নিয়ে আর বারণও করলেন না।

ওর্গে আর হাচিনসন যদি নির্বাসিত পিশাচ-গুরুই হয়…দুজনের ক্ষেত্রেই ঘটল কিন্তু দু-ধরনের চমকপ্রদ উপসংহার। পরপর এতগুলো ভয়ংকর ঘটনার অভিজ্ঞতা লাভ করে উইলেটের উপস্থিত বুদ্ধি আরো বেড়ে গিয়েছিল। আন্তর্জাতিক সংবাদ পরিবেশন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। তাদের বলা ছিল, প্রাহা বা পূর্ব ট্রানসিলভানিয়ায় অদ্ভুত অপরাধ বা দুর্ঘটনার খবর বেরোলেই যেন তাঁকে জানানো হয়। ছমাস পরে এল ঈপ্সিত সংবাদ।

প্রাহার খবরে জানা গেল, হঠাৎ এক রাতে শহরের সবচেয়ে পুরোনো তল্লাটের একটা জরাজীর্ণ বাড়ী একদম গুঁড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে এবং বাড়ীর মালিক জোসেফ নাদে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। লোক-টাকে নাকি সাক্ষাৎ পিশাচ বললেও অত্যুক্তি হয় না…দেখতে যেমন কাজেও তেমন। বয়সের গাছপাথর নেই। বুড়ো হাবরারাও বলে নাকি বাচ্চা-বেলা থেকে জোসেফকে দেখে আসছে ঠিক ঐ অবস্থায়।

আরেকটা ঘটনা ঘটল ট্রানসিলভানিয়া পর্বত অঞ্চলে রাকুসের দক্ষিণে। কুখ্যাত ফেরেঙ্কজি কাসল প্রলয়ংকর বিস্ফোরণে ছাতু হয়ে গিয়েছে। এক-খানা পাথরও আর আস্ত নেই। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রাসাদের লোকজনও চাপা পড়ে গিয়েছে। কেল্লাপ্রাসাদের মালিক ব্যারন ফেরেঙ্কজির নাম শুনলেই আঁৎকে উঠত দেশের লোক এবং অনেক অবিশ্বাস্য গুজব রটেছিল তাঁর রহস্যজনক কীর্তিকলাপ নিয়ে…যে কারণে বুখারেস্ট থেকে তাঁকে

তলব করার আয়োজন হচ্ছিল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য—বিস্ফোরণের পর তার আর দরকার হল না।

খবরদুটো পেয়ে উইলেট শুধু একটা মন্তব্যই করেছিলেন। যে হাত তাঁকে ল্যাটিন ভাষায় চার লাইন লিখে পথনির্দেশ করেছেন—সেই হাতের জোর নেহাৎ কম নয়—নরপিশাচ ওর্ণে আর হাচিনসনের বন্দোবস্ত নিজের হাতেই সেরেছেন এবং মহাপিশাচ কারওয়েনের ভার উইলেটের হাতে ছেড়েছেন।

৬

পরের দিন সকালে ওয়ার্ড ভবনে দৌড়োলেন ডক্টর উইলেট। গোয়েন্দাদের রিপোর্ট শোনবার পর কারওয়েন ওরফে অ্যালনকে গ্রেপ্তার অথবা নিকেশ—দুটোর একটা করতে হবে। মিস্টার ওয়ার্ডও একমত হলেন তাঁর সঙ্গে। ওঁরা বসে রইলেন একতলায়—কেন না ওপরতলায় ইদানীং টেঁকা দায়। অসহ্য চাপা গন্ধে বমি উঠে আসে। পুরোনো চাকরবাকররা তো স্পষ্ট বলছে, এ বাড়ী অভিশপ্ত—যেদিন থেকে কার-ওয়েনের তৈলচিত্র হঠাৎ গুঁড়িয়েছে—সেইদিন থেকেই শয়তান ঠাঁই নিয়েছে বাড়ীতে।

ডিটেকটিভরা এল নটায়। অ্যালেন বা ব্রাভা টনি গোমেজ নামক চাকর ··দুজনের কাউকেই তারা পায়নি। তবে গাঁ থেকে অনেক খবর এনেছে। অ্যালেন লোকটার চালচলন মোটেই সুবিধের নয়। চশমার মধ্যে দিয়ে চাউনিটা মনে হত যেন শয়তানিতে ভরা। গলার স্বর বড্ড বেশী ভাঙা। সবচেয়ে অদ্ভুত হল লোকটার ঐ দাড়ি। নকল বলেই ধারণা গাঁয়ের লোকদের। নিশ্চয় রঙ করা। কথাটা যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণ পাওয়া গেছে বাংলোবাড়ীতে তার ঘর সার্চ করে। একটা নকল দাড়ি আর একটা কালো চশমা ছিল সেখানে।

সম্প্রতি ভ্যামপায়ারের উৎপাত দেখা দিয়েছিল এ তল্লাটে। তার জন্যে ধরা উচিত ঐ অ্যালেন লোকটাকে···চার্লসকে নয়···অধিকাংশ গ্রামবাসীদের মত তাই। অ্যালেনই আসল ভ্যামপায়ার।

লরী লুঠেরারা কিম্ভূতকিমাকার বাক্সর মধ্যে বিকট বস্তু দেখে পুলিশে খবর দিয়েছিল। পুলিশ এসে বাংলোবাড়ী খানাতল্লাসি করে জেরা করেছিল অ্যালেনকে। যদিও লোকটা অন্ধকার থেকে আলোয় আসতে

চায়নি···তবুও আর একবার তাকে দেখলেই পুলিশ সনাক্ত করতে পারবে। অ্যালেনের বিদঘুটে দাড়ি দেখে তাদেরও খটকা লেগেছিল। অ্যালেনকে চেনা যাবে ডান ভুরুর কাটা দাগটার জন্যে। আধো-আলোর মধ্যে থাকলেও কাটা দাগটা নজর এড়ায়নি পুলিশের। লোকটার হাতের লেখাও নাকি মান্ধাতার আমলের। পেন্সিলে লেখা অ্যালেনের হস্তাক্ষর ঘর থেকেই পাওয়া গিয়েছে। ডিটেকটিভরা বার করে দেখাল উইলেটকে। দেখেই চমকে উঠলেন উইলেট। কারওয়েনের হাতের কাঁকড়াকৃতি হাতের লেখা। অ্যালেনের হস্তাক্ষর এবং পাতালপুরীতে রক্ষিত চার্লস ছোকরার গবেষণার লেখা···সবই একই রকম···হুবহু এক রকম···তফাৎ নেই তিলমাত্র।

গুম হয়ে বসে রইলেন দুই বন্ধু। গোয়েন্দারা অনেকগুলো টুকরো খবর জড়ো করেছে। ফলে, একটা নামহীন ভয় বিষাক্ত সর্পিল কীটের মত পেঁচিয়ে ধরল দুজনেরই মন। নকল দাড়ি আর চশমা... কারওয়েনের কাঁকড়াকৃতি হস্তাক্ষর···পুরনো তৈলচিত্রে ভুরুর কাটা দাগ---রাতারাতি চার্লসের ভুরুতেও হুবহু সেই কাটা দাগ---টেলিফোনে অ্যালেনের গভীর ঘসঘসে স্বর, মিস্টার ওয়ার্ড যা শুনে ভুলতে পারেননি---হাসপাতালে গিয়ে ছেলের কণ্ঠেও সেই স্বর শুনে খটকা লেগেছিল।

চার্লস আর অ্যালেনকে একত্রে কেউ দেখেছে? হ্যাঁ, দেখেছে। কয়েকজন অফিসার---একবারই। তারপর আর কেউ দেখেনি।

অ্যালেন হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সহজ হয়ে উঠেছিল চার্লস---ভয় কেটে গিয়েছিল। চার্লস থাকত ওয়ার্ড-ভবনে--- অ্যালেন বাংলোবাড়ীতে।

কারওয়েন-অ্যালেন-চার্লস-দেড়শ বছর আগের একটি মানুষের সঙ্গে এ যুগের একটি মানুষের এত মিল কেন? দু-যুগের দুটো ব্যক্তিত্ব হুবহু এক হয়ে যায় কিভাবে? কোন পৈশাচিক পন্থায়?

লাইব্রেরী ঘরে অভিশপ্ত তৈলচিত্রের প্রায় জীবন্ত চোখদুটো নিষ্পলকে যেন চেয়ে থাকত চার্লসের পানে---অনুসরণ করত তার গতিবিধি---ছবির মানুষের সঙ্গে হুবহু সাদৃশ্য রক্তমাংসের মানুষের। এ প্রহেলিকার জবাব দেবে কে?

অ্যালেন আর চার্লস দুজনেই কারওয়েনের হাতের লেখা নকল করে কেন? নজরবন্দী না থাকা অবস্থাতেও কারওয়েন হস্তাক্ষরে লেখে কেন দুজনেই।

সবার ওপরে রয়েছে পাতালপুরীর পাকচক্র, ভয়াল বিস্ময়, অন্ধকূপের উপোষী দানব, মন্ত্রপাঠের ম্যাজিকে ধোঁয়ার আবির্ভাব, পকেটে পাওয়া কাগজে চার লাইনের বিচিত্র চিঠি আর কাগজপত্রে "জান্তব চূর্ণ" সম্পর্কে রাশি রাশি তথ্য---মানে কি এ সবের ? সব মিলিয়ে কোন রহস্যনিকেতনের সিংহদ্বারের নির্দেশ মিলছে ?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল মিস্টার ওয়ার্ডের মাথায়। একটা ছবি দিলেন গোয়েন্দাদের। বললেন ছবিটা গাঁয়ের লোকদের দেখিয়ে আনতে—যদি তারা চিনতে পারে। ফটোটা তাঁর হত-ভাগ্য পুত্র চার্লসের। কিন্তু সযত্নে দাড়ি আর কালো চশমা আঁকা গালে আর চোখের ওপর।

ঝাড়া দুঘণ্টা চুপচাপ বসে রইলেন দুই বন্ধু। বাড়ীর অশুভ আব-হাওয়ায় গা কি রকম করতে লাগল উইলেটের। মহাকাল এগিয়ে চলে নীরবে নিঃশব্দে—সেইসঙ্গে যেন ওপরতলার পরিত্যক্ত লাইব্রেরী ঘরটা আড়চোখে চেয়ে থাকে ডাক্তারের পানে। যেন তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে নীরবে, নিঃশব্দে। ঘেমে উঠলেন ডক্টর উইলেট।

দুঘণ্টা পরে গোয়েন্দারা ফিরে এসে বললে অভিযান সফল হয়েছে। দোকানদার এবং গাঁয়ের লোক একবাক্যে বলেছে ছবিটা সেই কুচুটে ভ্যামপায়ার ডক্টর অ্যালেনের।

শুনেই ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন মিস্টার ওয়ার্ড। রুমাল বার করে কপাল মুছলেন উইলেট। অ্যালেন—কারওয়েন—চার্লস—তিনরকমের তিনটে মানুষ মিলেমিশে যেন এক হয়ে যাচ্ছে। কুৎসিত কল্পনা—কিন্তু ঘুরে ফিরে কদাকার সেই কল্পনাই জাগ্রত হচ্ছে মনের মধ্যে। শূন্য থেকে কাকে ডেকেছিল চার্লস ? চার্লসকে নিয়ে সে করেছে কি ? ঠিক কি কি ঘটেছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ? কে এই অ্যালেন ? চার্লস বাড়াবাড়ি করলে কেন তাকে নিকেশ করবার প্ল্যান করেছিল সে ? কেনই বা তাকে দেখামাত্র গুলি করে অ্যাসিডে গালিয়ে ফেলতে বলেছিল চার্লস ? কেন সেই একই নির্দেশ এসেছিল চার লাইনের লেখা পরলোকবাসীর বার্তায় ? নামটা ছিল কেবল অন্য—অ্যালেনের বদলে কারওয়েন। চরম পরিবর্তনটা কি ? ঘটল কখন ? সেদিন সকালে উইলেটকে ক্ষিপ্ত মস্তিষ্কে চিঠি পাঠিয়ে ইস্তক নার্ভাস ছিল চার্লস—কিন্তু হঠাৎ যেন পালটে গেল ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে। ফিরে পেল মনোবল। কাউকে না জানিয়ে সতর্ক গোয়েন্দাদের চক্ষু এড়িয়ে উধাও হল বাইরে। শুধু তখনই নাকি সে গিয়েছিল বাড়ীর বাইরে। কিন্তু বাড়ী ফিরেই নিজের

ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ার্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠেছিল কেন ? কাকে দেখে ?

এমনও তো হতে পারে, ঘরে যে ঢুকেছিল সে চেঁচায়নি…ঘরের মধ্যে যে ছিল সে চেঁচিয়ে উঠেছিল তাকে দেখে ? ঘরে তাহলে কে ছিল ? কে বাড়ীর বাইরে থেকে এসেছিল ? হা ঈশ্বর ! চার্লস কি বাড়ী থেকে আদৌ বাইরেই যায় নি ?

বাইরে থেকে তাহলে কে এসেছিল চার্লসের চেহারা নিয়ে ? বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেল উইলেটের কপালে। মনে পড়ল খাস চাকরের ভয় কম্পিত জবানি। চেঁচানি শুনে ওপরে দৌড়ে যেতেই ঘর খুলে বেরিয়ে এসেছিল চার্লস—কিন্তু যেন আর এক চার্লস। হিমশীতল ক্রুর কুটিল চোখে অঙ্গুলি নির্দেশে নেমে যেতে বলেছিল তাকে। তাইতেই কলজে স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল বেচারা চাকরের।

খাস চাকরকে ডেকে পাঠালেন উইলেট। সবার সামনেই ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে সে বললে—হ্যাঁ সেদিন চার্লস ঘর থেকে বেরিয়ে শুধু চাউনি দিয়ে তার মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল। অথচ তার আগেই শোনা গিয়েছিল ঘর থেকে পরপর অনেকগুলো শব্দ—চার্লস বিষমভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল—পরক্ষণেই সশব্দে নিঃশ্বাস নিয়ে যেন খাবি খেয়েছিল …তারপর যেন দম আটকে এসেছিল। তারপর দুমদাম, ক্যাঁচ ক্যাঁচ, মচ্ মচ্, ধপ-ধপাস ইত্যাদি শব্দ ভেসে এসেছিল। বলতে বলতে শিউরে উঠল শেষ কথাটায় এসে। ওপরে উঠেই কিন্তু একটা কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা তার গায়ে লেগেছিল...বোধহয় জানলা খোলা ছিল ওপরের ঘরের।

সব শুনলেন ডক্টর উইলেট এবং গুম হয়ে বসে রইলেন। মাঝে মাঝে আপন মনে মাথা নেড়ে মনের মধ্যে দ্রুত সঞ্চয়মান চিন্তাগুলোকে যেন এক সুতোয় বাঁধবার চেষ্টা করে চললেন। চোখ দেখে মনে হল, তিনি সেখানে নেই---মন দিশেহারা হয়ে ছুটছে অন্ধকূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। অবশেষে যেন জবাব খুঁজে পেলেন মনের মধ্যেই। মাথা নাড়তে লাগলেন আপন মনে।

অস্বস্তিকর এই পরিবেশের অবসান করার জন্যে গোয়েন্দাদের বিদায় দিলেন মিস্টার ওয়ার্ড। ঘরে রইলেন কেবল দুজন---মিস্টার ওয়ার্ড এবং ডক্টর উইলেট।

আরো কিছুহণ মৌন থাকার পর, মুখ খুললেন উইলেট। মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, এখন থেকে তদন্তের ভার শুধু তাঁর ওপরেই ন্যস্ত

থাকুক---আর কারুর ওপর নয়। তিনি যা করবেন—তার জবাবদিহি কাউকে করবেন না। কি করলেন, তাও কাউকে বলবেন না। অনেক সমস্যার সমাধান আত্মীয় দিয়ে হয় না---বন্ধু দিয়ে হয়। এই ঘোর কুটিল ধাঁধার সমাধানও উইলেট করবেন একা---সঙ্গে কেউ থাকবে না। কাজ শুরু হবে ওপরতলার রহস্যকুঠরির লাইব্রেরী ঘর থেকে---যে ঘরের ওভার-ম্যান্টেলের ওপরকার জোসেফ কারওয়েনের ছবি পাউডার হয়ে যাবার পর থেকে অমঙ্গল এ বাড়ীর ওপর চেপে বসেছে।

রাজী হওয়া ছাড়া কিছু বলার ছিল না মিস্টার ওয়ার্ডের। এক ঘণ্টা পর দেখা গেল লাইব্রেরী ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজায় খিল দিলেন ডাক্তার। বাইরে থেকে কান পেতে শোনা গেল ঘরময় তাঁর পায়চারীর শব্দ এবং জিনিসপত্র টানা-হ্যাঁচড়ার আওয়াজ। আরও কিছুক্ষণ ক্যাঁচ ক্যাঁচ মচ্ মচ্ আওয়াজ শুনে মনে হল যেন কাবোর্ডের পাল্লা খুলবার চেষ্টা করছেন। পর-মুহূর্তেই একটা অবরুদ্ধ আর্ত চীৎকার, দম আটকে আসার ঘড়্ ঘড়্ শব্দ এবং দমাস করে পাল্লা অথবা ঐ জাতীয় কিছু বন্ধ করে দেওয়ার আওয়াজ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে খিল খুলে প্রায় হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার—চোখ মুখ উদ্‌ভ্রান্ত—যেন ভূত দেখেছেন। অল্প কথায় চেলা কাঠ চাইলেন। ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালতে হবে—ইলেকট্রিক চুল্লীটা নাকি বোগাস—কোনো কাজের নয়। তৎক্ষণাৎ পাইন কাঠের গুঁড়ি মাথায় করে ঘরের মধ্যে রেখে এল চাকর। সেই ফাঁকে চিলেকোঠা থেকে কয়েকটা বাস্কেটে করে খবরের কাগজ চাপা দিয়ে কি যেন নিয়ে এলেন ডাক্তার। গত জুলাইতে এসব সরানো হয়নি ঘর থেকে। মিস্টার ওয়ার্ড দেখতে পাননি কি ছিল ঝুড়ির মধ্যে।

ফের ঘরে ঢুকে খিল তুলে দিয়েছিল ডাক্তার। এবার শোনা গিয়েছিল আগুন জ্বালার পট পট ফোঁস ফোঁস শব্দ। জানলা দিয়ে দেখা গিয়েছিল চিমনি থেকে গল গল করে বেরোচ্ছে কালো ধোঁয়া। ফায়ার প্লেস জ্বালিয়েছেন ডাক্তার। কাঠও পোড়াচ্ছেন দেদার। এর একটু পরেই অনেকগুলো খবরের কাগজ নাড়াচাড়া করার খস্ খস্ আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আবার ক্যাঁচ ক্যাঁচ মচ্ মচ্ শব্দে খোলা হল একটা পাল্লা—তার-পরেই ধপ্ করে এমন একটা অলুক্ষুণে শব্দ কানে এল যা অকারণেই খাড়া করে দিল গায়ের লোম। উইলেট পর পর দুবার চেঁচিয়ে উঠলেন ঠিক এর পরেই—যেন পাকস্থলীর খাবার পর্যন্ত উঠে আসতে চাইছে—

বিষম ঘেন্নায় অস্ফুট চীৎকার তাই চাপতে পারছেন না। একই সঙ্গে পট্ পট্ ফোঁস ফোঁস শব্দটা যেন ঈষৎ স্তিমিত হয়েই ফের তেজালো হয়ে উঠল। চিমনির কালো কুচ্ছিত ধোঁয়ায় দূষিত হয়ে গেল আকাশ। সে কি ধোঁয়া! বাতাসের ধাক্কায় ধোঁয়া নেমে এল বাড়ীর দিকে এবং দম আটকে এল বাড়ীশুদ্ধ লোকের। মাথা ঘুরতে লাগল মিস্টার ওয়ার্ডের। চাকররা এক জায়গায় জড়ো হয়ে আতংক বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল তাল তাল দুর্গন্ধময় ধোঁয়ার পানে। অনেকক্ষণ পর পাতলা হয়ে এল ধোঁয়া। ফের অনেক কিছু সরানোর, নাড়ানোর আওয়াজ ভেসে এল বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে। সব শেষে দড়াম করে যেন বন্ধ করে দেওয়া হল পাল্লা—স্তব্ধ হল ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ। তারপর ঝড়ো কাকের মত চেহারা নিয়ে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার—হাতে কাপড় চাপা দেওয়া ঝুড়ি। জানলা-গুলো খুলে দিয়ে এসেছিলেন বলেই বাইরের টাটকা হাওয়া ঢুকে নিমেষে উড়িয়ে নিয়ে গেল বন্ধ দূষিত হাওয়াকে---সেই সঙ্গে নাকে এল জীবাণু-নাশকের তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ। সুপ্রাচীন ওভার-ম্যান্টেল দেখে আর কারও পাকস্থলী কুঁকড়ে গেল না---জাদুমন্ত্রবলে যেন অশুভ অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে ঘরের বাতাস---ঘরের সব কিছু। দেওয়াল শূন্য---কিন্তু মনে হয় না জোসেফ কারওয়েনের রাজকীয় ছবি ওখানে কোনোকালে ছিল। রাত এল। কোণে কোণে জমায়েত হল পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার---কিন্তু ছায়া দেখেও আর কেউ চমকে উঠল না---শুধু একটা অদ্ভুত বিষন্নতা ভাসতে লাগল ঘরের বাতাসে---ছড়িয়ে গেল অণুতে-পরমাণুতে। কি কাণ্ড করে গেলেন, সে সম্পর্কে একটি কথাও বললেন না ডাক্তার। শুধু বললেন---"প্রশ্ন করলেও জবাব দেব না। শুধু বলব—ম্যাজিক অনেক রকমের আছে। এ ঘর থেকে সব ভয় তাড়িয়ে দিলাম আমি আমার ম্যাজিক দিয়ে। আজ থেকে বাড়ীর সবাই ঘুমোতে পারবে নিশ্চিন্ত মনে।"

৭

ভয় তাড়ানোর ম্যাজিক প্রয়োগ করতে গিয়ে ডাক্তার নিজেই যে কাহিল হয়ে পড়েছেন, তা বোঝা গেল এর পরের তিন দিনে। বাড়ী ছেড়ে একদম বেরোলেন না। সেই রাতে বাড়ী ফেরার পর পুরোপুরি ভেঙে পড়লেন। পাতাল প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসার পর স্নায়ু বিপর্যস্ত

হয়ে গিয়েছিল, ভয় তাড়ানোর ধকলেও দেখা গেল তাঁর স্নায়ু কম ধাক্কা খায় নি। তিন দিন তিন রাত ঘর ছেড়ে একদম বেরোলেন না। চাকর-বাকররা দরজায় আড়ি পেতে অবশ্য শুনেছে আপন মনে কি যেন বকেছেন যখন-তখন এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। বুধবার মধ্য রাত্রে সদর দরজার খোলা এবং বন্ধ হওয়ার মৃদু শব্দও পেয়েছে তারা। কল্পনাশক্তি ওদের কম বলেই পরের দিন সন্ধ্যায় জব্বর খবরটা সান্ধ্য দৈনিক বেরোনোর পরেও বুঝতে পারেনি রাতের রহস্য! সূচনা হয় নি মুখরোচক আলোচনার।

খবরটা এই ঃ

নর্থএণ্ডের কবরখানায় আবার চোর

উঈডেন পরিবারের কবর তছনছ করার দশ মাস পর আবার গোরস্থানের ঐদিকে নিশাচর চোরের আবির্ভাব ঘটেছে গতরাত্রে—দেখেছে রাতের প্রহরী রবার্ট হার্ট। ঘর থেকে উঁকি মেরে সে দেখতে পায় পকেট টর্চ বা চোরা-লণ্ঠন জ্বালিয়ে একটা লোক শাবল নিয়ে হেঁট হয়ে রয়েছে মাটির ওপর—দূরের ইলেকট্রিক আলোর পটভূমিকায় দেখা গিয়েছিল তার কালো দেহরেখা। ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে আসতেই নিশাচর কবর-চোর দৌড়ে পালিয়ে যায় গাছপালার অন্ধকারে, তাড়া করেও খুঁজে পাওয়া যায় নি।

এই নিয়ে তিনবার হল, কবর-চোর এল গোরস্থানে। তবে প্রথম বারের মত এ বারেও সে কিছু ক্ষতি করে নি, চুরীও করে নি। ওয়ার্ড পরিবারের জন্য সংরক্ষিত জায়গায় খানিকটা মাটি সামান্য খুঁড়েছে—কবর সেখান ছিল না—খোঁড়াখুড়ি করেছে কেবল একটা কফিন শোয়ানোর মত আয়তাকার ক্ষেত্র।

কবর-চোরের লম্বা দাড়ি ছিল, দেখেছে রাতের প্রহরী। তার ধারণা তিনবারই এই একটা লোকই হানা দিয়েছে গোরস্থানে। পুলিশ কিন্তু বলছে অন্য কথা। দ্বিতীয় বারে উঈডেন কবর যে তছনছ করে গিয়েছিল, স্মৃতিফলক বিষম রাগে চুরমার করে গিয়েছিল—সে অতি ভয়ানক প্রকৃতির লোক। প্রথম বারের ঘটনাটি ঘটেছিল গত বছরের মার্চ মাসে। মদ চোরা-চালানীদের সন্দেহ করা হয়েছিল সেক্ষেত্রে। এক্ষেত্রেও সন্দেহ তাদেরই। পুলিশ তদন্ত চলছে।

বেস্পতিবার বাড়ী থেকে বেরোলেন না ডাক্তার। যেন বিপর্যস্ত স্নায়ুকে শান্ত করার জন্যে অথবা আসন্ন কোনো বিপর্যয়ের জন্য স্নায়ুকে শক্ত করার অভিলাষে ঘর ছেড়ে নড়লেন না সারাদিন। সন্ধ্যে নাগাদ একটা চিঠি লিখলেন প্রাণপ্রিয় বন্ধু মিস্টার ওয়ার্ডকে। সে চিঠি ডেলিভারী হল পরের দিন সকালে। চিঠি পড়ে নতুন রহস্যের আবর্তে ক্ষণেকের জন্যে দিশেহারা হলেও পরে শান্তি পেলেন মিস্টার ওয়ার্ড। সোমবারের ভয় তাড়ানোর অনুষ্ঠানের পর থেকে তাঁর মনের মধ্যে যে কি হচ্ছিল, তা শুধু ঈশ্বর জানেন। কাজেও বেরোচ্ছিলেন না—দিন রাত বসে থাকতেন বাড়ীতে। দগ্ধ অন্তরে শান্তির প্রলেপ এনে দিল ডাক্তারের গূঢ় পত্র, ছত্রে ছত্রে যার হেঁয়ালী।

বারোই এপ্রিল, ১৯২৮

প্রিয় থিওডোর,

আগামীকাল আমি যা করব, তা করবার আগে তোমাকে দুটো কথা বলা আমার কর্তব্য। শুনে তুমি মনকে তৈরী করতে পারবে। যে ভয়ানক কাণ্ডকারখানায় আমরা প্রত্যেকেই বিভ্রান্ত, তার ইতি ঘটবে কালকেই। পাতালপুরীর প্রবেশ পথ আর কোনোদিনই খুলবে না, কোনো শাবলেই তা সম্ভব হবে না! কিন্তু তার চাইতেও বেশী স্বস্তি আর সান্ত্বনা পাবে যে ঘটনায়—তার মুখবন্ধ হিসেবে দুটো কথা তোমাকে বলব।

তুমি আমাকে এতটুকু বয়স থেকে দেখছো। তাই আমার কথায় বিশ্বাস রেখো। এ সংসারের অনেক রহস্যর সমাধান না করাই মঙ্গল। অনেক জিনিস জানতে নেই, জানার জন্যে অনুসন্ধান করতে নেই, যে ভাবে চলছে সেই ভাবেই চলতে দেওয়া ভাল। চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ডের কেস সম্পর্কে আর কিছু ভেবোনা…জিজ্ঞেসও করোনা…ওর মা যা জানে, তার বেশী কিছু বলতে যেও না।

কাল যখন তোমার সামনে যাব, চার্লস ততক্ষণে পালিয়েছে জানবে। এইটাই সবাই জানুক তার বেশী নয়! চার্লস পাগল হয়ে গিয়েছিল, তাই পালিয়েছে। টাইপ করা চিঠি চার্লসের নামে পাঠানো বন্ধ করার পর ওর মা'কে আস্তে আস্তে বলবে ঠিক কি ধরনের পাগলামিতে পেয়ে বসেছিল চার্লসকে। আমার কথা শোনো। আটলান্টিক সিটিতে ওঁর কাছে যাও এবং কিছুদিন বিশ্রাম নাও। বিশ্রাম আমারও দরকার। মানসিক চোট খাওয়ার পর তোমার আমার দুজনেরই অবস্থা

শোচনীয়। আমি দক্ষিণে যাচ্ছি বেশ কিছুদিনের জন্যে স্নায়ুর জোর ফিরিয়ে আনতে।

তাই বলছি, কাল যখন যাব তোমার সামনে—কোনো প্রশ্ন করবে না। পরিস্থিতি আমার আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে—আমি বিপদে পড়তে পারি—সেক্ষেত্র তুমি সব জানবে। তবে তা হবে বলে মনে হয় না। উদ্বেগের আর তিলমাত্র কারণ থাকবে না। চার্লস নিরাপদে থাকবে—অতিশয় নিরাপদে থাকবে। এখনও আছে—তুমি স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না কত শান্তিতে সে আছে। অ্যালেনকে অত ভয় আর পেও না। সে যাই হোক না কেন—জোসেফ কারওয়েনের ছবির মতই সে এখন অতীত। তোমার দরজার কড়া যখনি নাড়ব কালকে, সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নেবে অ্যালেন নামে কেউ নেই। বিদঘুটে হরফে প্রাচীন ভাষায় লেখা চার লাইনের বার্তালেখকও আর কোনো দিন আসবে না তোমাদের জ্বালাতে, আমাকে উত্যক্ত করতে।

তবে বিষাদ-পর্বের জন্যে মনকে শক্ত করো—স্ত্রীকেও প্রস্তুত করো। অকপটে বলছি, চার্লস পালিয়ে যাবে মানে এই নয় যে তোমার কাছে ফিরে আসবে। যে রোগ হয়েছে তার, তা সারবার নয়—তাই আর তাকে দেখতে পাবে না। তবে মনকে সান্ত্বনা দিও শুধু এই বলে যে চার্লস দানব নয়, রাক্ষস নয়, পিশাচ নয়—এমন কি সত্যি সত্যিই উম্মাদও নয়—বই-পাগল, তত্ত্ব-সন্ধানী, জ্ঞান-পিপাসু এক হীরের টুকরো ছেলে—যে এমন এক নিষিদ্ধ রহস্যের আগল উম্মোচন করতে উৎসুক হয়েছিল, যা তার উচিত হয়নি। অতীত রহস্যের অন্ধকারে আলো জ্বালতে গিয়ে সে এমন তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছিল যা ইহলোকের মানুষের জানা উচিত নয়—অতীতের অন্ধকার ঠেলে পেছিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়—তাই সেই বিস্মৃত অতীত থেকেই নেমে এসেছিল একজন তাকে গ্রাস করতে।

এবার যা বলব, তা তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে—কেন না চার্লসের কপালে যা আছে, তার হেরফের ঘটবে না। এখন থেকে এক বছর পরে শেষ কাজের আয়োজন করবে—কেন না চার্লস এ সংসারে আর থাকবে না। গোরস্থানে তোমাদের পরিবারের সবাই যেখানে সমাহিত হয়েছেন, সেইখানে চার্লসের নামে একটা স্মৃতিফলক লাগিয়ে দিও। তোমার বাবার কবর যেখানে, সেখান থেকে পশ্চিম দিকে দশ ফুট গেলেই জানবে রয়েছে তোমার আসল ছেলের কবর। ভয় নেই—স্মৃতি-ফলকের তলায় যার দেহাবশেষ থাকবে, সে তোমারই ছেলের দেহাবশেষ···পরিবর্তিত বা

অস্বাভাবিক কোনো চার্লসের নয়। আসল এবং অকৃত্রিম চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ডের নশ্বর দেহাস্থির ওপরেই লাগানো থাকবে স্মৃতি-ফলক ··সেই চার্লস যাকে তুমি আঁতুড়ে অবস্থায় কোলে নিয়েছিলে, আরেক চার্লস নয়; সেই চার্লস---আঁতুড় ঘরেই যার পাছায় জলপাই রঙের জরুল চিহ্ন দেখেছিলে, কিন্তু বুকে পিশাচ চিহ্ন ছিল না---ভুরুতে কাটা দাগ ছিল না; সেই চার্লস···যে কোনো দিন কোনো খারাপ কাজ করেনি, কারো অমঙ্গল করেনি, কিন্তু অজানাকে জানতে গিয়ে 'বাড়াবাড়ি' করে ফেলেছিল বলে যাকে মাশুল দিতে হবে নিজের জীবন দিয়ে।

ব্যস, আর কোনো কথা নয়। চার্লস পালিয়ে যাবে কালকেই---এক বছর পরে স্মৃতি-ফলক লাগিয়ে দেবে কবরে। কাল দেখা হলে পর কোনো প্রশ্ন করবে না, এর বেশী জানতে চাইবে না। শুধু জানবে তোমার সুপ্রাচীন পরিবারে কলঙ্ক আজও লাগেনি, কেউ লাগায় নি··· চার্লসও না।

আমাদের অন্তরের সমবেদনা রইল। ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপর সব ছেড়ে দাও। মনে বল পাবে। তিনি যা করেন। ভালর জন্যেই করেন।

তোমার একান্ত প্রিয়
মেরিনাস বিঃ উইলেট।

পরের দিন ১৯২৮ সালের তেরোই এপ্রিল শুক্রবারের সকালে, কোনানিকাট আইল্যাণ্ডে ডক্টর ওয়েটের প্রাইভেট হাসপাতালে চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ডের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন মেরিনাস বিকনেল উইলেট। ডক্টর উইলেট চেয়েছিলেন, চার্লসই কথা শুরু করুক। কিন্তু গুম হয়ে বসে রইল সে। উইলেটকে এড়িয়ে যাওয়ারও চেষ্টা করল না। পাতালের পাকচক্র আবিষ্কারের পর থেকেই আর সহজভাবে আগের মত কথা বলতে পারছিল না চার্লস। মামুলী শিষ্টাচারের পর বসে রইল মুখ গোঁজ করে। কিন্তু মিনিট কয়েক যেতে না যেতেই চার্লসের মৌন মুখে অস্থিরতা পরিস্ফুট হল। উইলেটের মুখভাবে একটা বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করেই চঞ্চল হল চার্লস। উইলেট আর আগের মত নেই। সুকঠিন সংকল্পে শক্ত তাঁর মুখ। যেন একটা ভয়ংকর উদ্দেশ্য সাধনের দৃঢ়তায় কঠোর তাঁর চোয়ালের অস্থি। মিষ্টভাষী সহৃদয় গৃহচিকিৎসক উইলেট বুঝি আজ নিষ্করুণ, নির্মম প্রতিহিংসা নিতে দৃঢ়সংকল্প।

সত্যি সত্যিই বিবর্ণ হয়ে গেল চার্লস। প্রথম কথা শুরু করলেন

ডাক্তার স্বয়ং। বললেন, "আরো খবর জানা গিয়েছে। সাবধান, এবার ধরা দিতেই হবে।"

বেপরোয়া ভঙ্গিমায় শ্লেষতিক্ত হাসি হেসে চার্লস বললে সেকেলে ভাষায়, 'মাটির নীচে এবার কি পেলেন? আরো উপোষীদের?'

"না," আস্তে আস্তে জবাব দিলেন ডাক্তার, "এবার আর মাটি খোঁড়াখুঁড়ির দরকার হয়নি। ডক্টর অ্যালেনকে খুঁজতে লোক লাগিয়েছিলাম। বাংলো থেকে তারা এনেছে একটা নকল দাড়ি আর কালো চশমা!"

"চমৎকার। পরলেই পারতেন, আপনার এই আহামরি দাড়ি আর চশমার চাইতে বেশী মানাতো!"

অপমান গায়ে মাখলেন না ডাক্তার। স্থির চোখে চেয়ে রইলেন চার্লসের স্পর্ধিত মুখের পানে। বললেন আরো আস্তে আস্তে, "তা মানাতো...আমাকে নয়, তোমাকে। যেমন মানিয়েছিল এই সেদিনও... তাই না?"

কথাটা শেষ করার আগেই মনে হল যেন একখণ্ড মেঘ ভেসে গেল সূর্যকে আড়াল করে, যদিও পরিবর্তন এল না মেঝের ছায়ায়।

সদম্ভে বললে চার্লস, "একেই বুঝি ধরা দেওয়া বলছিলেন? ছদ্মবেশ নেওয়া কি অন্যায়?"

"না। কারোর ছদ্মবেশ নিয়ে মাথা ঘামাই না আমি। কিন্তু ধরাধামে যদি তার থাকার অধিকারই না থাকে এবং মহাশূন্য থেকে যে তাকে ধরায় এনেছে তাকেই সে ধ্বংস করে ফেলে...তখন মাথা ঘামাতে হয় বইকি।"

ভীষণ চমকে উঠল চার্লস—কি পেয়েছেন বলুন তো?

সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্যে একটু সময় নিলেন ডাক্তার।

তারপর বললেন ধীরস্থির কণ্ঠে—'পেয়েছি এমন একটা জিনিস যার স্থান হওয়া উচিত গোরস্থানে—কিন্তু যা ছিল ওভার ম্যাণ্টেলের ওপরে যেখানে একটা ছবি ঝুলতো, তার পেছনে। জিনিসটা আমি পুড়িয়ে ছাই করেছি। ছাই নিয়ে পুঁতে এসেছি কবরখানার ঠিক সেইখানে, যেখানে থাকা উচিত চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ডের সমাধি।'

উন্মাদ মানুষটার যেন চকিতে শ্বাসরোধ ঘটল, যেন একটা বিদ্যুৎ রেখা নিমেষে ছিটকে গেল চেয়ার থেকে দূরে। তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পেছিয়ে গিয়ে বললে ভয়াল তীব্র কণ্ঠে, 'কাকে বলেছেন একথা? কে বিশ্বাস করবে আপনার গালগল্প? দুমাস আমারই মধ্যে বেঁচে ছিল

সে, একথা পাগলেও বিশ্বাস করবে না! কি করতে চান আপনি? বলুন কি চান?

উইলেট আকারে খর্বকায়। কিন্তু নাটকীয় বিস্ফোরণের সেই মুহূর্তে ধর্মাবতার সুলভ ব্যক্তিত্ব নিয়ে স্রেফ হাতের ইসারায় শান্ত করলেন রোগীকে।

বললেন দ্রিমি দ্রিমি গম্ভীর কণ্ঠে, কাউকে বলিনি। এ-কেস মামুলী কেস নয়। এ উম্মত্ততার উৎপত্তি দেশ ও কালের অতীত এমন এক ভয়াবহ চক্র থেকে পুলিশ বা উকিল যেখানে নাক গলাতে অক্ষম···মনের ডাক্তারের সাধ্য নেই কুটিলতম এই মনের রোগের তল খুঁজে পাওয়া। ঈশ্বরের কৃপায় এত কাণ্ডের পরেও কল্পনার স্ফুলিঙ্গ এখনো ছিল আমার ব্রেনের মধ্যে···তাই শুধু আমাকেই বোকা বানাতে পারেননি আপনি। হ্যাঁ আপনি, আপনাকে বলছি আপনার অভিশপ্ত মন্ত্রশক্তির ক্ষমতা আমি স্বচক্ষে দেখেছি বলেই বলছি, বিশ্বশুদ্ধ লোকের চোখে ধুলো দিলেও আমাকে আপনি ঠকাতে পারেন নি জোসেফ কারওয়েন···আপনার খেলা ফুরিয়েছে।

আমি জানি সুদূর অতীতে কিভাবে আপনি মন্ত্রব্যূহ রচনা করে-ছিলেন, আমি জানি কিভাবে আপনার যুগল এবং আপনারই বংশধরের ওপর সেই মন্ত্রশক্তি কেন্দ্রীভূত করেছিলেন। আমি জানি কিভাবে তাকে আপনি অতীতের প্রতি টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং কিভাবে আপনারই ঘৃণ্য কবর থেকে আপনাকে জাগাতে তাকে বাধ্য করেছিলেন; আমি জানি আপনি কিভাবে ল্যাবোরেটরীতে লুকিয়ে থেকে আধুনিক বই পড়ে আধুনিক জ্ঞানে জ্ঞানী হতে চেয়েছিলেন এবং কিভাবে রাত হলেই ভ্যামপায়ার হয়ে মানুষের রক্ত পান করে বেড়াতেন; আমি জানি কিভাবে আপনি নকল দাড়ি আর চশমা লাগিয়ে ডক্টর অ্যালেন সেজে ভাঁওতা দিয়েছেন দেশশুদ্ধ লোককে এবং কিভাবে কাউকে বুঝতেও দেন নি আপনার সঙ্গে কি বিচিত্র সাদৃশ্য হতভাগ্য চার্লসের; আমি জানি পৃথিবীর নানা দেশের কবর লুঠ করে যখন আপনি কফিন আমদানী শুরু করলেন তখন সে বেঁকে বসায় তাকে কি সাজা দেবার চক্রান্ত করে-ছিলেন এবং কিভাবে সেই চক্রান্ত সফল করেছিলেন। জোসেফ কারওয়েন, আমি সব জানি।

'দাড়ি আর চশমা বাংলোয় রেখে ওয়ার্ড-ভবনে ঢুকে বোকা বানিয়ে-ছিলেন গোয়েন্দাদের। ওরা আপনাকে চার্লস ভেবেছিল। তাই ধরে নিয়েছিল চার্লস গেল ভেতরে···চার্লস এল বাইরে। আসলে চার্লসকে

গলা টিপে মেরে ঘরের মধ্যেই লুকিয়ে রেখে বেরিয়ে এসেছিলেন আপনি। তবে কি জানেন, চেহারার সাদৃশ্যই সব নয়···সেটা আপনার বোঝা উচিত ছিল। আপনার জানা উচিত ছিল···দুযুগের দুটো মন কখনো এক হতে পারে না। জোসেফ কারওয়েন, সেদিক দিয়ে আপনি প্রকাণ্ড মূর্খ। আপনার কণ্ঠস্বর, কথা বলার কায়দা, হাতের লেখা···এই তিনটেই যে চার্লসের কণ্ঠস্বর, কথা বলার কায়দা আর হাতের লেখার মত নয় ··হতে পারে না·· এ জিনিসটা হিসেবের মধ্যে রাখা উচিত ছিল। তাহলে হয়ত এভাবে ফেঁসে যেতেন না। চার লাইনের ল্যাটিন ভাষায় আপনাকে ধ্বংস করার নির্দেশ কার হাতে লেখা, জোসেফ কারওয়েন, আপনি তা আমার চাইতে ভাল জানেন। সে নির্দেশ বৃথা যাবে না। পিশাচ-তন্ত্রের অবসান আমি ঘটাবোই ঘটাবো। ওর্ণে আর হাচিনসনের ব্যবস্থা তিনিই করবেন···যিনি লিখেছেন ঐ চারটে লাইন। ঐ দুই পিশাচের একজন আপনাকে লিখেছিল, যাকে কফিনে ফেরানো যায় না··· তাকে যেন কফিন থেকে জাগানো না হয়। তা সত্ত্বেও ভুল করেছিলেন বলে একবার আপনার সর্বনাশ হয়েছে···এবার হবে আপনার নিজের মন্ত্রশক্তিতেই। কারওয়েন, প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘনের একটা সীমা আছে, তাই আজ পর্যন্ত যত বিভীষিকার স্রষ্ট্রা আপনি...সব বুমেরাং হ'য়ে ফিরে যাবে আপনার দিকে।'

এই পর্যন্ত বলার পর আর কথা বলতে পারলেন না ডাক্তার। বিকৃত বীভৎস গলায় আকাশফাটা চীৎকার করে উঠল তাঁর সামনে দণ্ডায়মান পুঞ্জীভূত অশুভ শক্তিস্বরূপ প্রাণীটা। বলপ্রয়োগে হিতে বিপরীত হতে পারে···হাসপাতাপশুদ্ধ কর্মচারী দৌড়ে আসতে পারে···এই ভয়ে আচম্বিতে সে প্রাচীন দোস্তদের একজনকে আবাহন করতে আরম্ভ করল পৈশাচিক পন্থায়। দুহাতের তর্জনী দিয়ে অতি দ্রুত অত্যন্ত গূঢ় প্রতীক চিহ্নর পর প্রতীক চিহ্ন এঁকে চলল শূন্যে···সেই সঙ্গে কণ্ঠস্বর গোপন করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে হেঁড়ে গলায় আউড়ে চলল ভয়াল ভয়ংকর এক মন্ত্র ঃ

"পার অ্যাডোনাই ইলোইম, অ্যাডোনালি জেহোভা, অ্যাডোনাই সাবাওথ মেট্রাটন···"

কিন্তু উইলেট পাল্টা জবাব দিলেন তার চাইতেও তাড়াতাড়ি। রক্ত জমানো মন্ত্রোচ্চারণের শুরুতেই তল্লাটের সমস্ত কুকুর চেঁচাতে শুরু করে দিয়েছিল একযোগে···আচমকা উপসাগরের দিক থেকে কনকনে হাওয়া বইতে শুরু করেছিল ঘরের মধ্যে···কিন্তু এতটুকুও না ঘাবড়ে,

গলার স্বর একটুও না কাঁপিয়ে ডক্টর উইলেট শুরু করলেন সেই মন্ত্রো-চ্চারণ···যা তিনি এতদিন কেবলি মুখস্ত করে এসেছেন শেষ মুহূর্তে বলবেন বলে। এ সেই জোড়া মন্ত্রের শেষ মন্ত্র···যাকে ঘিরেছিল ড্রাগনের ল্যাজের প্রতীক চিহ্ন···যা তিনি দেখে এবং শিখে এসেছিলেন পাতাল-পুরীর দেওয়ালে।

অগথুড আইফ
গেবেল-ঈথ
যোগ-সোদোদ
ঙাগাহাঙ আই
জো!

মন্ত্রের প্রথম শব্দটা বলতে-না বলতেই শরীরী-রহস্যর কণ্ঠরোধ ঘটল। কথা বন্ধ হয়ে যেতেই দুহাতের তর্জনী দিয়ে ক্ষিপ্তের মত কত কি বিদঘুটে প্রতীক চিহ্ন এঁকে চলল শূন্যে···কিন্তু অবশেষে অসাড় হল হাতজোড়াও। যোগ-সোদোদ—এই গা-হিম করা নামটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে এল পরিবর্তন। কদাকার সেই রূপান্তরকে গলে যাওয়া বললে সঠিক হবে না, বলা উচিত অন্য আকার গ্রহণ···এক পদার্থ থেকে আরেক পদার্থে পরি-বর্তন। ভয়ের চোটে চোখ বন্ধ করে ফেললেন উইলেট পাছে অজ্ঞান হয়ে যান···মন্ত্রোচ্চারণে বাধা পড়ে।

কিন্তু তিনি অজ্ঞান হলেন না। বহু শতাব্দী পেরিয়ে আসা জাহান্-মের জীবটিও আর নিষিদ্ধ রহস্য নিয়ে বিচরণ করল না ইহলোকের মাটিতে। মহাকালের ডম্বরু সংকেত উপেক্ষা করেও যে উন্মত্ততার প্রকাশ···তার অবসান ঘটল চিরতরে···যবনিকা পড়ল চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ডের কেসে। চোখ খুলে ঘর থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে যাওয়ার আগে ডাক্তার দেখলেন এতদিন সযত্নে স্মৃতিতে ধরে রাখা মন্ত্র বৃথা যায় নি। অনুমান ওঁর মিথ্যে হয় নি। অ্যাসিডের আর দরকার হয় নি। এক বছর আগে একটা তৈলচিত্র সহসা যেভাবে গুঁড়িয়ে পাউডার হয়ে গিয়েছিল, ঠিক সেইভাবেই জোসেফ কারওয়েন ঘরময় ছড়িয়ে পড়ে আছেন অতি-মিহি, হাল্কা, শুষ্ক নীলাভ-ধূসর ধুলোর আকারে। □

—